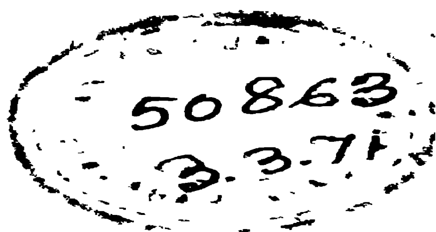
জেনানা ফাটক

জেনানা ফাটক

শ্রীরানী চন্দ



প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

নূতন সংস্করণ কার্তিক ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট শিল্পী
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

আ লা প

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট। এরই কয়েকদিন পরে একদিন। তখন বেলা শেষ, সূর্য ডুবেও ডোবে নি; রঙ ছুঁয়ে ছুঁয়ে মেঘের গায়ে; পথে পা বাড়িয়ে দিতেই কতকগুলি বুটজুতো মচ্ মচ্ করে উঠল আমায় ঘিরে।

বর্ষায় বীরভূমের গ্রাম— রাস্তাঘাটের বালাই নেই; জল-কাদা ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে চললেই হল। তাই চললুম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্তির— আম বট বাঁশ বনের ঘন অন্ধকার তলা দিয়ে চলেছি। হাঁটু অবধি জলেতে কাদাতে আঁধার ছায়াতে মাখামাখি— নজর পৌছায় না পায়ের পাতায়। দু-তিনটে গ্রাম পেরিয়ে থানা। নিঝুম গ্রাম, রাস্তার ধারের দরজা জানালা বন্ধ সব। একটি বুড়ি কেরোসিনের ডিবে হাতে মুখ বাড়াল দেখতে, কারা যায়! ভালো ক'রে দেখবার আগেই বাঁ-হাতের ঝাপটে বাতি নিবিয়ে দিল। কয়েকটি খেঁকি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পিছু হটল। পর পর গ্রাম পেরিয়ে বনের পথে পড়লুম।

আকাশভরা তারা জলজল করছে, গাছের মাথায় অসংখ্য জোনাকি নিবছে জলছে; ঝিঁঝি পোকা একটানা স্বরে ডেকে চলেছে— তারই মাঝে চলেছি আমি। থেকে থেকে কানে আসছে সঙ্গীদের জলে-কাদায়-ভেজা বুটজুতোর শব্দ পচ্‌পচ্ চপ্‌চপ্।

রাত কাটল থানার বারান্দায়। ভোর হতে মাঝপথে ট্রেন থামিয়ে তাতে তুলে দিল আমায়। দূরে দেবদারু গাছের ও-পাশে মানুষ-সমান উঁচুতে একটি শাদা রুমাল নড়ে উঠল— গাড়ি বাঁক ঘুরল— মুখ ভিতরে ঢুকিয়ে নিলুম।

কামরাভরা গোরা সৈন্য— বন্দুক বাগিয়ে, পিঠে ঝোলা নিয়ে। এদেরই মাঝে একপাশে সাথি চণ্ডুসিং বসবার জায়গা করে বুকে হাত দিয়ে বলল—'গায়ে আমার রাজপুত রক্ত, এমন জাত আমরা— পিঠের দিকে মার খেলে সে-মড়া খোলামাঠে শকুনেও ছোঁয় না। মুখ খুলতে পারি না আজ, তবুও এই বানররা কী করবে তোমার যতক্ষণ আমি আছি,' ব'লে আমায় আগলে নিয়ে বসবার ভঙ্গিতে পাশে জায়গা ক'রে নিল। বলল, 'ট্রেনভরা সব এ-ই— একা তুমি আর আমি কালা চামড়ার। লাইন পাহারা দিচ্ছে যত দুশমনের দল।'

জানালায় হাত রেখে ঘুরে বসলুম। বাইরে সবুজের ছড়াছড়ি— কত রকমের সবুজ! ধানখেতে শিষ ধরেছে, নীল আকাশের গায়ে শাদা বকের সারি

শাদা মেঘে লুকোচুরি খেলছে ; মাঝে মাঝে থোকা থোকা শাদা রঙ সবুজ ঠেলে মাথা তুলেছে। শরতের প্রথম— কাশফুল কখন ফুটতে শুরু করে দিয়েছে !

ট্রেন চলেছে হুস্ হুস্।

এক

জেলার সদর শিউড়ি। ব'সে আছি কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের আপিস ঘরে। টেবিলে টেবিলে লেখার খস্‌খস্‌, ফাইলের ধুপ্‌ধাপ্‌, জুতোর মস্‌মস্‌, নানা শব্দে ঘর গম্‌-গম্‌ করছে। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার নানারকম লোকজন নিয়ে নানাপ্রকার কেস্‌ সাজাতে, লিখতে ও ধমকাতে লেগেছেন; কোনোটি খাজনা অনাদায়ের, কোনোটি ক্রোক নিলামের, কোনটা বা দাঙ্গাহাঙ্গামার।

দেওয়ালের গায়ে বড়ো ঘড়িতে বেজে চলেছে বারোটা, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে—। কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার মিহিস্বরে কথা ক'য়েই চলেছেন সমানে— ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে; ঘরের এ-কোনায়, ও-কোনায়, সকলের সঙ্গে হেঁকে ডেকে। কথার একঘেয়ে সুরের ওঠাপড়া নেই। শেষটায় শ্রোতাদের কাছে বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে টানাপাখা টানে ছেলে একটা— তার সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। আহা, ভাত খায় না বাছা রে আমার— গায়ে জোর নেই।— এই-ও— জোরে টানতে পারিস না হতভাগা? ছেলেটা ককিয়ে উঠল 'এজ্ঞে, মিছে লয় বাবু, আজ মুড়ি খেইয়েই এইছি।'

পাঁচটা বাজল। এদেরই একজন ঘরে ঢুকে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টারের কাছে গিয়ে কী বলতে কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টার দু-তিনবার এস. ডি. ও.র নাম ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খানিক পরে বিড়বিড় করতে করতে ফিরে এলেন, টানাপাখা-টানা ছেলেটাকে হঠাৎ একটা ধমক দিলেন— ঘরের ও-কোনায় গিয়ে আর একটি কর্মচারীকে জোর গলায় কী নির্দেশ করলেন, একটা টেবিল থেকে দুটো ফাইল মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন— শেষে নিজের চেয়ারটা দু-হাত পিছনে টেনে এনে তাতে বসে নিজেকে-সুদ্ধ আবার দু-হাত টেবিলের কাছে হুড়হুড় ক'রে এগিয়ে নিলেন।

ঘর ঠাণ্ডা হল। এক সাব-ইন্‌স্পেক্টার এসে বললেন—'আপনার এখানকার কাজ সারা হয়েছে— এবারে চলুন।'—বুঝলুম, কোথায়। সারাদিন পর উঠে দাঁড়ালুম। জেলখানার প্রকাণ্ড লোহার দরজা— প্রহরী তালা খুলতে ব্যস্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ল। প্রহরীর পায়ের ও-পাশে দরজার ভিতর দিকে, আরও দু-খানা পা। আর সেই পায়ের উপরে হাঁটুর কাছে লাল-নীল রঙে

লতা-পাতা-আকা চওড়া শাড়ির পাড়। মনটা খুশি হয়ে উঠল— এগিয়ে পাড় লক্ষ্য ক'রে মুখ তুললুম। দেখি মস্ত লম্বাচওড়া মজবুত কাঠামোর এক মেয়ে-মানুষ— তার তীব্র দুটো খুদে চোখ, পুরু ওলটানো নিচের ঠোঁট, কালো কালো দাঁত-বের-করা— হাঁ-করা মুখে বিশ্রী একরকম হাসি ; সব মিলিয়ে আবছা আলোতে যেন এক বিভীষিকা। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নামিয়ে নিলুম। ভিতরটা কেমন শির্‌ শির্‌ করতে লাগল। কী বেমানান, শাড়ির পাড়েতে আর মুখেতে! সঙ্গী বললেন, 'এ এখানকার জমাদারনি।'

জেলের প্রাঙ্গণে ঢুকতেই ডানদিক থেকে কানে এল বহুকণ্ঠের সমবেত ধ্বনি —'বন্দেমাতরম্‌'। তাদের মধ্যে অনেকেরই বড়ো চেনা মুখ। একটু থমকে দাঁড়ালুম।

সঙ্গে সঙ্গে জমাদারনি পিছন থেকে এক হুংকার দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল, দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে আমায় আড়াল করে নিয়ে এগিয়ে চলল, জেলের ভিতরে আর-একটা দরজা— আর একটা লোহার তালা। জমাদারনির তর সয় না— খাঁচার ভিতরে পাখি যেমন, তেমনি ওর হাত-পা-শরীরের মাঝে আমায় পুরে তাড়াতাড়ি তালা খুলে দরজায় ডান-পায়ে বাঁ-পায়ে লাথি মারতে লাগল। কয়েকবার লাথি মারবার পর শক্ত দরজা খুলে গেল। আমি ওর শারীরিক বন্ধন থেকে আলগা পেয়ে জেনানা ফাটকে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। মায়া, ভাবী ছুটে এল। কতক্ষণ হাসিমুখ দেখি নি, বাঁচলুম— ভুলে গেলুম কোথায় এসেছি!

হঠাৎ আর এক গর্জন। আঙিনার ও-পাশে খুঁটে খুঁটে ঘাস তুলছিল বুড়ি কয়েদি এক। জমাদারনি তার ঘাড়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিতেই সে সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল, আবার পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়াল। জমাদারনি দোর-গোড়া থেকে আমার ব্যাগ, বিছানা, চরকা, থলি উঠোনে ছুঁড়ে মারল। বুড়ি কয়েদি ব'য়ে ব'য়ে তা ঘরে নিল। ছোড়াছুড়িতে জিনিসগুলি মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড। চরকার ঢাকা খুলে, চাকা গড়িয়ে, টেকো দুমড়ে তছনছ। সে-সব গুটিয়ে-বাটিয়ে তালা-বন্ধ করতে গেছি— জমাদারনি গর্জে উঠল, 'খাঁড়া রহ'। চমকে উঠলুম— এ আবার কী? ভাবী আমায় টেনে সরিয়ে আনলেন। জমাদারনি লম্বা লম্বা হাত দুটো দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এল। ঘরের মেঝেতে একখানা কম্বল টেনে পেতে বসল, বসে এক এক ক'রে খুঁটিয়ে সব খুলে ঝেড়ে নেড়ে দেখতে লাগল.

কাপড়ে-চাদরে-বালিশে-তোশকে কোথায়ও কিছু লুকোনো-জিনিস মেলে কিনা। বালিশটা নানাভাবে টিপেও মন খুশি হয় না, একবার এনে এ-কানের কাছে নাড়ে—আবার নিয়ে ও-কানের কাছে নাড়ে। কিছুতেই কিছু না পেয়ে বিরক্ত হয়ে বালিশটা ছুঁড়ে ফেলল। তুলোর পাঁজগুলি খুলে খুলে ছড়িয়ে দিল। ব্লাউজের সেলাইগুলি আলোর দিকে মেলে ধরল— শেষে তার মুখ আরো ফুলিয়ে কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল; তারপর ঘরময়-ছড়ানো জিনিসগুলির দিকে আর একবার ভালো করে তাকিয়ে গট্‌গট্‌ ক'রে দরজার তালা খুলে বাইরে চলে গেল।

হতভম্ব হয়ে গেছি এ-পর্যন্ত ওর চলন-বলন দেখে। ভাবী বললেন— 'এ আর কী দেখছো, এ তো কিছুই না।'

মায়া বললে— 'এরই হাতে থাকতে হবে। কাল টের পাবেন— সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে হয় কী ভাবে। এখন আসুন এগুলি গুছিয়ে ফেলি।'

ভাবী বিহারবাসিনী— বীরভূমে আছেন অনেক কাল, ভাঙা ডাঙা বাংলা বলেন, সে-বাংলায় বীরভূমের টান— ভাবীর হাসিমাখা মুখে তা শোনায় বড়ো মিষ্টি। ফরসা রঙ, টিকোলো নাক, কপাল ঘিরে শাড়ির চওড়া লাল পাড়, কপালের মাঝে বড়ো একটি সিঁদুরের টিপ— যেন লক্ষ্মীমূর্তিটি।

মায়া বাঙালিনী— তেজস্বিনী। ইংরেজ এখনো ভারতের মাটিতে বিদ্যমান —অন্তরের এ-উত্তাপ তাকে স্থির থাকতে দেয় না। মুখের ভাবে, বুকে দু-হাত জড়িয়ে রাখার ভঙ্গিতে, দুপ্‌দাপ্‌ হাঁটায় তা প্রতিমুহূর্তে প্রকাশ পায়। এ-কথা তাকে জানালেই আবার সে খিক্‌খিক্ হাসে, লজ্জা পায়। বলে, 'আপনাদের সামনে কিছু করবার জো নেই। আচ্ছা, কী ক'রে বুঝতে পারেন যে ভিতরে ভিতরে আমি চটেছি। বেশির ভাগ সময় আমি তো কাউকেই কিছু বলি না'। মায়ার রঙ কালো— কপালের পাশে কোঁকড়ানো কালো চুল— লম্বা দোহারা গড়ন— গায়ে শাদা ব্লাউজ— পরনে কালোপাড় শাড়ি; বরাবরের তার এই সাজ। রাস্তায় ঘাটে প্রৌঢ়ারা তাকে দেখে বলে, আহা— এই বয়সেই কপাল ভেঙেছে! শুনে মায়া মুখে কাপড় দিয়ে হাসে। তবুও রঙিন কিছু গায়ে তোলে না— বলে 'ছিঃ'।

মায়া-ভাবী এসেছেন এখানে সাতদিন আগে, একবস্ত্রে। সময় পান নি সঙ্গে আর-কিছু আনবার বা নিজের লোকদের খবর দেবার। দ্বিতীয় বস্ত্রখানা

—মানে সাড়ে-নয় হাত শাড়িখানা, দিয়েছেন জেলকর্তৃপক্ষ। একটি ক'রে জামা— রাত্রে ধুয়ে শুকোন, দিনে গায়ে দেন। মাথায় রুক্ষ চুলের খোঁপা— এক-এক বোঝা। মুখ মলিন, গায়ে হাতে পায়ে খড়ি উঠছে। এই সাতদিনে একদিন মাত্র খানিকটা সাজিমাটি গোলা জল পেয়েছেন। ভাবী শাড়ির আঁচলটা মেলে ধ'রে বললেন—'তাতে কাপড় ডোবাতে গিয়া কি হইয়াছে দেখ। কাপড়ে ময়লাও আটকি রইল সাজিমাটিও রইল।'

মায়া বললে—'সাজিমাটি না ছাই। কতগুলো কাদা-গোলা জল দিয়ে গিয়েছিল। নয়তো যে রকম ক'রে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচলাম আমরা, একটুও কি পরিষ্কার হত না?'

আমার সঙ্গে এসেছে শাড়ি-জামা-সাবান-তেল কিছু কিছু। তাই দিয়ে কিছুদিন অন্তত কাজ চলবে আমাদের ভেবে সবাই খুশি হচ্ছি। এমন সময়ে দুমদাম্ ক'রে জমাদারনি ঘরে ঢুকে খেঁকিয়ে উঠল, 'থালা বাটি দিহ'। ভাবী টিনের থালা-বাটি নিয়ে বাইরে গেলেন।

খাবার নিয়ে এসেছে দু-জন পুরুষ কয়েদী— হেড জমাদারের সঙ্গে। জমাদারের হাতে ছড়ি ঘুরছে, কয়েদি দুটো মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাবে কি পিঠে পড়বে সপাসপ। একজনের ঘাড়ে ভাঙা একটি ষ্টীলট্রাঙ্কে মোটা মোটা ভাত। আর একজনের দু-হাতে দুটো মরচে-পড়া কেরোসিনের টিন, তার একটাতে ফিকে হলদে রঙের জল— এ হচ্ছে ডাল; অন্যটাতে কালো রঙের একটা ঘ্যাঁট— সেটা পুঁই, ট্যাঁড়স ও পাকা ধুন্দুলের ঘণ্ট। সেগুলো ঘাড় থেকে, হাত থেকে নামিয়ে তারা আমাদের প্রত্যেকের থালায় দু-হাতের আঁজলায় এক-এক আঁজলা ভাত দিল। বাটিতে খানিকটা ডালের জল ঢালল, ভাতের উপরে এক-এক খাবলা ঘ্যাঁট ফেলল— ফেলে ওমনি মাথা নিচু করে যে-যার বাক্স টিন ঘাড়ে তুলে, হাতে ঝুলিয়ে, জমাদারের ছড়ির আগে আগে বেরিয়ে গেল। জমাদারনি দরজায় তালা লাগিয়ে, চাবি কোমরে ঝুলিয়ে হনহন ক'রে আমাদের থালা-বাটিগুলি উঠোন থেকে তুলে এনে ঘরের দোর-গোড়ায় রেখে এক এক ধাক্কা মারল। থালা-বাটিগুলি এসে ঘরের মাঝখানে থামল। ভাত-ডাল খানিক খানিক মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

ভাবী বললেন— 'চলো, এইবার খেয়ে নিই গে তাড়াতাড়ি। আর একটু পরেই তো আমাদের ঘরে বন্ধ করি দেবে।'

থালা-বাটি ঘিরে বসলুম তিনজনে। মায়া বললে— 'এই ক'তদিন আমরা কেউ ভাত মুখে দিতে পারি নি। এই দেখুন, ভাতগুলি থালায় ফেললে কেমন ঝন্‌ঝন্‌ করে— এত কাঁকর। আর এই বড়ো বড়ো কাঁকর বুঝি চালে থাকে? আমরা বুঝি বীরভূমের চাল খাই নি কখনও। ইচ্ছে ক'রে মুঠো মুঠো কাঁকর মিশিয়ে দেয় চালের সঙ্গে। এরা কি মানুষ?'

ভাবী বললেন— 'জানো, আজ সাতদিন আমরা শুধু ডালের জল চুমুক দিয়া বেঁইচে আছি?'

মায়া বললে— 'তা, ডালের জলে অন্তত কিছুটা substance আছে, নয়? শরীর একেবারে খারাপ হয়ে পড়বে না হয়তো।'

কিন্তু ভাত না খেয়ে কয়দিন চলে? ভাবী একটা থালায় সব ভাত জড়ো করে আর একটি থালায় জল ঢেলে খানিকটা ভাত ছেঁকে তুললেন। জলের নিচে লাল-কালো-শাদা একমুঠো কাঁকর-পাথর প'ড়ে রইল।

মায়া বললে— 'ফেলবেন না ভাবী; আমি কাগজে মুড়ে রাখব, জেল-ভিজিটার এলে দেখাব। না দেখালে তো এঁরা বিশ্বাস করবেন না। তরকারিতে কেমন একটা লোহায়-পচা বোটকা গন্ধ, ডালও তাই। তবু ডালটা কোনো-রকমে দমবন্ধ ক'রে গেলা যায়, কিন্তু তরকারি যে চিবুতে হয়।'

ভাবী বললেন, 'নিশ্চয়ই এগুলি লোহার বাসনে রান্না হইছে। ওরা কি আর বাসন ভালো কইরে ধোয়? তরকারি পঁচে মরচে পইড়ে থাকে— তাতেই আবার পরের দিন রান্না চাপাই দেয়।'

ভিজে ভাত খেতে হবে, নুন কই? জমাদারনি পিছনে দাঁড়িয়ে গুম হয়ে আমাদের দেখছে। নুনের কথা শুনে যেন ফেটে পড়ল— বলল, 'এবেলা নিমক্ মিলিবে নেই।'

ভাবী চোখ টিপে কোমরের গোঁজা থেকে একটা পেঁয়াজের কোয়া— শাড়ির আঁচলের আড়ালে নখ দিয়ে কোন্ ফাঁকে তিন টুকরো ক'রে ভাতের থালায় হাত নাড়তে নাড়তে এক সময় চট করে আমাদের হাতে গুঁজে দিলেন। তাই দিয়েই কিছু ভাত মুখে পুরে খাওয়া শেষ ক'রে থালা-বাটি ধুয়ে ঘরে ঢুকলুম। জমাদারনি আমাদের রাম, দুই, তিন ক'রে গুনে গায়ের সব জোর দিয়ে খটাখট শব্দে ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে, বার দুই-তিন জোরে জোরে টেনে তালা ঠিকমতো লেগেছে কিনা দেখে, ডিউটি শেষ ক'রে নিশ্চিন্তমনে

বুক ফুলিয়ে সারারাত্রির মতো চ'লে গেল। এতক্ষণে কান, প্রাণ আমাদের জুড়োল।

বাইরে জলজল করছে দিনের আলো। গিয়ে দাঁড়ালুম জানালার কাছে। চারদিকে শাদা উঁচু দেওয়াল ঘেরা ছোট্ট উঠোন— মাঝখানে একটি লেবুগাছ— তারই নীচে কয়েকটি দোপাটি ফুলের চারা। উঁচু দেওয়ালের একপাশ-ঘেঁষে এই আমাদের ঘর ; সরু, লম্বা, মেঝে থেকে দু-মানুষ উঁচু, মোটা মোটা লোহার শিকের জানালা দিয়ে ঘেরা। সামনের দেওয়ালের ওপাশে অশত্থগাছের ডগাগুলি দেওয়াল ছাপিয়ে উঠেছে— সেই আগডালে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক-শালিক দিনশেষে বাসায় ফিরে আসছে। আমাদের ঘরের ছাদের কার্নিশে পায়রাগুলির বক্‌বকম্‌ থামে নি এখনো। দু-জোড়া পায়রা ঘরের ভিতরে দরজার উপরের খোপ দুটিতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরই একটি বড়ো একটা কাঠি মুখে নিয়ে এসে আমার জানালার শিকে বসল। ঘরে ঢুকবে। স'রে দাঁড়ালুম সেখান থেকে! ঠোঁটের লম্বা কাঠি আড়াআড়ি ভাবে আসে না শিকের ভিতর দিয়ে— দু-তিনবার পাখা ঝাপটে মাথা কাত ক'রে কাঠিটি ভিতরে ঢুকিয়ে পায়রাটি এবার উড়ে এসে বসল নিজের খোপে। বাসা বাঁধবে— সময় বেশি নেই— তাই তাড়া এত।

খণ্ড আকাশে খণ্ড খণ্ড হালকা শাদা মেঘ— পর পর এগিয়ে গেল। একটি দু-টি তারা দেখা দিল। উঠোনের একপাশে ঘন ছায়া পড়ল। অশত্থডালে সবুজ পাতার ভিতরে কালো কালো কাকগুলি মিলিয়ে গেল। চারদিকের কোলাহল শান্ত হয়ে এল। ক্লান্ত দেহমন মেঝেতে এলিয়ে দিলুম। পাহারাওয়ালার হাঁক শুনতে শুনতে এক সময় শোনা থেমে গেল। ঘুমিয়ে পড়লুম।

দুই

সকালবেলা। ঘুম ভাঙল দরজার তালা খোলার শব্দে। চোখ বুজে পাশ ফিরে প'ড়ে রইলুম। কয়েদিরা হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে কেউ উঠোন ঝাঁট দিতে, কেউ নর্দমা পরিষ্কার করতে, কেউ জল ঢালতে লেগে গেল। মাথার কাছেই নর্দমা— বাঁশের ঝাঁটার খড়খড় আওয়াজ, জমাদারনির দৌড়োদৌড়ি, ঝাঁপাঝাঁপি, হুমকি-

হামকিতে চোখ বুজে শুয়েও সোয়াস্তি পাই না মনে। ভাবী আর মায়া উঠে পড়েছেন, আমিও উঠে বসলুম। জমাদার ঢুকল জেনানা ফাটকে তিনজন পুরুষ কয়েদি নিয়ে। আগের মতোই মুখ নিচু ক'রে পরপর লাইন সমান রেখে এগিয়ে এল তারা। প্রথমটি ভারী, কাঁধে খাবার জলের বাঁক, দ্বিতীয়টি মেথর— দু-হাতে দুটো কেরোসিনের টিন, তৃতীয়টি পাচক, তার হাতের টিনে 'মাড়ি'— কয়েদিদের ফেনাভাত। ভাবী খানিকটা মাড়ি এনে ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন। বললেন— 'রাখি দিই কিছুটা, নয়তো খিদা পেইলে খাবা কি?'

কাজ শেষ ক'রে জমাদার তার দল নিয়ে চ'লে গেল। এবারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। হাত-মুখ ধোব জল কোথায়? বাঁধানো চৌবাচ্চা জঞ্জালে ভরা —শুকনো পাতা, পচা খড়, পাখির পালক— জল ছাড়া আরো কত-কী তাতে। মাপা খাবার জল থেকে একবাটি জল গড়িয়ে নিলুম। মায়া নাকে কাপড় দিয়ে জানালার কাছে বসে আছে। ভাবী বললেন— 'আসো, একটু মাড়ি মুখে দিবা —আসো।' মায়া 'উঃ' ব'লে নাকের কাপড় আরো টিপে ধ'রে ঘুরে বসে রইল। ভাবী বললেন, 'বলো তো এমনি কইরে কতদিন চালাইবা? ও রানীদি, তুমি একটু মায়াকে বুঝাই দেও না।'

'যত জ্বালা আপনাদের নিয়ে। কই— দিন, কী খেতে হবে'— ব'লে মায়া মেঝেয় যেখানে মাড়ির বাটি ছিল সেখানে এসে ধপ ক'রে বসল; ব'সেই খানিকটা মাড়ি মুখে দিয়ে চোখমুখ লাল ক'রে প্রাণপণ গিলবার চেষ্টা করতে করতে উঠি পড়ি বাইরে ছুটল। ভাবী বললেন, 'এই দেখ কাণ্ড— মুখ থেইকে ঠিক ফেলি দিবে সব।'

উঠোনের একপাশে খাটুনিঘর। বস্তা বস্তা চাল রেখে দিয়ে গেছে, সকালে ঝাড়তে বাছতে হবে। দু-তিনটি কুলোতে সমানে চাল ঝাড়া হচ্ছে। জমাদারনি কুলোর ওঠানামার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামনে উঠছে বসছে, এগুচ্ছে পিছুচ্ছে। কেউ চাল ঝাড়তে গিয়ে দুটো-একটা চাল ছড়িয়ে ফেলেছে কি— সে দু-হাত মুঠ ক'রে সেদিকে ছুটে কয়েদির দু-গালে বারকতক ঠোকাঠুকি ক'রে পিছিয়ে আসছে। তাতেও শান্তি নেই; দাঁত খিঁচিয়ে, মাথা বাঁকিয়ে, হাত বাগিয়ে একবার রুখে যায়— আবার হ'টে আসে। এই রকম খানিকক্ষণ চলবার পর এক সময় সে দু-হাত দু-কোমরে রেখে ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমার জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। জমাদারনির পরনে আজ লম্বা শাদা

টুইলের ঘাগড়া, গায়ে সেই কাপড়েরই লম্বা হাতওয়ালা জ্যাকেট— একটি শাদা চাদর দু-বার কোমরে জড়িয়ে একবার পিঠের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। চুলগুলি ঘাড়ের একপাশে টেনে এনে বাঁ-কানের উপরে জড়িয়ে ছুঁচোলো ক'রে বাঁধা। কপাল ও ঘাড়ের ছোটো চুলগুলি কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হাতে দু-গাছা রুপোর চুড়ি। নাকে ও কানে অনেক-গুলি ছোটো-বড়ো নানা আকারের ফুটো। আগে সে সব জায়গা জুড়ে হরেক রকমের গয়না ছিল হয়তো। এমনিতেই জমাদারনি লম্বা, তার উপরে লম্বা ঘাগড়াতে আজ যেন আরো লম্বা দেখাচ্ছে তাকে। সোজা, শক্ত ওর চলার বসার ভঙ্গি; কিছুতেই যেন মেরুদণ্ড বেঁকে না। কথা যে ও কোন্ ভাষায় বলে তা এখনো বুঝতে পারি নি। তেলুগু, হিন্দি, বাংলা, ওড়িয়া— সব মিলিয়ে ও একটা ওর নিজের ভাষা তৈরি ক'রে নিয়েছে। গলার স্বর মোটা— তায় ভাঙা, যা-কিছু বলে অদ্ভুত বিকট শোনায়।

জিগগেস ক'রে জানলুম বাড়ি ওর সম্বলপুর জেলায়। নাম ইন্দুমতী— জাতিতে ওড়িয়া। ঘরকন্নার খবরাখবরে নাকি মেয়েমানুষ মাত্রেরই মন নরম হয়, সেই ভেবেই ওর ঘরকন্নার খবর নিতে গেলুম— খ্যাঁক ক'রে উঠল। তবুও না দ'মে যা বলবার জন্য এগিয়ে এসেছিলুম তা বলতে মনস্থির করলুম। গলার স্বর যতটা পারা যায় মোলায়েম ক'রে বললুম— আচ্ছা ইন্দুমতী, তুমি কয়েদিদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বললেই তো পারো— ও-রকম গালাগালি মারধর করো কেন?

কথা শেষ না হতেই ইন্দুমতী গলার দু-পাশের শির দুটো ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। ঘাগড়া তুলে দু-হাতে দুই উরুর উপর চাপড় মারল, দুই বুড়ো আঙুল শূন্যে তুলে নাচাল— তারপর উঠোনময় উদ্দাম নাচ শুরু ক'রে দিয়ে বলতে লাগল— 'হামার কয়েদিকে হামি বকিব ঝকিব, মারিব কাটিব—। ফিন কোলে বি বসাবো— কে কি বলিবে, কৌন কি করিবে—। হামি কারো খাই, হামি কারো পরি— ? মুই যার খাইছি— সে বলিবে— তুমি বলিবার কৌন আছো ?'

মায়া বললে— 'থাক থাক— আর তোমার খাওয়া-পরা দেখাতে হবে না —যত সব ইয়ের জায়গা হয়েছে এটা।'

ভাবী বললে— 'কেবে কথা কইছ— গলার জোরে পারবা ? চুপ কইরে থাকো।'

গলায় আমার সরু একটি চেন হার। শাশুড়ির আদেশ, ছেলের মাকে নাকি খালি গলায় থাকতে নেই। এদিকে কারো নজর না পড়লেও ইন্দুমতীর নজর এড়ায় নি। কখন গিয়ে নালিশ লাগিয়েছে। জেল-কর্তৃপক্ষ এলেন, সেটি চাই। কেন?— না— বুড়ি কয়েদির গলার ভিতরে থলি আছে। জেলার বললেন, 'ধরুন আপনি যখন ঘুমিয়ে আছেন এক ফাঁকে সে যদি খুলে নিয়ে টক্ ক'রে একবার গিলে ফেলে— আর কিন্তু আমাদের সাধ্য নেই তা বের ক'রে আনি।'

বললুম— 'তা যদি হয় হোক, হার আমি খুলব না।'

'বেশ, তাহ'লে কিন্তু আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই মনে রাখবেন'— বলে জেলার চ'লে গেলেন।

দুপুরে বন্ধঘরে শুয়ে-ব'সে সময় কাটাচ্ছি— চারদিকে রোদ্দুর চন্‌চন্ করছে। পশ্চিমদিকে স্নানের জায়গা থেকে জল গড়িয়ে যাবার নর্দমা এই ঘরের তিন পাশ ঘুরে পুবদিকের উঁচু দেয়ালের ফুটো দিয়ে বাইরে চ'লে গেছে। কয়েকজন কয়েদি ঘরের বাইরে থাকে। তাদের চাল-ডাল-ভাঙা-ঝাড়ার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই। একজন বাটিতে ক'রে একটু একটু জল মাথায় দিয়ে গা-মাথা এক-সঙ্গে কোনোরকমে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। সেই জলটুকু তির্‌তির্ ক'রে গড়িয়ে যাচ্ছে নর্দমা দিয়ে। দুটো পায়রা নেমে এল সেখানে। দু-পায়ে ভর রেখে বুকটা মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা হেলিয়ে দিয়ে নর্দমা থেকে জল খেতে লাগল —থেমে থেমে, অনেকক্ষণ।

পশ্চিমদিকের দেয়ালের ছায়া বাড়তে বাড়তে উঠোনের অনেকখানি এগিয়ে এল। ইন্দুমতী ঘরের দরজা খুলে দিতে বাইরে এসে সেই ছায়াটুকুতে পায়চারি করতে লাগলুম। বুড়ি কয়েদি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিগগেস করলুম—

'হ্যাঁ বুড়ি, তুমি কী দোষ করেছিলে?— চুরি? কী চুরি?'

বুড়ি ঝুঁকে-পড়া পিঠটা সোজা ক'রে মাথা তুলে দু-দিকে দু-হাত মেলে নাচাতে নাচাতে বললে— 'এত্‌কে এত্‌কে সোনা, মাইজি— এত্‌কে এত্‌কে সোনা—।'

ইন্দুমতী সেই ছায়াতে একটা কম্বল বিছিয়ে হাঁটু অবধি ঘাগড়া তুলে দু-পা বের ক'রে বসল। বুড়ি তাড়াতাড়ি একটা টিনের কৌটো বের ক'রে ইন্দুমতীর পায়ে তেল মাখাতে লাগল।

সেবা পেয়ে ইন্দুমতীর মুখ প্রসন্ন। পায়চারি করতে করতেই বুড়ির পরিচয় পেলুম ইন্দুমতীর কাছে। বুড়ি জাতিতে তেলুগু— নাম দাসীপুসি। কলকাতার রাস্তায় যে-সব তেলেগু গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায়— এ তাদেরই একজন। বাড়িঘর দেশভুঁই ব'লে কিছু নেই। গাছতলায় এদের জন্ম, গাছতলাতেই এদের মৃত্যু। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, মাথায় শাদা শণের মতো এক ঝোপড়া পাকাচুল, গলায় লালপাথরের মালা, হাতে সবুজ আর লাল রঙের মোটা মোটা দানাকাটা কাচের চুড়ি। বেশির ভাগ সময়ে শুধু একখানি গামছা পরে থাকে। জেলের শাড়ির উপর তার বড়ো মায়া— পরতে পরতে যদি ছিঁড়ে যায়। এই দাসীপুসিকে ধ'রে এনেছে খড়গপুর থেকে পাঁচ সের সোনা-চুরির অভিযোগে। অনেকদিন আছে এই জেলে— আর দু-মাস বাদে ছাড়া পাবে সে।

পাঁচ সের সোনা— কম কথা নয়। জিগগেস করলুম— 'তা এত সোনা তুমি রাখলে কোথায়?' বুড়ি হাঁটু গেড়ে ব'সে পেটের কাপড় খুলে থলথলে কোঁচকানো পেটটা দু-হাতে টিপে দেখিয়ে বললে— 'ইয়ারে মা— ইয়ারে।'

ইন্দুমতীর পা-টেপা শেষ হলে দাসীপুসি তার পরনের গামছার কোনা দিয়ে ইন্দুমতীর পায়ের তেল মুছে পরিষ্কার করে টিনের কৌটো হাতে নিয়ে ঘরে গেল। ইন্দুমতী দেয়ালে পিঠ ঠেস দিয়ে আরামে চোখ বুজল।

মা-মাসি-দাদা-ভাই ডেকে ভাবী সকলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতে পারেন ব'লে খ্যাতি তাঁর। এখানে যাদের নিয়ে আমাদের দিন কাটাতে হবে ভাব ক'রে তাদের বশে আনবার ভার আমাদের তরফ থেকে পড়েছে ভাবীর উপরেই।

ভাবী একসময়ে এসে ইন্দুমতীর কম্বলের একপাশে তার গা ঘেঁষে বসলেন। বসে দু-একটা কথাবার্তার পর আদর ক'রে ডান হাতে ইন্দুমতীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললেন— 'এ জমাদারনি মাঈ, তুমি কি এটা বুঝ না যে, আমরা কিছু চুরি কইরে এখানে আসি নাই। তবে কেনে তুমি আমাদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করছ? এটা কি ভালো হচ্ছে?'

ইন্দুমতী এক ঝটকায় গলা থেকে ভাবীর হাত ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে ব'সে ভেংচি কেটে দুই বুড়ো-আঙুল ভাবীর মুখের কাছে এনে চেঁচিয়ে উঠল— 'ভালো কি মন্দ আছে তোমি হামাকে শিখাবে কি? হামি ডেটিন জেলমে থাকেসি, হামি হিজলি জেলমে থাকেসি— হামি আজ কেত্ত বরষ এই কাজ

করেসি। মোতে কেউ পারলো না শিখাতে আউর তোমি শিখাবে? মুঁই যা ভালো বুঝিব, করিব— তোমি বলবার কৌন হোবে? হামার নোকরিমে যে হুকুম হ্যায়— জরুর তা করবে।'

মায়া থাকতে না পেরে ধমকে উঠল— 'নোকরি তোমার চুলোয় যাবে— ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে।'

ভাবী ব'লে উঠলেন— 'ধ্বংস হোক— ধ্বংস হোক, এই জেলখানাতে আগুন লাগুক—।'

ইন্দুমতী লাফিয়ে উঠল, 'তোরা ধ্বংস হ'— তোদের মাথা-মে আগুন লাগুক— জেলখানামে কেন লাগবে? তোয়ারা পুড়ে যা— পুড়ে যা— তোদের মুখ পুড়ুক, মাথা পুড়ুক, চুল পুড়ুক, নাক পুড়ুক, কান পুড়ুক—' বলতে বলতে ইন্দুমতী যেন আমাদের এক একজনকে শূন্যে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলছে— এই ভঙ্গিতে নিজের দু-হাত মাথার উপরে তুলে নিচের দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। তাতেও তার ঝাল মিটল না, আমাদের নামে নাকি কেস করবে আপিসে! সেইভাবেই ফটকের দিকে ছুটল। মায়া ওর ছোটার তালে তালে হাততালি দিয়ে উঠল।

দাসীপুসির আজ ইণ্টারভিউ। সাতমাস পরে আপনজন খোঁজ নিতে এসেছে। ফাইলে তোলা ফরসা শাড়িখানা পরে সে সেজেগুজে তৈরি। ইন্দুমতী এসে তাকে নিয়ে গেল— কিছু পরে ফিরিয়েও দিয়ে গেল।

সন্ধের দেরি নেই। বিকেলের খাওয়া দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকলুম। দরজায় তালা পড়ল— ইন্দুমতী চ'লে গেল।

পরিষ্কার আকাশ— পশ্চিম আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ পাশের জানালার ভিতর দিয়ে বরাবর দেখা যায়। হালকা চাঁদের আলো হালকা আলোছায়া ফেলে কী এক ভাবে ভ'রে দিয়েছে— ভিতরে বাইরে। জানালার পাশে মায়া ব'সে গান গাইছে— 'কাঁদিয়া আকুল গোপিকাকুল— হা রাধানাথ বলি।' অশথ গাছের পাতাগুলি ঝির্‌ঝির্ ক'রে উঠল, বাইরে বুঝি হাওয়া বইল। আকাশে মেঘও একটু দেখা দিল। দেখতে দেখতে সেই মেঘ এসে চাঁদ, চাঁদের আলো সব ঘিরে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে উঠে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে তিনজন শুয়ে পড়লুম। ঘুম আর আসে না। সবই কেমন থম্‌থম্ করছে। পাশ ফিরব—

সেই শব্দটুকুও কানে লাগে। চোখের উপর হাত দিয়ে একভাবে শুয়ে আছি—আর মনে পড়ছে কত কী!

তখন বোধ হয় মাঝরাত্তির। হঠাৎ শুনি ঘরের ও-কোনায় কে যেন চাপা কান্না কাঁদছে। উঠে বসলুম। ছাদের সিলিং-এ ঝুলছে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন— তেল ফুরিয়ে এসেছে— আলোর চেয়ে নিচে তার ছায়া অনেক বেশি। অন্ধকারে কান্নার নিশানা রেখে ভাবী কোণ বরাবর এগিয়ে গেলেন। দাসী-পুসি পা থেকে মাথা অবধি কাপড় মুড়ি দিয়ে কোনায় শুয়ে কাঁদছে। ভাবী বললেন, '—কী হল— এ বুড়ি মাঈ— কী হল তোর ?'

দাসীপুসির কান্না আরো উথলে উঠল। ভাবী কী করবেন ঠিক না পেয়ে দাসীপুসির হাত পা কোমর টিপতে লাগলেন। আহা বেচারি! সারাদিন মন মন চাল ঝাড়তে ঝাড়তে বুঝি ওর গা-হাত ব্যথা করছে। খানিক বাদে দাসী-পুসি নাক ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বসল। আজ বিকেলে ওর ভাইয়ের মেয়ে আর ছেলের ঘরের নাতনি এসেছিল দেখা করতে। দাসীপুসি বললে— 'নাতনি কইল, "তুই কবে আসিবি— আমাকে মা মারুছি, বাপ মারুছি।"—নাতনি আমাকে বারে বারে এই কথা কহিলা মা'— ব'লে আরো হাউমাউ করে দাসী-পুসি কেঁদে উঠল।

ভাবী আদর ক'রে পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন— 'তা কী করবা তুমি। একবার এইনে ভইরাছে এখানে, যতদিন না ছাড়বে ওসব কথা আর ভাবিও না। মিছা কেনে কষ্ট পাবা মনে।' ব'লে ভাবী আবার তার পা টিপে দিতে লাগলেন। শেষে এ-কথা ও-কথার পর বুড়ির মনটা প্রফুল্ল করবার জন্য ভাবী বললেন— 'আচ্ছা বুড়ি মাঈ, তোর বুঢ়া কিছু বইলে পাঠিয়েছে ? সে কেনে আসে নাই দেখা করতে ?'

বুড়ি খেঁকিয়ে উঠল, 'মরুক গা বুঢ়া'— তারপর গলার স্বর নরম ক'রে বললে— 'মোর নাতনিটা— মা কহিলা—'

ভাবী হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা বুড়ি মাঈ— তোর বুঢ়ার জন্য টান নেই— আর আমার প্রাণ কেনে আমার বুঢ়ার জন্য কেমন-কেমন করে ?'

বুড়ি ঘাড় ফিরিয়ে ভাবীর মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'রে বলল— 'তুমি যে জোয়ান আছ ?'

মায়া খিক্‌খিক্‌ ক'রে হেসে উঠল। ভাবী লজ্জা পেয়ে বুড়িকে এক ঠেলা দিয়ে উঠে এলেন। আমি বালিশটা নিয়ে গুমোট ঘরের দরজার কাছে ঠাণ্ডা মেঝেতে গড়িয়ে গেলুম।

তিন

সকাল থেকে সময় আর কাটে না; ব'সে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, গল্প ক'রে সময় কাটিয়ে ক্লান্তি এসে গেছে। হাতের কাছে করবার কিছু নেই। বাইরে কী ঘটছে কিছু জানি নে, নিজেরাও একে অন্যের কাছে বহু পুরোনো হয়ে গেছি, এমনি মনে হয়। সকাল হলেই ভয় হয়, দিন কাটবে কী ক'রে। জেলার আসেন মাঝে মাঝে, চশমার উপর দিয়ে তাকান, পানভরা মুখে বাঁকা হাসি হাসেন, চ'লে যান। মায়া বলে— 'এটাকে দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়—। এতদিন এসেছি, কবে যে ছাই conviction হবে জানি না— একটা হেস্তনেস্ত হলে তবু বুঝি। না পাই কিছু পড়তে, না পাই কিছু লিখতে; হাত-পা-কাটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকা যায় কখনো? আচ্ছা, একটা বইও কেন এরা আমাদের পড়তে দিচ্ছে না বলুন তো, আমরা কি মানুষ নই? কী ভেবেছে এরা আমাদের— অ্যাঁ?'

ছেলেদের ইয়ার্ডে ঘন ঘন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি উঠল। ঐ বুঝি আবার কেউ এল। মায়া ছুটল বাইরে। কতদূর আর যাবে— দরজা বন্ধ। ফিরে এসে আবার ঘুরল, শেষে কুয়োর উপরে উঠে দাঁড়াল; বলল— 'আসুন, আমরাও এখান থেকে বলি। আমি বললেই আপনারা ধরবেন কিন্তু জোরে, বলুন— বন্দেমাতরম্‌।' মিনিট তিনেক চেঁচাবার পর মায়া কুয়োর উপর থেকে নেমে এল— মুখ ভার ক'রে বলল— 'আচ্ছা, আমাদের কেউ আসছে না কেন? ওদের তো আসবার কথা। কী যেন ছাই— ভালো লাগে না।'— ব'লে দু-হাত বুকে জড়িয়ে দুপদাপ ক'রে ঘরে ঢুকল।

কর্তৃপক্ষের কী দয়া! দুপুরে একটি বালি কাগজের খাতা ও একটি পেন্সিল দিয়ে গেল। প্রতি পাতায় নম্বর লেখা, যেন ছেঁড়া না যায়। মায়া বললে —'হ্যাঃ, ইচ্ছে করলে না-করা যায় কী? লুকিয়ে চিঠি লিখতে হ'লে কাগজের অভাব? যত বাজে কড়াকড়ি তেমন উপায়ও বের হয় কত কত!— জানেন,

অমুক জেলে অমুক কি করত?...যাক সে-কথা। কতদিন পরে খাতা পেন্সিল হাতে পেলুম, কিন্তু কী করি?'

ভাবী বললেন, 'আঁকেন কেনে কিছু?'

কী আঁকব! মাথা, মন, হাত সব আড়ষ্ট। তবু কিছু-একটা করা যাক ভেবে ইন্দুমতীকে ডাকিয়ে সামনে বসিয়ে স্কেচ করতে লাগলুম। ভাবী কাছে ব'সে ওর সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। ইন্দুমতী আমাদের সাবধান করে ঘরের পশ্চিম-দিকের দেয়াল দেখিয়ে নিজের ভাষায় বললে—'দেখ, সাবধান! তোমরা কেউ এদিকে পা দিয়ে শুয়ো না যেন; এদিকে জেলের ভিতরে পিরবাবা আছেন। এই জেলখানা পিরবাবার। বাবা রাত্রে রাত্রে জেলখানা ঘুরে দেখেন। বাবার পরনে শাদা ধপধপে সালোয়ার, গায়ে চাপকান, মাথায় পাগড়ি— গায়ের কী রঙ! জ্যোতি বের হয়। কী সুপুরুষ! আর—এই লম্বা'— ব'লে ইন্দুমতী উঠে পায়ের বুড়ো-আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাবার উচ্চতার সঠিক মাপ দেখাল। বললে— বাবা তাঁর দুই ছেলে নিয়ে এখানে আছেন— একটি নিমগাছের তলায় তিনটি কবর পাশাপাশি। পিরবাবা মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চেপেও বের হন। ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত্রে অনেক কয়েদি দেখেছে তাঁকে। ইন্দুমতী স্বয়ং তাঁকে নিজের চোখে দেখেছে। তিনি সকলের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করেন— জাগ্রত পিরবাবা!

ভাবী বললেন—'তা পিরবাবা কি আমাদের মনের ইচ্ছা জানতে পারছেন না? তিনি আমাদের এই জেলখানা থেকে বের কইরে দিচ্ছেন না কেনে?'

ইন্দুমতী খুদে খুদে চোখ পাকিয়ে নিচের ঝুলে-পড়া মোটা ঠোঁট আরো ঝুলিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে বললে—'ও-কথা বোলো না। এই জেলখানা থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না— পিরবাবার মাহাত্ম্যে তা হবার জো নেই। যে কয়েদি পালাবার চেষ্টা করেছে বা ভেবেছে সে-ই কানা হয়ে গেছে। পথ খুঁজে পায় না, কেবল দেয়ালে দেয়ালে মাথা ঠুকে যায়। এইতো কিছুদিন আগে একটা ষোলো বছরের কয়েদি, জেলবাবুর বাড়িতে কাজকর্ম করে, বাড়ির মা, দাদা, দিদি তাকে ভালোবাসে— বেশ আছে; হঠাৎ তার কী দুর্মতি হল, জেলখানা থেকে পালাবার ইচ্ছে হল। অমনি চোখে আর কিছু দেখতে পায় না। এ-দিক দিয়ে পালাতে যায়, মাথায় দেয়াল লাগে, ও-দিক দিয়ে যায় তা'ও ঐরকম। কানা হয়ে গেছে একদম। দু-হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে যায় আর

ঠকঠক ক'রে ঠোক্কর খায়। কপাল দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল, প'ড়ে প'ড়ে পা মচকে গেল··· একটা সিপাই শেষে দেখতে পেয়ে বললে— 'হাঁ রে কী হল তোর?' ছেলেটা বললে—'কী জানি, কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছি না। যেই থেকে মন হল কি পালাব সেই থেকে চোখ কেমন হল— আঁধার দেখছি কেবল।' সিপাই তো সব জানে, বুঝল কী ব্যাপার; তাকে ধরে এনে রেখে দিল 'নম্বরে'। বললে, 'আর কখনো এমন ভাবিস না; এখানে পিরবাবা আছেন, তাঁর জায়গায় এ হবার জো নেই। কাহিনী শেষে ইন্দুমতী আবার আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বললে, 'কখনো এমন কথা ভেবো না। ভেবেছ কি তোমাদের চোখ কানা হয়ে যাবে, আর দু-হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে যেই চলবে— অমনি মাথায়— এ-ই এমনি ক'রে ক'রে ঠোক্কর খাবে'— বলে ঘরের এ-পাশে ও-পাশে দেয়ালের কাছে গিয়ে গিয়ে ঠোক্কর খাওয়ার ভঙ্গি ভালো ক'রে দেখিয়ে তার পরিণামটাও বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিল।

মায়ার একটা রোগ, কথায় কথায় মুখে কাপড় দিয়ে খিক্‌খিক্ হাসে। ইন্দুমতী দেখে রেগে আগুন। ভাঙা গলা খন্‌খন্ ক'রে উঠল—'হেসো না বলছি, ভালো হবে না— জাগ্রত পিরবাবা— সর্বনাশ হয়ে যাবে। এইতো দু'মাস আগে এক অন্য সাহেব ছিল আপিসে, বিনা দোষে আমাকে বারোটাকা জরিমানা ক'রে দিল। আমি বললুম, 'হে পিরবাবা, তুমি এর সত্য বিচার করো। তাঁকে জোড়া-খাসি দিয়ে পুজো দিলুম। সাহেব কী কাজে কলকাতায় গিয়েছিল— ঠিক চারদিনের দিন খবর এল সাহেব ম'রে গেছে। ব্যস'— ব'লে ইন্দুমতী ঠোঁট কামড়ে বাঁ-হাতের তেলোতে ডান হাত দিয়ে জোরে চাপড় মেরে হেসে উঠল। সেই মুখে সেই পুরু, ওলটানো ঝুলে-পড়া ঠোঁটে সেই উৎকট হাসি ঘরের হাওয়াতে এক বীভৎস বিভীষিকা ছড়িয়ে দিল। হাতের পেন্সিল ফেলে দিয়ে খাতা বন্ধ ক'রে উঠোনের ছায়াটুকুতে এসে বসলুম।

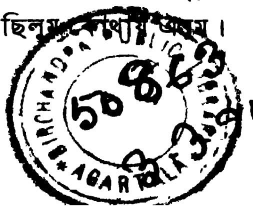
বাইরে আবার ঘন ঘন বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠল— আবার মায়া ছুটল, কুয়োর উপরে উঠল, চিৎকার করল 'বন্দে মাতরম্'—। এবারে কিন্তু জেনানা ফাটকের দরজা খুলে গেল— শান্তি, এলা হাসিভরা মুখে ভিতরে ঢুকল।

চার

কিছুদিন পরে মমতা নন্দিতা ভবানীও এসে গেল। এখন আমরা দলে বেশ ভারি। নতুনদের কাছে নতুন খবর পেয়ে, নতুন গল্প শুনে সুখে দিন যায়। Conviction-ও হয়ে গেছে কারো কারো। ইংরেজি খবরের কাগজ পাই, লাইব্রেরির বইও মেলে মাঝে মাঝে। খাওয়া, বসা, শোওয়া, পড়া, গল্প, গান দিয়ে গোটা দিনের সব সময়টা একরকম বেশ ভাগ ক'রে নেওয়া গেছে।

কুয়োর অর্ধেক দেয়ালের ও-পাশে। আড়াআড়িভাবে অনেকগুলো কাঠ কুয়োর মুখে— কেউ যেন না জলে ঝাঁপ দিতে পারে। কুয়োতে ঝুঁকলে ও-পাশের লোক এ-পাশের জনার মুখ দেখতে পায়। ও-পাশের কুয়োতে সেপাই পাহারা দেয়— কেউ যাতে মুখ না দেখায়। সেপাই বদলায়— তাদেরই নতুন নতুন মুখ দেখা যায়, কারো কারো সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টাও হয় মাঝে মাঝে। এক-দিন সকালে হেড্-জমাদার ঘন বোনা বাঁশের বাতার চাটাই দিয়ে কুয়োর মুখটা আচ্ছা ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে গেল— মুখ দেখবার, দেখাবার কোনো উপায় রইল না। এক হিসেবে ভালোই হল। উঠোনে কোথাও একটু বসবার জায়গা নেই, বাইরে বসবার একটা জায়গা মিলল তবু। শান্তির এ-জায়গাটি বড়ো প্রিয়। দুপুরের কড়া রোদে যখন দেয়াল ঘেঁষে কুয়োর উপর দু-হাত চওড়া ছায়া পড়ে, শান্তি দুটো বালিশ হাতে নিয়ে বলে, 'চলুন, কুয়োর উপরে শুয়ে নিরিবিলি একটু সুখদুঃখের গল্প করা যাক।'

কয়দিন থেকে অনবরত বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে মাটিতে হেঁটে সুখ নেই। যে যার বই খাতা, সেলাই হাতে নিয়ে কুয়োর উপরে বসে গান ধরল— 'মন রয় না রয় না ঘরে— চঞ্চল প্রাণ'। উপরে নীল আকাশে সরু শাদা চাঁদ। কোন্ কবি যেন বলেছিলেন এই চাঁদকেই— যে 'কনের কপালের চন্দনটি'। গান শেষ হয়েও শেষ হয় না— বারে বারেই লাইন ঘুরছে— 'মন রয় না— রয় না রয় না ঘরে'; যেন থামতে চাইছে না লাইনটা। এমন সময়ে হুড়মুড় ক'রে একদল মেয়ে ভিতরে ঢুকল। কোলে কাঁখে ছেলে-মেয়ে— তাদের কান্নাকাটি, চেঁচামেচি, ইন্দুমতীর ধাক্কাধাক্কি— বিরাট শোরগোল;— মুহূর্তে সুরে বেসুরে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। হঠাৎ মনে হল কোথায় ছিলুম, কোথায় এলুম।



ইন্দুমতী তাদের ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে এল। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতীতে তারা ষোলজন। প্রত্যেকের কোলে একটি করে শিশু, পরনে এক-এক টুকরো ময়লা ন্যাকড়া, শুকনো মুখ, চোখ ব'সে গেছে ; ধুলোমাখা চুল, গায়ে দুর্গন্ধ— দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি এক-একটি যেন।

আমরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালুম। একই গ্রামের মেয়ে-বউ তারা— জাতিতে মুচি। সমানে খেতে পায় নি কয়দিন— দু-মুঠো চাল জোটে নি। ছেলেরা 'ভাত' 'ভাত' ক'রে কাঁদে আর মাটিতে লুটোয়— মায়ের প্রাণ এ সইতে পারে না। গোরুর গাড়ি বোঝাই চাল যাচ্ছিল মহাজনের ঘরে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে— সকলে মিলে লুট করলে তা। বুড়ি মুচি বললে, 'বস্তা থেকে চাল মাটিতে ছড়ায় পড়েছে— ধুলোবালি মাখা চাল আধসের আড়াইপোর মতো এই আঁচলে ক'রে নিয়ে এসেছিলুম ; সেই চাল খেতেও পারলুম না, তেমনি পড়ে রইল, পুলিশরা আমাদের যাকে সামনে পেল ধ'রে নিয়ে এল।'

ভাত, ডাল দিয়ে গেল কয়েদিদের জন্য। ইন্দুমতী তাদের ঘাড়ে ধ'রে ধ'রে টিনের থালার সামনে বসিয়ে দিল। একগ্রাস ভাত মুখে দিয়েই তারা হাত গুটিয়ে রইল। বলে, 'একটা লঙ্কা পেঁয়াজ ছাড়া এ কেউ মুখে তুলতে পারে ?'

ইন্দুমতী বললে— 'ভাত ন খাইতে পাইসো। চাল চুরি করকে জেলমে আইস— আবার নিমক চাই— লঙ্কা চাই— এটা তুয়ার ভাতার ঘর মিলিসে— না ? খা, খা, খালে জলদি'— ব'লে হাতের কাছের জনাকয়েকের মাথায় চাটি বসিয়ে দিল। আমরা উঠে পড়লুম। রোদ্দুরে দেওয়া শাড়ি জামাগুলো ঘরে নিয়ে পাট করা হল, ঘর ঝাঁট দেওয়া হল, বিছানা পাতা হল ; এবারে খাওয়াও শেষ ক'রে নিতে হবে। থালা নিয়ে বসেছি সবাই। ইন্দুমতী ঝংকারে হুংকারে চারদিক মাতিয়ে তুলল। দেখি— মুচিনিরা দল বেঁধে দৌড়ে একবার লম্বা উঠোনের ওদিকে যাচ্ছে— একবার এদিকে আসছে ; আর ইন্দুমতী পিছু পিছু তাড়া করছে ভীত গোরুর পালের পিছনে যেমন করে বিব্রত রাখাল লাঠি হাতে। কী ব্যাপার— কী হয়েছে ? ইন্দুমতী হাঁফাতে হাঁফাতে গলার বিকট আওয়াজ বের ক'রে বললে, 'মুই আউর কী করি বুঝাবো গো ? জলাতন হই গেসি হামি। হামার জান না নেকালে আর শাস্তি হোবে নেই। ইলোগদের কেত্না দফা বলিসি— খানা পিনা হো গেল আভি ভিতরমে তুরা যা— তা কিছুতেই ইয়ারা শুনিব না। নসিবমে হামার কেত্না দুখ দেখো। আফিস্‌মে

রোজ দরখাস্ত দেই কিরি মুই হয়রান হই গেলাম— মোতে ছুটি দে, ছুটি দে। তা উয়ারা কভি শুনতা নেহি— আমি বি আউর পারব নেহি।'

ভাবী মুচিনিদের বললেন— 'কী দেখছিস তোরা হা কইরে? ঘরে আয়— আমরা আছি দেখছিস না? আয়।' 'তাই বলো বাছা— আমরা উয়োর কথা বুঝতে লারছি। ওর লাফ-ঝাঁপ দেখে আমাদের সব কাঁপুনি লেগে গেল গো'— ব'লে লম্বা লম্বা মুখ করে মাথা নাড়তে নাড়তে তারা এসে ঘরে ঢুকল।

দিনের সময় কাটে নানা গোলমালে, রাতের সময় নিয়েই মুশকিল যত। একপ্রহর কাটে তো অন্য প্রহর কাটতে চায় না কিছুতেই। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া অন্য আর কোনো উপায় নেই। দু-একটা বই যা আছে— পড়ব কি— লণ্ঠন থাকে মাথার উপরে কোন্ উঁচুতে ছাদে আটকানো লোহার শিকে ঝোলানো। বিকেলে লাঠির ডগা দিয়ে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়ে যায়, সকালে এসে খুলে নেয়। কয়েদিরা যেন নাগাল না পায়— কেরোসিনের আগুনে পুড়ে মরে যদি! মশারি টানাবার দড়ি বরাদ্দ নেই— গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে যদি কেউ! মায়া বলে, 'কয়েদিদের রক্ষা করবার জন্য কত সতর্ক এরা— কতখানি ভাবে দেখুন। এমন নিরাপদ জায়গা কোথায় আছে আর?'

ঘরের একপাশে শুয়ে আছে মুচিনিরা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে। শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের বুকে। মায়েরা উসখুস করছে শুয়ে শুয়েই। বেচারারা!— জেল সম্বন্ধে কত আতঙ্ক ওদের; ঘর দোর আত্মীয়-পরিজন ছেড়ে এসেছে। কী ভাবে দিন যাবে, কতদিন থাকতে হবে, কী শাস্তি পাবে; কিছুই জানে না— সামনে ঘন অন্ধকার।

একজন কাশতে কাশতে বুকে হাত দিয়ে উঠে বসল। পাশের মেয়েটি বলে —'এগোঁই যা না; আমার গায়ে কিন্তু বাঁত ক'রে দিস নালো।' কিছুকাল থেকে তার রক্তবমি হচ্ছে। যখন ধ'রে আনে তখনো তার গলা দিয়ে গলগল ক'রে রক্ত পড়ছিল। সে বলল— 'দারোগাবাবুর পায়ে ধরলুম, আমাকে নিয়ে যেয়ো না গো— তা উ শুনলেক না। বুকে যে কী হল— শরীরের রক্তটুকু এমনি ক'রেই বেরোঁয় যাবেক—।'

এক বুড়ি সুর ক'রে কান্না জুড়ে দিল। ভাবী গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন —বুড়ির কান্নার সুর আরো চড়ল। না জানি— নাতি-নাতনিদের মুখ মনে পড়ছে— আহা! বেচারা—

ভাবী বললেন— 'কেনে বুড়ি কী কথা মনে হইল?' বুড়ির কান্না থামে না; শেষে ভাবীকে অনেক হয়রান করার পর বললে— 'পেটে কামড় দিইছে —ঘাট্‌কে যাব।'

ভাবী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঘাট এখানে কোথায় পাবা? এখন শুইয়া ঘুমাও নয়তো ঐখানে যাও—' ব'লে, ঘরের এক কোনা দেখিয়ে দিলেন। বুড়ি নাকি-স্বরে কেঁদে বলল— 'জীবন-ভোর ঘাটকে গেলেম, আর আজ ওখানে যাব কেনে?' 'তবে তুমি থাকো বইসে'— ব'লে ভাবী স'রে এলেন।

এবারে ষোলোজন মুচিনিই একসঙ্গে কান্না শুরু ক'রে দিল। এলা, শান্তি উঠে বসল। ভবানী, নন্দিতা ব'সেই ছিল— উঠে দাঁড়াল। পাশ ফিরে মায়া ভাবীকে বলল— 'যান, এবার সামলান গিয়ে— ষোলোজনকে ঘাটের পথ বাতলান!'

কিন্তু এবারে আর ঘাটের পথ নয়। মায়ের বুক মোচড় খাচ্ছে— এ তারই কান্না। কোলেরটি ছাড়া অন্য সব শিশুপুত্রদের ছেড়ে আসতে হয়েছে। নিঝুম রাতে সেই মুখগুলি স্পষ্ট চোখে ভাসছে। এ-ই প্রথম তারা মার কোল ছাড়া। মার বুক কি ঠাণ্ডা হয় সহজে? থেকে থেকে সে কান্না গুমরোতে থাকল সারারাত ধ'রে।

পাঁচ

এখানকার কাক, পায়রাগুলির সঙ্গে অনেকটা ভাব হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ভাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা নেমে এসে ভাত খেত না, লাইন ক'রে সব দেওয়ালের মাথায় ব'সে অপেক্ষা করত, যতক্ষণ-না স'রে যেতুম সেখান থেকে। এখন তাদের ভয় কমে গেছে। ভাত ছড়িয়ে দিতেই ঝাঁকে ঝাঁকে দাঁড়কাক, পাতিকাক, পায়রাতে শালিকে উঠোন ছেয়ে যায়। মাঝে মাঝে একটা বুড়ো চিল অশথগাছ থেকে ঝুপ ক'রে নেমে পড়ে। চিল নেমে এলেই কাকগুলি স'রে যায়— দূরে ব'সে থাকে। চিলটা ধীরে সুস্থে তার খাওয়া শেষ ক'রে উড়ে গেলে পর তখন কাকগুলি এসে সে-জায়গা আবার দখল করে। বড়ো ভালো লাগে এদের দেখতে। আবার এক-একদিন করে কি—

কী হয়— একটা কাক কা কা ক'রে ডেকেই অশথ-ডালে উড়ে গিয়ে বসে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সব কাকগুলিই কা কা রবে যে যেখানে থাকে খাওয়া ফেলে উড়ে যায়; ডালে বসে খানিক অপেক্ষা ক'রে তারপর দেওয়ালের মাথায় আসে, সেখানে খানিক অপেক্ষা ক'রে চার-পাঁচটা কাক আবার উড়ে উড়ে চারদিকে দেখে একসময় হঠাৎ সব টুপটাপ নেমে পড়ে; তাড়াতাড়িতে খাওয়া শেষ ক'রে ফের উড়ে চলে যায়।

মমতা বলে, 'ইন্দুমতীর ভয় ওদেরও আছে। জেলের ভাত খাচ্ছে কয়েদি না হয়ে— আপিসে রিপোর্ট ক'রে বসে যদি ইন্দুমতী!'

আর আছে এখানে রোগা দুটো হ্যাংলা হুলো— গায়ে হালকা কালো-হলুদে চক্কর। দিনে তাদের দেখি নে বড়ো। রাত্তিরে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আসে, টিনের থালা-বাটি ঠন ঠন করে। কিন্তু কী আছে যে খাবে। থাকলেও ওদের চেয়ে হ্যাংলা আমরাই বেশি। একদিন হাসপাতালের ডায়েটের সঙ্গে দুধ এসেছিল একটু। দুধ না খেয়ে মায়া দই জমাবে। বলে—'কতদিন দই খাই না; আর দই জমলে সবাই একটু একটু ক'রেও খেতে পারব, দুধে তো আর তা চলবে না।' কিন্তু রাখে কোথায়? রাত্তিরে হুলোর উৎপাত! শেষে মায়া দুধের বাটি বুকে নিয়ে মশারির ভিতর ঢুকল। ফলে অতি নাড়ানাড়িতে দই তো জমলই না, দুধের দুর্ভাবনায় মায়ার সে রাতে ঘুমও হল না। সকালে মশারির ভিতর থেকে দুধের বাটি ঠেলে দিয়ে বললে—'যন্ত্রণা, যত দায় যেন শুধু আমারই। আমায় কেউ ডাকবেন না, আমি চা টা কিছু খাব না ব'লে মায়া পাশ ফিরে শুয়ে রইল। কিন্তু খানিক ক্ষণ যেতে-না-যেতে সাত-তাড়াতাড়ি মায়াই উঠে সেই দুধ দিয়ে চা বানিয়ে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু ক'রে দিল।

এখানে হনুমানও আছে একটি— কাছাকাছি কোথাও থাকে। প্রায়ই সকালে বিকেলে ছাদের কার্নিশ বেয়ে হুপ হুপ করে লাফিয়ে আসে। ভাতের বদলে দু-একজন রুটি নিই। বাড়তি রুটি হনুমানটাকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই, সে লুফে লুফে নেয়; চারদিকে কুত কুত ক'রে তাকায় আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। খাওয়া শেষ হ'লে মুহূর্ত দেরি না ক'রে নিমেষে অদৃশ্য হয়! বাইরের প্রাণী-জগতের সঙ্গে এইটুকুই তো আমাদের সম্পর্ক।

আজও রুটিহাতে দাঁড়িয়ে আছি। হনুমান এক-একখানা লুফে নিয়ে ছিঁড়ে

ছিঁড়ে খাচ্ছে। ভাবী এসে বললেন—'আজ সকাল থেইকে ইন্দুমতী লেবুগাছটার আড়ালে দাসীপুসিকে নিয়া অত কি কথা কইছে? ঐ দেখ—'

ছোট্ট লেবুগাছ, ছোট্ট এতটুকু ছায়া, ছোট্ট তার আড়াল— সেই আড়ালেই ইন্দুমতী আমাদের দিকে পিছন ফিরে নিচু গলায় দাসীপুসির মুখের কাছে হাত নেড়ে মাথা নেড়ে কী যেন সব বলছে, বোঝাচ্ছে। দূর থেকে তাদের কোনো-কথা কানে আসে না। তবে ইন্দুমতীর ভাবে ভঙ্গিতে মনে হ'ল বিষয়টা গুরুতর কিছু। দাসীপুসি কিন্তু স্থির, নির্বিকার; মুখের ভাবে মনেও হয় না কোনো কথা সে শুনতে পাচ্ছে বা সামনে কেউ উপস্থিত আছে। দাসীপুসি যখন হাত-পা মুড়ে জবুথবু হয়ে ব'সে থাকে— ঠিক যেন ছেলেবেলার গল্পে পড়া ডাইনিবুড়ি। কালোমুখে একমাথা শাদা চুল— কটা দুটো চোখ— দূর থেকে চোখের শাদায় কটা মণি মিশে যায়। শুধু দুটো শাদা শাদা চোখ সে কালোমুখে অতি ভয়ংকর দেখায়। অনেক ক্ষণ কথা বলার পর ইন্দুমতী মাথা হেলিয়ে দাসীপুসির মুখের সামনে দুহাতের দশটা আঙুল বারে বারে টান করে মেলে ধ'রে হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। এবারে দাসীপুসি ন'ড়ে উঠল। ইন্দুমতী পিছন ফিরতেই সে দাঁতে দাঁত চেপে হাতের আঙুলগুলি মট মট ক'রে ফুটিয়ে দিল। ভাবখানা ইন্দুমতীর ঘাড় মটকাল। দেখে ভাবী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন।

ইন্দুমতী বাইরে চ'লে যেতে ভাবী দাসীপুসির কাছে গিয়ে বললেন—'হারে বুড়ি মাঈ— ও তোকে কী বলছিল?'

দাসীপুসি বললে— 'সোনা চাহিল, সোনা! বলে— তম্ পাশে সোনা আছে— মোতে টিকে বাহার করি দে— কানের ফুল গড়িব।'

ভাবী বললেন— 'তা দশটা আঙুল দেখাল কেন?'

— 'দশটঙ্কা দিব— কহিলা সে। মোর কাছে সোনা কৈ— থাকিলে না দিব?' ব'লে দাসীপুসি রেগে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

ভাবী টেনে তাকে আবার বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে বললেন, —'আচ্ছা মাঈ, বল না কেনে তোর গলায় কোথায় থলি আছে? ইন্দুমতী বলে যে তোরা নাকি গলার ভিতরে সিসার গোল বল সুতো দিয়ে বেঁধে গিলে রাখিস— তখন সিসাটা গলার মাংস খেইয়ে ফেলে, গলায় গোল গর্ত হইয়ে যায় —আর তোরা সুতো ধইরে টান মারিস, সিসার বল উইঠে আসে! তারপর

সেই গর্তে তোরা টাকাপয়সা সোনাদানা গিলে গিলে রেখে দিস— আবার ইচ্ছা মতো তুইলে আনিস। ইন্দুমতী নাকি দেইখাছে যে তুই সেদিন গলা থেকে সোনা বের ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে হাতে নিয়ে ধুইছিলি, ইন্দুমতীকে দেখতে পেয়ে টক ক'রে গিলে ফেললি ?'

শুনে দাসীপুসি হাঁউমাঁউ ক'রে উঠল— 'মিছারে কউছি মা— স-ব মিছারে কউছি।'

ভাবী বললেন, 'তবে যে সে বলে তোর গলার বাঁদিকে থলি আছে— দেখি তো টিপে ?' সঙ্গে সঙ্গে সকলে গিয়ে দাসীপুসির গলা টিপে দেখতে লাগলুম। দাসীপুসি নির্বিবাদে ডানদিকে ঘাড় হেলিয়ে গলা আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ব'সে রইল। কিন্তু থলির সন্ধান বাইরে থেকে টিপলে পাওয়া যায়— তার প্রমাণ মিলল না।

তুপুরে আজ বেজায় গরম— ঘর জুড়ে মেঝেতে সবাই গড়াগড়ি দিচ্ছি। নন্দিতা-ভবানী কোর্টে গেছে, আজ তাদের বিচারের দিন। ঘরের ভিতরে সকলেই চুপ ; কেউ বই নিয়ে কেউ চোখে হাত রেখে কেউ বা মাছির তাড়নায় সারা অঙ্গ শাড়ির আঁচলে ঢেকে। শুধু মাথার উপরের খোপটা থেকে কানে আসছে তুটো পায়রার ডাক— বক্‌বকম্‌, বকম্‌ বকম্‌!

পাশে এলা উস্‌খুস্‌ ক'রে উঠল। মুখ কেমন মলিন, চোখ লাল। চুপচাপ থাকে— মন খুলে বলে না কিছু সহজে ; বোধ হয় বাড়ির কথা মনে পড়েছে বা অন্য কিছু— বেচারা! ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললুম— 'কী হয়েছে রে ?'

সে আর থাকতে পারল না। এগিয়ে এসে আমার কোলে মুখ গুঁজল। বলল, 'গেল বছর ঠিক এমনি সময় বাড়িতে ছিলুম। তুপুরে ঘুম আসত না —বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। বাগানের পুব কোনায় বাতাবি লেবুর গাছ, গাছভরা বাতাবি— কী বড়ো আর কী মিষ্টি! কত খেয়েছি এমনি তুপুরে!'

—'তবেই হইয়েছে! আর তোমার কোনো আশা নেই এলা ; এমনি দিনে প্রাণে অন্য কিছু ঠাঁই পেল না ? বাতাবিলেবু লিয়াই জীবন কাটাই দেও তা হ'লে'— ব'লে ভাবী হেসে পাশ ফিরলেন।

শান্তি ছিল এককোনায় তু-হাতে চোখ ঢেকে, বুকে তার খবরের কাগজ। তড়াক ক'রে সে লাফ দিয়ে উঠল— 'নাঃ ব্রিটিশকে আর সময় দেওয়া উচিত না

—It is waste of time ; valuable সময় সব নষ্ট হচ্ছে। জাপানিরা করছে কী? দেখছেন, চারদিকে যত সব অন্যায্য ব্যবহার— intolerable— অসহ্য— মানুষকে এরা মানুষ ব'লে গণ্য করে না— revolution চাই—বিদ্রোহ— বিদ্রোহ।'

মায়া উঠে গেছে মুচিনিদের কাছে, তাদের নিয়ে গোল হয়ে ব'সে বক্তৃতা শুরু ক'রে দিয়েছে। 'বেশ করেছ, চুরি করেছ ; চুরি করবে, লুট করবে— খাওয়া হচ্ছে বড়ো কথা। এই খাওয়া-পরা নিয়েই তো আজ সংগ্রাম বেধেছে। ভয় কি, আবার বের হবে— আবার লুট করবে— আবার জেলে আসবে ; জেল ভ'রে দেবে— দলে দলে আসবে।'

মুচিনিদের মধ্যে একজন মুসলমান। পরনে তার শাদা লুঙ্গি— বুকে লাল ডোরা-কাটা গামছা, মাথার চুল ছোটো ছোটো ক'রে ছাঁটা— চোখ ছুটোতে কেমন খ্যাপাটে ভাব। মায়া সকলের দিকে ঘুরে ঘুরে কথা বলতে গিয়ে যতবার তার দিকে পিছন ফিরছে, সে মাথা নেড়ে ছু-হাতে নাক কান ম'লে ফিক ফিক ক'রে হেসে লুটোচ্ছে। মায়ার হুঁশ নেই কোনোদিকে। বলতে বলতে গরম হয়ে চটাপট হাতের চেটোয় চাপড় মারছে। কিন্তু মুসলমান মেয়ের এমন কাজ আর না করবার জন্য নাকে কানে খত দেওয়ার ভঙ্গি ও নীরব হাসি দেখে কেউ আর স্থির থাকতে পারলুম না বেশিক্ষণ। হাসি চাপতে চাপতে একসময়ে একসঙ্গে সবাই এক হাসিতে ফেটে পড়লুম।

বাধা পেয়ে মায়া মুখ ভার করে ছু-হাত বুকে জড়িয়ে অস্থিরভাবে ঘরের ভিতরেই পায়চারি করতে লাগল— 'যতসব ইয়ে— হাসি— হাসলেই হল— সময় অসময় নেই ; বোঝাবার বেলা কেউ না— যত সব দায় যেন আমারই।'

ছয়

জেলখানার আচার-ব্যবহার এখনো গা-সহা হয়ে ওঠে নি সকলের, তাই উঠতে বসতে খোঁচা লাগে— মনে দেহে সমানে। থাকতে হয় ইন্দুমতী হেন জমাদারনির তাঁবে, উপযুক্ত জুড়ি তার খিটখিটে লম্বা হেড জমাদারটা। এদের মুখই দেখি কেবল ঘুরে ফিরে। আর যাঁরা আসেন মাঝে মাঝে তাঁরা এদেরই

বড়ো এডিশন— এই যা তফাৎ ; সবাই যেন এক ছাঁচে ঢালা ; একই চোখের দৃষ্টি সকলের চাহনিতে, একই মুখের ভাষা সকলের কথায়, একই চলার ভঙ্গি সকলের পা-ফেলায়। এরা যেন সম্পূর্ণ আলাদা সৃষ্টি !

আমরা এখানে নতুন সবাই— কোনো অভিজ্ঞতা কারো নেই। জোর ক'রে কিছু চাইতে গেলেই শুনি—'নিয়ম নেই'— জেল কোড অনুসারে। বোকা ব'নে একে অন্যের মুখ তাকাই।

শান্তি বলে— 'এমন ক'রে তো চলতে পারে না। জেলের Rules and Regulations চেয়ে পাঠানো হোক।'

অফিস থেকে এলো দুটি ফুলস্কেপ কাগজে টাইপকরা ১৫৯টি নিয়ম-কানুন। প'ড়ে দেখা গেল তাতে ২৭৫টি 'না'। শান্তি বললে, 'এতগুলি 'না-এর মধ্যে একটিও তো 'হ্যাঁ' নেই। কী করব তবে আমরা ? এদের নিয়মে তো ভাবটা দাঁড়ায় যে, আমাদের চলা বসা, খাওয়া পরা, হাসি কথা গান, এমন-কি বোধ হয় চোখ মেলে তাকানোও বারণ। আসুন তা হ'লে শুধু ঝগড়াই করা যাক— এটার কথা তো কোথাও কিছু উল্লেখ নেই।'

মায়া বললে, 'ঠাট্টা রাখুন, ভালো লাগে না ও-সব। ঐ জেলার যে মুখের উপরে ব'লে গেল— prisoner is prisoner— prisoner has no right to ask for anything— তার কী করবেন ?— কেন, ডিভিসন টু-তে খাট-বিছানা দেয় তো ; দিতে বাধ্য— আমি জানি, ভালো ক'রেই জানি। ঐ তো সেবার অমুক ছিলেন জেলে—।'

মমতা বললে, 'জেলার তো দেবে না বলে নি ; বলেছে— আপনারা আমাদের কাছে প্রার্থনা জানান ; তারপর আমাদের দয়া হয় তো দেখা যাবে। দাবি করলে কিছুই— উঃ-হুঃ'— ব'লে পিঠ পিছন দিকে হেলিয়ে ভুঁড়ি বাগিয়ে হাত দোলাতে দোলাতে জেলারের হাঁটার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল।

সকাল থেকে আজ আমরা খবরের কাগজ পাই নি— কারণ জানি নে। সুপারকে নিয়ে জেলার, ডেপুটি জেলার ভিতরে এলেন। আমাদের কোনো কথার উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে বই খাতা, কালিকলম যা-কিছু ছিল সব তুলে নিলেন। জেলার বললেন— 'আপনাদের শাস্তি হয়েছে—all facilities are withdrawn।'

—কারণ ?

—জমাদারনি নালিশ করেছে, আপনারা ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন।

— ঝগড়া করেছি ? কই বলুক তো— ব'লে মমতা ইন্দুমতীর হাত ধ'রে টান দিল। ইন্দুমতী কাঁই কাঁই ক'রে উঠল— 'মোতে মারিল— উঃ-হুঃ-হুঃ— কেত্ত লাগিছে—।'

জেলার ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'দেখলেন স্যার, দেখলেন— দেখলেন, জমাদারনির গায়ে হাত তুললেন এঁরা। ডেপুটিবাবু, আপনিও কিন্তু সাক্ষী রইলেন।'

মমতা বললে, 'হ্যাঁ, ঠিক সাক্ষীই রাখলেন। কথায় বলে না—'

নন্দিতা সুপারকে বললে, 'আর, জমাদারনি সেদিন যে আমাদের হারামজাদি বলল— তার কী হবে ?'

'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ'— জেলারের হাসি থামে না ; মুখে হাত দিয়ে কেবলই হিঃ হিঃ হিঃ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। সুপার কাঁচুমাঁচু মুখে জেলারের পিছু নিলেন।

ডাক্তার এলেন— ঝলঝলে ঢলঢলে জুতো-মোজা, প্যাণ্ট-কোট-পরা। সাজে ও চেহারায় আশ্চর্য সাদৃশ্য। কথায় কথায়— কি ভালোতে, কি মন্দতে আগেই খানিকটা হিক হিক হেসে ফেলেন। তারপর কথার মানেটা হজম হ'লে পর মুখ গম্ভীর করেন, কপাল কুঁচকে বিরক্তি ফোটান, অবাক হয়ে চোখ পাকান, শেষে হঠাৎই আবার অকারণে পান-খাওয়া লাল লাল দাঁতগুলি বের করে হিক হিক হেসে ওঠেন ; ডায়েট-বুক বের ক'রে রোগীদের ডায়েট টুকে নেন।

মমতার শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব। সুপার প্রেস্‌ক্রাইব করেছেন half-boiled মুরগির ডিম রোজ একটি পাবে সে সকালে। কিন্তু দুপুরের আগে কোনোদিন জোটে না ; তা-ও hard-boiled হাঁসের ডিম। মমতা বলে—'এর মানে কি ডাক্তারবাবু ? মুরগির বদলে হাঁসের ডিম কেন ? মুরগিদেরও সব জেল হয়েছে নাকি ?— যুদ্ধের বাজারে সৈন্যদের ডিম supply করতে পারে নি বুঝি ?' ডাক্তারবাবু বলেন—'ক্যান, ক্যান, তাতে অইছে কি ? ডিম তো সব একই।'— 'তবে আর কি ? এবার তা হ'লে কাকের ডিম দিতে শুরু করুন'— ব'লে মমতা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

নন্দিতা বলে— 'আমার ডিফ্‌থেরিয়া হবার পর থেকে গলা খারাপ। gergle করবার জন্য গরম জল চাই রোজ একটু করে।'

ডাক্তার বলেন— 'ও কিচ্ছু না, কিচ্ছু না— ডিফ্‌থেরিয়া আবার একটা রোগ নাকি? আমার তো তিনবার অইয়া গেছে।'

শান্তি গ্যাস্ট্রিক আলসারে ভুগেছে। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে অতি সাবধানেই থাকতে হয় তাকে।

—'তা এমুন ভালো পরিষ্কার খাবার আর আপনে পাইবেন কোথায়?'— বলে ডাক্তারবাবু কৌতুকে হেসে ওঠেন। হাসি থামলে বলেন— 'ভাববেন না কিচ্ছু, ভাবলেই রোগ; না ভাবলে কিচ্ছু না। আমারও তো আছে গ্যাস্ট্রিক আলসার।'

আমি বলি— 'গাঁটে গাঁটে বাত আমার— ব্যথায় বড়ো কষ্ট পাই'— 'ক্যান ক্যান; ভাবনা কী— ইন্‌জেকশন দিয়া দিমুনে একটা— milk injection— পিওর milk। আমার wife-এরও আছে বাত।'

এই-সব কথার পর আর আমাদের কারো সাহস হয় নি কোনে অসুখের কথা ডাক্তারকে কোনোদিন বলতে।

মায়া-শান্তি বলে— 'রোগের কথা ছেড়ে এবার ডাক্তারকে দেশের কথাই বোঝাতে হবে তাতে যদি কোনো ফল দেয়।' তারা এগিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। তিন জনের সমস্বরে ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির— শেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি থামিয়ে কপাল কুঁচকে বললেন— 'তা, তা আমারে কী করতে কন?'

—কী করতে হবে জিগগেস করছেন? এই না আপনি বলেন আমরা আপনার নিজের ছেলেমেয়ের মতো; আমরা যদি জেলে থাকতে পারি তবে আপনার মেয়েরা পারবে না কেন? দিন দিন— পাঠিয়ে আপনার ছেলেমেয়েকে এই জেলে দেশের কাজে— আজই দিন।

ডাক্তার—'হ, হ—দিমু', ব'লে ছুটে পালালেন ইয়ার্ড থেকে।

দিন কাটল— বেলা গড়িয়ে এল। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা— তাই দিনের আলোতেই পুবের নীল আকাশে গোল রুপোলি চাঁদ দেখা দিল। স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রতি মুহূর্তে দিনের আলো ম্লান ক'রে চাঁদ তার নিজের স্নিগ্ধ জলুস ছড়াতে লাগল। সে কী শোভা! পুবের আকাশে যেন আজ রূপের

ছড়াছড়ি। চাঁদেতে, আকাশেতে নীলেতে, রূপোতে আজ বড়ো মাখামাখি। এ বলে, তুমি বেশি সুন্দর, ও বলে, তুমি বেশি সুন্দর। এদিকে সুন্দরের এই সখীপনা; ওদিকে নন্দিতা-এলা-মায়া গান ধরেছে—

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা যায় যায় যায় চলে॥

বিশ্বসংসার তলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। ভেসে রইল শুধু এক-টুকরো— আকাশের গায়ে— পূর্ণিমার এই চাঁদ; আর কানে রইল লেগে গানের সুরের রেশ।

ঝন্ ঝন্ ক'রে চাবি দুলিয়ে জমাদার এল। মাথা ঝাঁকিয়ে রুখে উঠলুম সবাই— ঢুকব না আজ ঘরে কেউ, বলো গিয়ে জেলারকে।

জমাদার আমাদের এই অপকর্মের ভয়ানক ফলাফলের জন্য বার বার সাবধান ক'রে দিয়েও যখন টলাতে পারল না তখন—'আচ্ছা, বেশ—আপনারাও দেখুন, আমরাও দেখি কী করতে পারি না-পারি'—ব'লে গট্ গট্ ক'রে ফিরে চ'লে গেল।

জমাদার চ'লে যেতে আমাদের হুঁস হল— সবাই উঠোনের মাঝে জড়ো হয়ে জটলা করলুম, এখন করা যায় কী?

মায়া বললে, 'চটপট একটা কিছু কারণ বের ক'রে ফেলুন শিগগির।'

শান্তি বললে—'আচ্ছা, আমরা যে সেদিন বাইরে আমাদের অভিযোগ জানাব ব'লে কাগজ চেয়ে চেয়েও পাই নি সেই কারণটা দেখালে কেমন হয়? —সেটা তো আমাদের বেশ জরুরিই ছিল; অন্তত আমরা তো তাই মনে করেছিলুম, না?'

ঠিক, ঠিক। এই তো বেশ একটা কারণ পাওয়া গেছে; কিন্তু বলবে কে? কিছু নিয়ে তাদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে গেলেই রাগে কাঁপি সব, ঠিক সময়ে ঠিক কথার জবাব আসে না। মায়া তো আগে থেকেই রেগে থাকে— মুখ খুললেই ফেটে পড়ে। শান্তিই একমাত্র আমাদের মধ্যে, যে নাকি রেগে গেলেও স্থির থাকে।

জেলার আসার সাড়া পেতেই তাড়াতাড়ি শান্তিকে আমাদের মুখপাত্র হিসাবে সামনে রেখে তৈরি থাকলুম। কথা রইল, শান্তি ছাড়া আর কেউ মুখ খুলব না আমরা।

জেলার একদল দেহরক্ষী নিয়ে চশমার উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। এতক্ষণে সন্ধ্যা উতরে গেছে, চাঁদের আলো স্পষ্ট ফুটেছে ; শাদা উঠোনে আমাদের কালো ছায়াগুলি অল্প অল্প নড়ছে ; আলো-ছায়ায় মিলে সে যেন এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

জেলার কাত হয়ে গাল-ভরা পানের পিক ফেলে বললেন, 'কী ? কী ব্যাপার ?'

শান্তি ধীরভাবে নরম গলায় বললে— 'আমরা জমাদারকে ফিরিয়ে দিয়েছি। যেহেতু— মানে, আমরা সেদিন অফিসে কাগজ চেয়ে চেয়ে পাই নি— বাইরে আমাদের অভিযোগ জানাতে দিচ্ছেন না, সে হেতু আমরা আজ lock-up হব না।' ব'লে আমাদের দিকে পিছন ফিরে বললে— 'কেমন এইতো— মানে, এই কথাই তো ?'

পিছন থেকে উত্তর হল— 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই— আমরা আজ ভিতরে ঢুকব না।'

জেলার ঘাড় নেড়ে বললেন—'এই কথা ! তা বেশ।'

কিছুক্ষণ থেকেই মায়া উসখুস করছে— তার একহাত আমার হাতে চেপে ধরা— যেন আমাদের পরামর্শ ভুলে না যায় সে। কথা বলবার জন্য যতই মায়া এগোতে চায় ততই আমি পিছু টানি তাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর পারব ?

—'ছেড়ে দিন আমায়, কেন ? আমি কি রেগে যাচ্ছি নাকি ? উচিত কথাই বলব'— ব'লে মায়া এক ঝটকায় হাত ছিনিয়ে নিয়ে ঠেলেঠুলে জেলারের কাছে এগিয়ে গেল।

জেলার মায়ার এগিয়ে আসার ভাবে কী বুঝলেন— একছুটে ফটকের কাছে দৌড়ে গেলেন। ফটক খোলা আছে দেখে একটু নিশ্বাস নিয়ে জমাদার-জমাদারনিকে ডেকে হেঁকে নির্দেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেলেন। জমাদার-জমাদারনি জেলারের নির্দেশমতো আমাদের পাহারায় মোতায়েন রইল। আর রইল দরজার পাশে দুজন সেপাই, বিপদ ঘটলে জমাদার জমাদারনিকে বাঁচাবে, আর সেপাইদের বাঁচাবে দরজার বাইরে পুলিশ চার জন।

পাকা ব্যবস্থা, খুঁত নেই কোথাও। আমরা নিশ্চিন্তমনে এইবার খাবার আয়োজন করলুম। বিকেলের খাবার ঘরে ঢাকা আছে। মমতা বললে— 'এত ক'রে পাওয়া চাঁদের আলো— আসুন, এই আলোতেই ব'সে খাওয়া

যাক।' উঠোনে চাদর বিছিয়ে খাবারের থালাগুলি তার উপরে রেখে আমরা গোল হয়ে ঘিরে বসলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছবির মতো মনে জাগল কোপাইয়ের ধার, অজয়ের চর, শালের বন, খোয়াইয়ের পার, তালডাঙার উঁচু ঢিবি— আরো কত কী! কতবার এমনি রাতে, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে চড়ুইভাতি হয়েছে আমাদের সে-সব জায়গায়!

খাওয়া শেষ ক'রে সেখানেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম সবাই। পোকা-মাকড়, সাপ, ব্যাঙ আছে— তা থাকগে। সে-সবের উপরে চাঁদের আলো আছে, খোলা আকাশ আছে। একি ছাড়া যায় কখনো?

পাশাপাশি শুয়ে গান গল্প চলল অনেক ক্ষণ। এবারে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, একে অন্যের কথার জবাব হাঁ-হুঁতেই সারা হচ্ছে। কথাবার্তা প্রায় থামল-থামল ভাব। এমন সময়ে ইন্দুমতীর এক বিকট হাঁক— 'সাহেব আবো ভিতরমে।'

ধড়ফড় ক'রে চাদর গায়ে জড়িয়ে উঠে বসলুম। সুপার ইয়ার্ডে ঢুকলেন; তার পিছনে জেলার, জেলারের পিছনে দু-জন ডেপুটি, তাদের পিছনে তিনটে জমাদার, জমাদারের পিছনে ছ-জন সিপাই, তাদের পিছনে আরো অনেকে— নজরে পড়ল না সব।

সুপার প্রৌঢ়ত্বের শেষসীমায় এসে পৌঁছেছেন, ভালোমানুষ গোছের। জেলারের তাঁবে কেমন জড়োসড়ো ভাব;— প্রতি কথায় জেলারের মুখের দিকে তাকান। জেলার যদি বলেন— 'হ্যাঁ' বলুন, উনি 'হ্যাঁ' বলেন; জেলার 'না' বলালে উনিও 'না' বলেন। মোটকথা জেলার যেমন চান তেমনি করেন। সুপারের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়।

এত রাত্রেও আমরা ঘরে ঢুকি না, সুপার মহাব্যস্ত। বাইরে জানাজানি হ'লে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। বুড়ো বয়সে পেনসন নিলেও নিস্তার নেই— টেনে এনে আবার কাজে ঢোকাবে। ভয়ে ভয়ে আছেন— কোনো রকমে কটা বছর পেরিয়ে দিতে পারলেই হয়। ছেলেপিলের সংসার— পেনসনের আশা করতে হয় বই-কি! মা-লক্ষ্মীরা যদি আজকের মতো ঘরে ঢোকেন তবে এ-যাত্রা মান থাকে। আমাদের সব অভিযোগ এবার তিনি মন দিয়ে শুনবেন। প্রতিকার তো তাঁর নিজের হাতে নয়— তবে যতটা সাধ্য, ইত্যাদি— ইত্যাদি।

রাত হয়েছে— ঘুম পাচ্ছে— বাইরে হিম বাড়ছে। কথা কাটাকাটি ক'রে ঘুমের আমেজ নষ্ট করবার বাসনা নেই। খুশি মনে সকলে ঘরে ঢুকে মহা-আরামে ঘুমিয়ে পড়লুম। বৃদ্ধ সুপারেরও মান রক্ষা হল।

কয়েকদিন হল ইন্দুমতী আসে যায়, ঘড়ি ধ'রে কাজ করে কিন্তু কথা বলে না— মুখ ভার ক'রে থাকে। মুচিনিরা ভাতগুলি যখন ঝালনুন অভাবে খেতে না পেরে নাড়াচাড়া করতে থাকে, ইন্দুমতী কোমরের গোঁজ থেকে পেঁয়াজটা লঙ্কাটা বের ক'রে দেয়; বলে— 'যেমন ক'রে পারিস খালে, জেলমে ঘরকা খানা কোথায় মিলিব? না খাবি তো দুব্‌লা হয়ে যাবি। তখন কৌন তোদের দেখিবে করিবে?' ছেলে কাঁদলে মাকে ধমক দেয়— 'ছুয়া পুয়া কাঁদিয়ে কাজ করতে হোবে না— কেমন মা লো তু?'

মাঝে মাঝে আমাদের জন্যও আনে কাঁচা মুলোটা, লঙ্কাটা; শালপাতায় মোড়া আমের আচার কয়েকটা।

বেশ আছি। শিকের ঘরেই মন ব'সে গেছে। অনেক কিছুই এখন সহজ মনে উপেক্ষা করতে পারি— দিনের অধিকাংশ সময়ই যে-যার পছন্দসই কাজ নিয়ে থাকি।

এলা-ভবানী সেলাই করে, জামায় নকশা তোলে। মায়া সর্বদাই ব্যস্ত— একই ঘর বারে বারে ঝাঁটায়, কম্বলগুলি পাট ক'রে তোলে— আবার ঝেড়ে মেঝেতে বিছোয়। কেউ কোনো ফরমাস করলে এগিয়ে যায়। ভাবী লেবুগাছ থেকে ইন্দুমতীকে এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে লেবু ছিঁড়বেন— সেই চেষ্টায় ঘুরঘুর করেন; দাসীপুসির ঘাস-খোঁড়া মরচে-পড়া ভাঙা কাস্তেটা দিয়ে কাটা এক-একটা টুকরো লেবু সবার থালায় বেটে রাখেন; বলেন— 'এই লেবুটা দিয়ে দুগ্রাস ভাত বেশি খাবা।'

মমতা ফড়িঙের মতো এখানে ওখানে তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফায় আর কট্‌কট্ ক'রে কথা কয়। আমাদের মধ্যে ও-ই বয়সে সকলের ছোটো— পাতলা রোগা— দেখতেও বয়েস আন্দাজে আরো ছোটোই দেখায়।

নন্দিতা বললে, 'মমতা ছোটো হ'লে হবে কী— আমাদের যখন পুলিশ ধ'রে আনে, সঙ্গের সি. আই. ডি. কী বলেছিল জানেন? বলে, "মমতাদেবী ছোট্ট হ'লে কী হবে, কী তেজস্বিনী মহিলা, মশায় সে; থানায় ধ'রে এনেছি— দারোগা জিগগেস করলেন—'আপনার নাম কী?' তিনি বললেন—

'বন্দেমাতরম'। 'বয়স কত?' বললেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।"'— শুনে সকলেই হেসে উঠলুম। মমতা রেগে এলাকে হাতের কাছে পেয়ে তাকে দুটো চাপড় মেরে কোনায় দু পা ছড়িয়ে গন্‌গন করতে লাগল।

শান্তি এমনিতে খুব শান্ত, নির্বিকার মানুষ; চুপচাপ কোনো বই কোলে নিয়ে ব'সে থাকে। মাঝে মাঝে দৃষ্টি নামিয়ে বই পড়ে কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই কোথায় যেন দূরে কী চেয়ে দেখে। কী যে ভাবে ও সে-সময়ে— কী জানি। আশে পাশে কী ঘটে যাচ্ছে কিছুরই বড়ো ভ্রূক্ষেপ নেই, কোনো কড়ো ...যন ওর মনকে নাড়া দেয় না তখন। গল্পগুজব হাসি ঠাট্টা করতে ...ক'রে দেখ...কমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে— দেখে থমকে চুপ হয়ে যাই।

। ... 'র কথা কানে যেতেই শান্তির মাথায় কী সব ঘুরপাক খেয়ে গেল, ... নেড়ে বলে উঠল—'আমি যত ভেবে দেখছি— এ দেশে কড়া ... গাই, ধীরে সুস্থে, ব'লে ক'য়ে, বুঝিয়ে শিখিয়ে কিছুই হবে না। দেশের আধ ... লোকের মাথাতেই কিছু ঢোকে না'— বলতে বলতে শান্তি উত্তেজিত হয়ে উঠল—'Revolutionary Education চাই, সব crushed হয়ে গেছে— ভাবতে পারে না কিছু, বুঝতেও পারে না মনুষ্যত্বের এতটুকু স্ফুরণ নেই কারো মধ্যে— কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সব সমান— বোঝালেও তারা বুঝবে না, তাদের আবার 'convert' করব কি? এইতো, যেদিন আমরা এখানে আসি তাব আগের দিন বাগদি-পাড়ায় গেছি— যেখান থেকে আর কি আমাদের ধ'রে আনে: তাদের বোঝাচ্ছি এই যে, half of the people এই যে তোমরা আজ starve করো দিনের পর দিন— মানে না খেয়ে মরছো তা কেন হবে? আমরা খাই তো তোমরা খাবে না কেন? আমরা কাপড় পরি তো তোমরা পরবে না কেন? Why should not they? অ্যাঁ? বলুন না? তা তাদের মাঝ থেকে এক বুড়ি ব'লে উঠল কী জানেন? কি বললে— বলো না এলা, তুমিও তো ছিলে, সঙ্গে, বলো।'

এলা হেসে বললে—'বাগদিবুড়ি শান্তিদির কথা শুনে ব'লে উঠল কি— 'হঃ, বাপের কালে কাপড় পরলাম না, আর তোমরা আসছো আজ আমাদের কাপড় পরাতে—'

—'শুনুন, শুনুন— how depressing, এদেশে কি সম্ভব এই-সব লোক দিয়ে কিছু করানো'— ব'লে শান্তি অস্থিরভাবে উঠোনে ঘুরতে লাগল।

নিজেদের মধ্যে ঠিক হয়েছে, দিনের বেলা সময় কাটাব, কাজ করব— যার যেভাবে মন চায়; কিন্তু রাত্তিরে সবাইকে থাকতে হবে হালকা মনে, হালকা গল্পগুজব ক'রে। শাস্তি নিয়ম ক'রেই, নিয়ম রক্ষা করতে এক ভুতুড়ে গল্প ফেঁদে বসল। কবে ওর কোন্ গাঁ-সম্পর্কে পিসি দেখলেন, বাছুর সমান এক শেয়াল তেড়ে আসছে, মুখে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। পিসি চিৎকার ক'রে উঠতেই সেই শেয়ালরূপী ভূত অদৃশ্য থেকে পিসির গা থেকে মাংস খাবলে নিল আর গলগল করে সেখান থেকে রক্ত পড়তে লাগল। ওঝা ডাক্তার, ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি— গোটা পাড়া জড়ো হল; কিছুতেই কিছু না। একরদের পিসি ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন— 'ঐ এল, এল— আমায়।দয়ে কাজ।খায় খেল— অমনি গা থেকে এক-এক খাব্‌লা মাংস উঠে যায়- ক দিয়ে রক্ত ছোটে; শেষে তিন দিনের দিন পিসি ম'রে গি'সঙ্কাটা , শাল

ভাবী বললেন, তাব মা বসে আছেন ঘেরা' ।শায়— কোলে দু-মাসের শিশু ভাই; হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে এক্ষ।। ভূত এসে তার মার মাথা থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে হাওয়ার সঙ্গেই তেমনি হুস্ ক'রে বেরিয়ে গেল। পরদিন থেকে মার মাথা কেমন হয়ে গেল। দেড়বছর নানারকম চিকিৎসার পর জলের মতো টাকা খরচ করিয়ে তবে ভূত মাকে ছাড়ে।

নন্দিতা বললে— প্ল্যাঞ্চেট ডাকলে অনেকখানি সময় বেশ কাটিয়ে দেওয়া যায়। প্ল্যাঞ্চেট একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। এক মিডিয়াম আত্মাকে ডেকে এনে জল পর্যন্ত খাইয়েছে, কাচের গ্লাসে ধীরে ধীরে জল ক'মে যাচ্ছে— এক আত্মীয়ের নিজের চোখে দেখা।

মায়া ব'লে উঠল— যত সব বুজরুকি। কী জানি বাবা— হয়তো হবে সত্যি। শিশির ঘোষের কোন্ মরা ছেলে না ভাইপোর অয়েলপেন্টিংও ক'রে দিল আত্মা এসে— এও তো শোনা যায়।

এলা শুয়ে আছে ঢালা-বিছানার একপাশে জানালার ধার ঘেঁষে। এই জায়গাটির জন্য লালায়িত ছিলুম অনেকেই। আজ ভাবছি— ভাগ্যিস শুই নি। এলাও দেখি নিঃশব্দে কখন এক সময়ে সরতে সরতে আমার পিঠ ঘেঁষে শুয়েছে এসে।

ভবানী বলল— ব্যাপার কিন্তু সুবিধের নয়। হাত ভারি হয়ে উঠছে— কখন হয়তো চলতে শুরু ক'রে দেবে।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলুম সবাই— সে আবার কী?

ভবানীর নাকি বেশি ভূতের গল্প শুনলে বা ভাবলে শরীর হাত ভারি হয়ে আসে— আত্মা এসে ভর করে। মাটিতে তখন হাত পড়লেই হাত চলতে শুরু ক'রে দেয়। সে বললে— 'আমার কাছে আত্মা এসে সহজে যেতে চায় না, অনেক সাধ্যসাধনার পর যদি-বা যায়, যাবার আগে এমন ঝাঁকুনি দিয়ে যায় যে তিন-চার দিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না।'

— 'না, না— আর ভূতের গল্প নয়; চোখ বুজে শুয়ে পড়ো সব।'

কিন্তু কত রাত অবধি বুকে পাথর চেপে রইল— আর সেই বুকে দু-হাত জড়ো ক'রে প'ড়ে রইলুম; কী জানি, যদি হাত মেঝেয় পড়ে— যদি চলতে শুরু ক'রে দেয়।

সাত

শরতের সোনালি রোদ্দুরে উঠোন ছেয়ে গেছে। চারদিকের উঁচু শাদা দেওয়ালে তারই আলো ঝলমল করছে। দোপাটি ফুলের সরু পাতাগুলি হাওয়ার দোলায় চিকৃচিকিয়ে উঠছে। ইন্দুমতী কয়দিন আগে উঠোনটি নিকিয়েছে, টিন টিন গোবরজল ঢেলে। নিকোনো উঠোনে শরতের সোনালি রোদ্দুরে সকাল থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ এই জেলের ভিতরে এইটুকু সীমার মধ্যে শরতের এইটুকু মাত্র দান! কিন্তু কী উন্মাদনা এনে দিল প্রাণে, নতুন ক'রে যেন দেখলুম জেলখানাকে— নতুন এক রূপে।

কদিন অবিরাম বৃষ্টির পর সকলের অলক্ষ্যে উঠোনের কোনায় একটি লম্বা ঘাস মাথা তুলেছিল; ইন্দুমতী জঞ্জাল সইতে পারে না, উপড়ে ফেলতে চায়— বহুকষ্টে আগলে রেখেছি তাকে ইন্দুমতীর হাত থেকে। কিছুদিন পরে সে ঘাসে দানা বাঁধল। আজ দেখি কোথা থেকে দুটি চড়ুই পাখি এসে বসেছে তাতে। সরু লিকলিকে ঘাসের পাতা— ছোট্ট চড়ুইর ভার সয় না, নুয়ে নুয়ে পড়ে। চড়ুই দুটি দু-ডানায় ভর রেখে দানা ঠুকরে কিচিকিচি ডাকে, ফুরফুর ক'রে এদিকে ওদিকে উড়ে বেড়ায়, আবার ফিরে ঝাঁপিয়ে এসে ঘাসে বসে। আনন্দের উচ্ছ্বাসের অন্ত নেই আজ ওদের। এইটুকু আয়োজনের মধ্যেই প্রকৃতি তার সব রস এনে উজার ক'রে ঢেলে দিয়েছে যেন।

মুচিনিরা ছাড়া পেয়েছে কয়দিন আগে। আজ আর একটি কয়েদি এল রাজশাহি জেল থেকে চালান হয়ে। সতেরো-আঠোরো বছর বয়েস, কোলে কয়েকমাসের শিশু— যার নাম গোলাপরানী। কচি মুখখানিতে ড্যাবা ড্যাবা সহজ সরল দুটি চোখ, মাথায় একমাথা কালো কুচকুচে চুল। কে বলবে— এমন মেয়ে অপরাধী ?

গোলাপরানী বললে— স্বামী একটি মেয়েকে খুন ক'রে ফাসি-কাঠে যায় যায়, এমন সময়ে আমার হাত ধ'রে বলল— 'আমাকে বাঁচাও, দোষ তুমি স্বীকার ক'রে নাও।' এই মেয়েটি তখন ছ-মাসের পেটে। বিচারে স্বামী খালাস পেল। আমার জেল হ'ল সাত বছর— সশ্রম।'

—'নাম কী রেখেছ মেয়ের ?'

গোলাপ একমুখ হেসে সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তার কপালের চুল-গুলি সরিয়ে দিতে দিতে বললে— 'কৃষ্ণারানী।'

কৃষ্ণাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে সে তডবড় ক'রে উঠোনে হামাগুড়ি দিতে লাগল। গোলাপ লম্বা চুলের গোছায় আঙুল চালাতে চালাতে কুয়ো-তলায় নাইতে গেল।

নিস্তব্ধ দুপুর। মনটাকে কিছুতেই আজ আর টেনে আনতে পারছি না। চোখেও ঘুম আসে না ছাই। অনেক ক্ষণ উসখুস ক'রে কম্বল হাতে উঠোনে এলুম। ইন্দুমতী দেওয়ালের ছায়াতে পা ছড়িয়ে ব'সে দাসীপুসিকে দিয়ে চুলের উকুন বাছাচ্ছিল আর আরামে ঝিমুচ্ছিল। সেখানে গিয়ে তার মুখোমুখি কম্বল পেতে বসলুম। বললুম— 'আজ তোমার কাছে ব'সে গল্প শুনব, গল্প বলো তুমি।'

ইন্দুমতী চোখ পিট্‌পিট করে বললে— 'কী গল্প শুনিবে ? হামি কি গল্প বলতে পারে ? হামি না লিখতে না পডতে বি পারতা হ্যায়। হামি—'

বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম— 'আচ্ছা ইন্দুমতী, তুমি সত্যি সত্যি খুনের আসামি দেখেছ কখনো ?'

'আরে বাব্বা— সে আবার মুই দেখি নি ? কেয়া বলিসো তুমি'— বলতে বলতে ইন্দুমতী সোজা হয়ে ব'সে তেল-চপচপে চুলগুলি মাথায় জড়িয়ে নিয়ে— দু-হাত মুখে ঘ'ষে হাতের তেলটা শুকিয়ে নিল ; বলল— 'এই তো, এই

জেলমেই ছিল সদিমন বিবি। স্বামীকে হাতদা দেকে এক কোপ মে কাট করকে শেষ ক'রে ফেলে সে। আজিমন বিবিও তাই। ফাতেমা বিবি বিষ দিয়েছিল স্বামীকে ;— বিশ বরষকা লিয়ে জেল হয়ে গেলো তার। সুশীলা মারল দেওর বেটাকে। জামিরন বিবি এই সেদিন…'

— 'তুমি ফাঁসির আসামি দেখেছ, ইন্দুমতী ?'

—'বাব্বারে বাব্বা— কি কইসো তোমি ? কেত্তো বরষ হামি কাজ করিসি। হিজলি জেলমে ছিলাম তিন বরষ, মেদিনীপুরমে আড়াই বরষ, কালীঘাট সেণ্ট্রাল জেলমে ছিলাম এক বরষ— সেখানে ছয়মাস এক ফাঁসিকা আসামির সাথমে হামি থাকিসি। সে হামি কি একেলা ? সাত সাত জমাদারনি ছিলাম সেই এক আসামিকা সাথ।' ব'লে এক দুই তিন ক'রে হাতের সাতটা আঙুল গুনে গুনে দেখাল। গল্প জ'মে উঠল— ইন্দুমতী নিজভাষায় ব'লে যেতে লাগল— 'অল্প বয়সের ছুঁড়ি সে, ঘরে সোয়ামি আর এক সতিনপুত। সতিন তো আগেই ম'রে গেছে ; সতিনপুত এগারো বছরের। সেই গাঁয়েই ছেলেটার মামাবাড়ি, সেখানেই দিদিমার কাছে থাকে, সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে ; তবু ছুঁড়িটা সতিনপুতকে সইতে পারে না। একদিন দুপুর বেলা সোয়ামি গেছে মাঠে চাষ করতে— ছেলেটা দিদিমার কাছে ছিল, দিদিমা ভাত বাড়ছে, তাকে খেতে দেবে ; ছেলেটা বললে— "একটু দেরি করো, আমি বাপের ঘর থেকে ছিপটা নিয়ে আসি— খেয়ে উঠে মাছ ধরব"— ব'লে ছেলেটা এ-বাড়িতে চ'লে এল। ছুঁড়িটা করল কি ছেলেটাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে নোড়া দিয়ে মাথাটা ছেঁচে চুলির মধ্যে গনগনে আগুনে যেমন কাঠ গুঁজে দেয়— তেমনি ক'রে ছেলেটার মাথাটা গুঁজে দিল। দিয়ে সোয়ামির জন্য ভাত বেড়ে নিয়ে মাঠে চ'লে গেল। এদিকে দিদিমা ব'সে আছে ভাতের থালা নিয়ে— অনেক ক্ষণ হয়ে গেল ছেলে আর আসে না ফিরে। দিদিমা বলে— 'হায় রে, ছেলেটা কখন গেল, বাড়া ভাত প'ড়ে রইল, এখনো আসে না কেন ?' দিদিমা এখানে ওখানে খোঁজ ক'রে ক'রে শেষে ছেলেটার বাপের ঘরে এল। রান্নাঘর থেকে তখন দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে। হাঁকে ডাকে পাড়ার লোকও সব এসে জড়ো হল। রান্নাঘর খুলে দেখে এই কাণ্ড ;— মেঝেটা জমাট রক্তে থক্‌থক্ করছে, আর ছেলের মাথাটা চুলিতে গোঁজা। লোক ছুটল ছুঁড়িটাকে খুঁজতে। সে তখন মাঠে ছাগল চড়াচ্ছিল। তাকে সেখান থেকে সবাই মারতে মারতে ধ'রে নিয়ে

এল। তারপরে চলল মামলা হাইকোর্ট পর্যন্ত ; কিছুতেই মেয়েটা খালাস পেল না— ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

'সব ঠিক ঠাক— কাল সকাল পাঁচটায় ফাঁসি হবে। এখন কে তাকে নিয়ে যায় ফাঁসির জায়গায়। সাত সাত জমাদারনি— সাতজনাই এ ওকে ঠেলে, বলে— 'তুই যা' ;— কেউই রাজি হয় না। শুমি জমাদারনি বলে— আমি যেতে পারব না, চপলি বলে— আমি পারব না, বাতাসি বুড়ি বলে— আমি পারব না, দুটো খ্রীস্টান জমাদারনি ছিল, তারাও বললে— পারব না ; আমিও বললাম— মুই পারব না ;— এখন কে যায় ? কাল রাত না পোহাতে ফাঁসি হবে, মেয়েটা সমানে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছে— ওঠেও না, নড়েও না, খায়ও না। এমন সময়ে খবর এল— আসামি খালাস পেয়ে গেছে।

'শেষ মুহূর্তে মেয়েটার বাপ তিনশো টাকা দিয়ে ব্যারিস্টার লাগাল। ব্যারিস্টার এসেই বললে— মেয়েটাকে যখন ধ'রে আনে তখন সে মাঠে ছাগল চড়াচ্ছিল। কেউ কি দেখেছে চোখে যে, সে-ই ছেলেটাকে মেরেছে ?"

'ব্যস্— আমাদের আর তাকে ফাঁসির জায়গায় নিয়ে যেতে হল না।' ব'লে এই আনন্দেই ইন্দুমতী একগাল হেসে ফেলল।

মমতা ও ভাবী এসে ব'সে গিয়েছে গল্প শুনতে।

মমতা বললে—'তুমি প্রথম কোন্ ফাঁসির আসামি দেখ ?'

প্রথম আমি ফাঁসির আসামি দেখি নি— দেখেছি শূলের আসামি।

ভাবী আঁৎকে উঠলেন—'বলো কী ?'

ইন্দুমতী বললে— হাঁ, শূলকা আসামি। আমি তখন ছোট্ট— একখণ্ড কাপড় কোমরে জড়িয়ে থাকি শুধু। সম্বলপুরের একটু দূরে এক গাঁয়ে আমার জেঠার মেয়ের শ্বশুর ঘর। সেখানে বেড়াতে গেছি দিন কয়েকের জন্য। একদিন দেখি— এ গাঁ, সে গাঁ— পাঁচ-গাঁয়ের লোক ছুটে ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে— একজনকে জিগগেস করলুম— "হাঁরে, এরা ছুটছে কোথায় সব ?"

'সে গাঁয়ের বাইরে একটা খোলা মাঠের নাম ক'রে বললে— সেখানে একজন আসামিকে আজ শূলে চড়াবে—।

'শুনে আমিও ছুটলাম। বাপের বাপ— কী ভীড় ! লোকে লোকে ছেয়ে গেছে, পাঁচ-সাত গাঁয়ের ছেলেপিলে সব ঝেঁটিয়ে এসেছে। আমি কোনোরকম ক'রে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম।

'মাঠের মাঝে একটা জায়গায় পঞ্চাশ হাত উঁচু একটা থাম। থামের মাথায় একটা চৌকোনা পিঁড়ি, পিঁড়ির চারকোনায় চারটা শূল, আর মাঝখানে একটা শূল; মোটমাট পাঁচটা শূল চকচক করছে। থামের গায়ে বরাবর উঠে যাবার জন্য একটা সরু সিঁড়ি।

'ঘড়ি ধ'রে ধ'রে লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে— সে কতরকমের ঘড়ি! হাত-ঘড়ি, পকেটঘড়ি, দেয়ালঘড়ি, টেবিলঘড়ি— সবরকম ঘড়ি চলছে— সবাই ঘড়ির কাঁটা দেখছে। সময় হল।

'নিচে একটা টেবিলে হরেক রকমের খাবার সাজানো। আসামির যা যা খেতে ইচ্ছে যায়, বেছে বেছে সেই সব খাবার নিল। একহাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে এবার সে সিঁড়িতে পা দিল। এক এক পা ক'রে আসামি উঠছে—ঠাকুর-দেবতার নাম করছে আর খাবার খাচ্ছে, এমনি ক'রে আস্তে আস্তেউপরে উঠে গেল।

'এবার সে পিঁড়িতে গেলেই পিঁড়ির সঙ্গে পাক দেওয়া তারটা খুলে দেবে —আর পিঁড়িটা বন্‌বন্‌ ক'রে ঘুরতে থাকবে। ঘুরতে ঘুরতে পিঁড়ির মাঝের শূলটা লোকটার মাথা ফুঁড়ে উঠবে— অমনি লোকটার শরীর চড়াৎ ক'রে দু-আধখানা হয়ে মাটিতে প'ড়ে যাবে।

'সব ঠিক। আমি দেখছি হা ক'রে নিচে থেকে। আসামি উপরে পৌঁছে দু-হাত জোড় ক'রে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম ক'রে বললে— 'হে তেত্রিশ কোটি দেব দেবী, যদি আমি দোষ ক'রে থাকি তবে শাস্তি পাব আর যদি নির্দোষ হই তবে খালাস পাব।' তারপর লোকদের বললে— "এই, আমি এখন এই পিঁড়িতে বসব— আমার যা প্রাণ চায় খেতে দিলে— এবারে আমার প্রাণ চাইছে — শেষবারের মতো মা'র বুকের দুধ খেতে। তবেই আমার শেষ সাধ মেটে।"

'আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে। তখুনি লোক ছুটল ওর মাকে আনতে। মা থাকে কিছু দূরে। সেখানে লোক গিয়ে পৌঁছতে না পৌঁছতে ছয় মিনিট হয়ে গেল, শূলের সময় পেরিয়ে গেল— আসামি বেকসুর খালাস পেল।'

ইন্দুমতী হেসে হাঁটুর কাপড় টেনে তুলে আঁটসাঁট হয়ে বসল, বলল— 'জানো, আমাদের দেশের মহিমা-ই এই। সেখানে আছেন সম্বলেশ্বরী মহেশ্বরী —বড়ো জাগ্রত দেবী। তাঁর আশ্রয়ে কারো কিছু ক্ষতি হবার উপায় নেই। যে যা মনে প্রাণে চায় তিনি তা পূরণ করেন, অসহায়কে রক্ষা করেন। আমা-

দের গ্রামের একদিকে আছেন মহেশ্বরী আরেক দিকে বায়োধরী— দু-বোন তাঁরা। যদি, ধরো, রাতদুপুরে গ্রামে ডাকাত পড়ল, কারো ঘর লুটপাট করল ; —অমনি একদিক থেকে মহেশ্বরী বের হবেন, একদিক থেকে বায়োধরী বের হয়ে দু-জনে এসে মিলবেন রাস্তার মাঝামাঝি। মিলে যে বাড়িতে ডাকাত পড়েছে সে বাড়িতে গিয়ে ডাকাতদের মারতে মারতে গ্রামের বাইরে বের ক'রে দেবেন। কেউ জানতে পারবে না কী করে কী হল। এমন মহিমা তাঁদের। হে মা মহেশ্বরী, হে মা বায়োধরী— মা জননী গো'— ব'লে দু-চোখ উলটে মাদের উদ্দেশে জোড় হাত কপালে ঠেকাল।

আট

কয়দিন থেকে যেমন গুমোট রাত্তিরে— তেমনি রোদের তাত দিনভর সমানে। পৃথিবী যেন তেতেপুড়ে উঠেছে, ঝলকে ঝলকে গরম হাওয়া তা জানান দিয়ে যায়। অনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি ঘোচাতে জানালায় কম্বল টানিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে— দুপুরে যে যার মেঝেতে গড়াচ্ছি, কিন্তু ভিতরে কিসের একটা ছটফটানি, স্থির থাকতে দিচ্ছে না,— উঠে দরজার থামনে উপুব হয়ে 'রাশিয়ার চিঠি' খুললুম— মানুষের পক্ষে তা ই সকলের চেয়ে দুর্গতি যখন আপনার জীবনে সে আপন অন্তর্নিহিত ভূমাকে প্রকাশ করতে পারলে না— বাধাগুলো শক্ত হয়ে রইল, এ-ই তার পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে বড়ো মৃত্যু।…

বইয়ের শাদা পাতায় কিসের ছায়া পড়ল, ঘরের ভিতরে দিনের আলো-টুকুও নিভে গেল। মাথা তুলে দেখি, বাইরেও ঘন আঁধায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝির-ঝির ক'রে অশথ পাতাগুলি ডালে ডালে বেজে উঠল— শোঁ শোঁ ক'রে হাওয়া বইল। বই বন্ধ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এলুম। নানা রঙের মেঘে ছেয়ে আছে আকাশটুকু— চাতক পাখি দলে দলে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক নেচে বেড়াচ্ছে মেঘের গায়ে। কাক-পায়রাগুলি এলোমেলো উড়ছে— ডাকছে, বসছে, নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না ঠিকমতো। পুবের শাদা হালকা তুলোর মতো মেঘগুলি হাওয়ার দুরন্ত গতিতে উড়ে চলেছে উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে! তারপর চলেছে ছাই-রঙের মেঘ, শাদা বকের সারি। চিল আসছে

নেমে উঁচু আকাশ থেকে ঘুরে ঘুরে। সবশেষে আসছে ধীর মন্থর গতিতে ঘন-কালো জমাট বাঁধা বিরাট এক মেঘের স্তূপ এগিয়ে। দেখতে দেখতে সেই মেঘ মাথার উপরে উঠল— কালো মেঘ হাওয়ার ধাক্কায় সমস্ত আকাশে ছাই হয়ে ছড়িয়ে গেল। হাওয়া হু হু ক'রে আরো জোরে বইতে বইতে এক সময়ে থেমে গেল। টুপটাপ ক'রে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল।

ঘরে ঢুকলুম। উঠোনে জল জমল— সেই জলের উপরে ধারাপাতের সঙ্গে সঙ্গে ছোটো বড়ো নানা আকারের বুদ্বুদ মুক্তোর মতো ওঠানামা চলাফেরা করতে করতে এক সময়ে আচমকা থেমে গেল। উঠোনের জল নর্দমায় গড়িয়ে গেল। পরিষ্কার আকাশে চকচকে রোদ্দুর দেখা দিল। কাকগুলি কা কা করতে করতে দেওয়ালের উপরে এসে বসল।

নতুন জমাদারনি জাতিতে মুসলমান, টানাটানা চোখ, ভালোমানুষ বেচারা —ঘরের কোনায় বসেছিল, ব'লে উঠল— 'আজ কী মনে হ'ল— ভাবলুম অনেকদিন ক্ষেতগুলি দেখি নি, যাই একবার দেখে আসি গা। এই— এখানে আসবার আগে গেনু সেখানে; আহা গো, টিপে দেখনু পেত্যেকটা গাছে মুখে দুধ নিয়ে ধানগুলি এইভাবে থোড বেঁধে বেঁধে আছে'— ব'লে পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো দু-হাত জুড়ে মাথার উপরে তুলে ধ'রে উপর দিকে তাকিয়ে বললে— 'বৃষ্টির আশায় গো— বৃষ্টির আশায়। বৃষ্টি পেল— এইবার তারা এই এমনি এমনি করে ছড়িয়ে পড়বে।' জমাদারনি হাতের আঙুলগুলি টান ক'রে ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পডার ভঙ্গি দেখাল।

ইন্দুমতী হুংকার দিতে কয়েদিরা টিনের থালা-বাটি হাতে বেরিয়ে এসে ভাত ডাল নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল। ভারী এল জল দিতে, হাঁড়ি এল ময়লা নিতে। সবশেষে এল হেড-জমাদার ছড়ি বগলে, চাবি-হাতে— তাড়াতাড়ি কাজ সারতে। আজ বড়ো তাড়া— বাইরে অনেক কাজ বাকি। কাল শেষ রাত্তিরে টি. বি. ওয়ার্ডে রোগী মরেছে এক। হিসেবপত্র লেখা-জোকার পর এতক্ষণে মরার মুক্তি। এবারে গিয়ে শবদেহ বের ক'রে দিতে হবে তাকে।

পশ্চিম আকাশে শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। নন্দিতা জানলার গরাদে উঠে গান ধরল—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে—

পায়ে-চলার পথ বন্ধ, কিন্তু মন আটকাবে কে? সে চলল খোলা দুয়ার দিয়ে সীমাহীন পথে—

যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥

নয়

পাঁচ-ছয়দিন ধ'রে আকাশে মেঘের আনাগোনার বিরাম নেই। সূর্য আলো দেয় না দিনে, রাতে চাঁদ-মুখ কালো। চারদিকে একটা থম্‌থমে ভাব— কী যেন কী ভীষণ কিছু ঘনিয়ে আসছে সামনে। এমনি সময়ে একদিন বিকেলে দেখা দিল ঝড়, জল— এলোমেলো হাওয়া— দারুণ দুর্যোগ। হাওয়ার দাপটে বৃষ্টির ধারা ভেঙেচুরে ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে;— আছড়ে পিছড়ে সব একাকার। শব্দ দিচ্ছে কেবলই শোঁ শোঁ শাঁ শাঁ; শুনে বুক দুরুদুরু করে। কোথাকার কত রকমের গাছের পাতা, ডালের টুকরোয় ঘর ভরে গেল। বাইরের তুমুল গর্জনে ঘরের ভিতরে একে অন্যের কথা কানে পৌঁছয় না। জলের ছাঁটে মেঝে ভিজল, আমরা ভিজলুম। বিছানা গুটিয়ে বাড়তি শাড়ি জামা কোলে নিয়ে এক কোনায় জড়ো হয়ে ব'সে রইলুম। হাওয়াতে জলেতে পাতাতে মেঘেতে সে-কী তুমুল মাতামাতি! বিরাম নেই কারো; কী যেন এক মহা-আক্রোশে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সব। সমস্ত রাত কাটল এইভাবে; কোথায় কী ঘটল না-জানি! রাতের শেষদিকে তর্জনগর্জন থামল— সব শান্ত হল। আকাশে ভোরের আলো দেখা দিল— চারদিক পরিষ্কার হয়ে এল। বাইরে বেরিয়ে এলুম। দেওয়ালের উপরগুলি সব ঝরঝরে। কতরকমের গাছের ডাল ওদিক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এতদিন, তারা আজ নেই; পাতায় ছাওয়া অশথের ডাল আজ শুকনো কাঠির মতো খোঁচা বের ক'রে আছে। যে-পাতায় দুপুরের রোদ ঝলমল করত, যে-পাতার আড়ালে কাকগুলি বিশ্রাম নিত, রাতের শাদা আকাশে যে কালো পাতাগুলি দুলে দুলে চোখ মন ভোলাত, তাদের মুচড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে নিল কোন্ নিষ্ঠুর এমন ক'রে? ছিঁড়েই তো

নিয়েছে— ডালের গায়ে পাতার বোঁটার অবশেষ সেই কথাই তো প্রমাণ করে। অশথডালের কোলে একটি বেলগাছের মাথায় খড়-কুটোয়-ঘেরা বাসা ছিল কটি কাক-শালিকের— সেই আকাশটুকু খালি— কত আলো আজ সেখানে।

চোখ নামিয়ে নিলুম— নিচে দেখি, সবুজপাতায় উঠোন ছাওয়া। মনে হয়, কে যেন পাতাগুলি ঢেঁকিতে কুটে থেঁতলে তবে ছড়িয়েছে এমনি করে! বুকের ভিতর কেমন ক'রে উঠল।

মনে পড়ল— চার বছরের শিশু অভিজিৎ— চন্দ্রমল্লিকার গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে হাতে ঘ'ষে ঘ'ষে সবুজ রঙ বের করছিল— ছবিতে রঙ লাগাবে ব'লে; বাপ তাকে ধ'রে এনে ঘরের কোনায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

আর আজ— এই যে কোন্ এক দুর্দান্ত মহাশিশুর এই দুর্বিনীত খেলা— এর শাস্তি দেবে কে তাকে?

ইন্দুমতী চিরস্বভাবগত হুংকারের ধাক্কায় কয়েদিদের দিয়ে চার ইঞ্চি পুরু সবুজ পাতার গালিচা উঠোন থেকে পরিষ্কার করাতে লাগল।

দানা-বাঁধা ঘাস-গাছটি আজ কাদা-জলে লুটিয়ে পড়েছে। আহা, এটুকু প্রাণে কি সয় এত বড়ো ধাক্কা? ইন্দুমতী এক হেঁচকা টানে সেটি উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবর্জনার স্তূপে। হায়! এর সরু লম্বা পাতা কয়টি কত দুলেছে হাওয়াতে, সকালে বিকেলে— আলোতে ছায়াতে; দুলেছে আমার প্রাণেতে। সে দোলা আজও আছে সেখানে— কিন্তু নেই উঠোনের কোণে।

ইন্দুমতী সামনে এসে হেঁড়ে গলায় বললে— 'কেত্তো গাছ কাল পড়ি গেছে ঝড়মে। এরে বাব্বারে— বাব্বা কেত্তো। এই মোটা মোটা— জেলখানার বি কেত্তো গাছ—'

নতুন জমাদারনি মিহিগলায় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গালে হাত দিয়ে বললে— 'আহা গো— মাগো— বড়ো বড়ো রিরিক্ষি গাছ গো মা; কাল রাতে ঝড়ের দাপটে এই এমনি এমনি ক'রে রাস্তার দু-পাথারে প'ড়ে আছে— ব'লে শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে গাছ পড়ার ভঙ্গি দেখাল।

বাইরের থেকে দু-জন হাড়ি এল আজ ঝাঁটপাট দিতে, তাড়াতাড়ি সব পরিষ্কার করতে। তাদের মধ্যে একজন সেই কয়েদিটি, যাকে আমার বড়ো ভালো লাগে দেখতে। মাঝে কিছুদিন সে আমাদের ইয়ার্ডে আসে নি, বোধ হয় অসুখ করেছিল বা অন্য কিছু। কালো কুচকুচে শরীর— যেন কালোপাথরে

খোদাই করা মূর্তিটি। বয়েস হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, সামনের দুটো দাঁত ভাঙা; কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল হয়তো। কিন্তু কী শরীরের গড়ন— চওড়া কাঁধ, বুকের মাংসপেশীগুলো চলার তালে কথার ফাঁকে যেন নেচে নেচে ওঠে। বহুদিনের জন্য এসেছে এখানে, অনেক সাল কেটে গেছে, আরো অনেক কাল কাটাতে হবে; তারপর যদি প্রাণে বেঁচে থাকে তো এক সময় ছাড়া পাবে।

একদিন তাকে একফাঁকে জিগগেস করেছিলুম— 'কী দোষে ধ'রে এনেছে ?'

উপুড় হয়ে নর্দমা পরিষ্কার করছিল। প্রশ্ন শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। সে কী ভঙ্গি। মনে হল, যেন বলার চেয়ে অনেক বেশি ব'লে ফেলল।

নারকেল-কাঠির ঝাঁটা দিয়ে আজও সে উঠোন নর্দমা একমনে ঝাঁট দিয়ে চলেছে— একপাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখছি তাকে।

এক সময়ে সে আমার কাছে এসে নিচুগলায় বললে—'আচ্ছা এতে কি কিছু হবে ?'

বললুম— 'কিসে ?'

সে বললে—'এই যে স্বদেশীবাবুরা যা করছেন, তাতে ?'

কী উত্তর দেব ভাবছি—

লোকটির চোখ দুটিতে আনন্দ উপচে উঠল, আরো কাছে এসে— আরো চুপিচুপি— ছেলেমানুষের মতো একমুখ হেসে বললে— 'আমরাও সব খালাস পেয়ে যাব ? স্বরাজ তো হয়ে গেল বলে— না ?'

ভিতর থেকে কে যেন আমার মুখ চেপে ধরল। কী বলব ?—তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লুম।

বেলা বাড়ল। ডেপুটি-জেলার একটি কাগজের টুকরো হাতে নিয়ে এলেন, তাতে— এলা, শান্তি, নন্দিতা, ভবানীকে নিয়ে আমাদের পাঁচজনের নাম। বললেন, আমরা যেন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিই, ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই বের হতে হবে, অন্য জেলে চালান যাব।

বাসা-বাঁধা মন— দু-দিন কোথাও থাকলেই শেকড় গাড়ে। তুলে নিতে লাগে। কিন্তু উপায় কী ? ধীরে ধীরে জিনিসপত্রে হাত দিলুম। ভাবী এগিয়ে এলেন, হাত থেকে শাড়ি-জামা কেড়ে নিয়ে আবার ফিরে ফিরে পাট

ক'রে গোছাতে লাগলেন। মাথার ঘোমটা আজ কপাল অবধি টেনে দিয়েছেন —চোখমুখ আড়াল ক'রে। মায়া ছটফট করছে ঘরে বাইরে— নিজেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে নিজে; 'কী হবে দুঃখ ক'রে? যখন কাজে নামি— তখন তো এমন কথা ছিল না যে আমরা সকলে একসঙ্গে থাকতে পারব। সব জেনে শুনেই তো এখানে আসা। যেদিন আমি আর ভাবী এখানে আসি তখনো তো আপনারা কে কোথায় সব। কেন দুঃখ করব? কষ্ট হচ্ছে, হবেও; কিন্তু দুঃখ করব না।'

মমতা এক কোনায় চুপ; বাঁধ ভাঙল ব'লে।

সময় হয়ে এল রওনা হবার। বিছানা বাক্স আপিসে পাঠিয়ে ইন্দুমতী হাঁক দিল। এক এক ক'রে ফটকের বাইরে বের হলাম। দড়াম ক'রে ফটক বন্ধ হল— চকিতের মতো দরজার পাশে ভাবীর জলভরা দুটি চোখ— ছবির মতো জেগে রইল।

দশ

আপিসের কাজ সারা হলে— দুটো ঘোড়ার গাড়িতে ভাগাভাগি ক'রে উঠে বসলুম। আগে-পিছনে পুলিশ পাহারা। জেলার ডেপুটি-জেলারের বাড়ির জানালার পরদাগুলির ফাঁকে ফাঁকে— কৌতূহলী জোড়া জোড়া সুর্মা-পরা চোখ, সিন্দুরের টিপ-পরা কপাল, গোছা গোছা কাঁচের চুড়ি, সোনার চুড়ি, শাদা শাঁখা-পরা সরু মোটা হাত দেখা দিল।

চাবুকের ঘা খেয়ে ঘোড়াগুলি টগবগ ক'রে পা ফেলল, গাড়ি গড়িয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দু-পাশে বোঁ বোঁ ক'রে কয়েকটা সাইকেলও ছুটল। আরোহীদের কেউ যুবক, কেউ প্রৌঢ়— কারো গায়ে কোট, কারো গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, শাদা টুইলের শার্ট; কারো চোখে চশমা, কারো বা গালভরা পান। দেখে মনে হয় হঠাৎ যেন তাদের কোনো জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, বা ঘরে রোগী শেষ নিশ্বাস টানছে— ডাক্তার ডাকতে ছুটছে। কিন্তু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার তারা থামে কেন মাঝরাস্তায়? কেউ বা মালকোঁচা মারে, কেউ পানের দোকানের জলন্ত নারকেল-দড়ি থেকে বিড়ি ধরায়, কারো

বা সাইকেল বিগড়োয়, কারো বা দেখা হয়ে যায় অতিপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে— হঠাৎ এই সময়েই।

এলা বললে, 'দেখছ কী অত ? এরা আমাদের গুপ্তসাথি।'

খেয়াল হল— তাই তো।

সিউড়ি স্টেশনে waiting-room-এ সোজা এনে ঢুকিয়ে দিল আমাদের। ফাঁকে ফাঁকে মুখ বাড়াই— চেনা মুখ আছে কয়েকটি। গুপ্তসাথিরা এক-একজন তাদের গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'সে আছে গল্প করার ভাবে।

ইন্দুমতীও চলেছে আমাদের সঙ্গে। পরনে আজ ধোপ-দুরস্ত ঘাগড়া-জ্যাকেট, পায়ে তার কালো রঙের পুরুষের জুতো, কালো ফিতে লাগানো। এই মাপের মেয়েলি জুতো বোধ হয় বাজারে নেই।

ইন্দুমতীর মুখে আজ আর হাসি ধরে না। আমাদের পান কিনে খাওয়াচ্ছে, চায়ের অর্ডার দিচ্ছে, আদর-আপ্যায়নের সীমা নেই।

নন্দিতা বললে— 'ইন্দুমতী বুঝেছে যে, আজ থেকে আমরা ওর আওতার বাইরে— তাই এই খাতির ; ধূর্ত কি কম ও !'

অনেকক্ষণ স্টেশনে অপেক্ষা করার পর ট্রেন এল। Escort আমাদের একটি রিজার্ভ কামরায় তুলে দিলেন, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া বারণ। ট্রেন হুইসেল দিল— প্ল্যাটফরম ছেড়ে গাড়ি চলল।

এতক্ষণ গাড়ির দরজার কাছেই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিলুম। এবার ফিরে দাঁড়ালুম, বেঞ্চিতে বসব ;— দেখি, একটি ভদ্রবধূ বেঞ্চের কোনায় ব'সে আছেন। কোন্-এক ফাঁকে যে একজন তাকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন— কেউ দেখি নি।

এতদিনের নানা অভিজ্ঞতার ফলে খুব সাবধান আমরা। মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে বধূটি সম্বন্ধে সাবধানতামূলক বার্তা প্রচারিত হয়ে গেল। যে যার জায়গা বেছে ব'সে পড়লুম।

থাকে থাকে কালো মেঘ পশ্চিমের লাল আকাশের গায়ে থমকে আছে— সরু সোনালি পাড় ঘেরা ঘনমেঘ, যেন কচি মেয়ের নীলশাড়ির সোনালি পাড়টুকু দু-পা ঘিরে কোমরে উঠে গেছে।

নিচে খোলামাঠে কতরকম সবুজ— নানা আকারে কতদূরে চ'লে গেছে। তারই মাঝে গাছপালায়-ঢাকা ছোটো ছোটো গ্রাম। ঘরের চালে অস্তগামী

সূর্যের লাল আভা। দলে দলে গোরু মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পাঁচন হাতে নেংটি পরা ছোটো ছোটো ছেলে। ঘাটে মেয়েরা জল নিচ্ছে কলসী ভ'রে; কেউ গা ধুচ্ছে জলে নেমে। পাশ দিয়ে ট্রেন যেতে দু-হাতে ভিজে আঁচলের পরদা টানিয়ে নিজেকে আড়াল করলে। মেঠো রাস্তা দিয়ে চলেছে গোরুর গাড়ি এঁকে বেঁকে। দূরে তাল গাছের সারি— তার কোলে নীল রঙের গাছের স্তর হালকা হ'তে হ'তে দূর দিগন্তে গিয়ে ঠেকেছে। কী অপরূপ শোভা চার দিকে। যা দেখছি চোখ মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাশফুল? কাশফুল দেখছি নে কেন আজ একটিও? শরৎ কি তা হলে চ'লে গেছে নিজেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে?

সন্ধে হয়ে এল। মাঠের ও-পার থেকে ধোঁয়ার মতো ঘন কুয়াশা এগিয়ে আসতে লাগল।

আকাশে গোল চাঁদ উঠেছে— পূর্ণিমা কাছাকাছিই। অজয় নদের উপর দিয়ে ট্রেন চলেছে; চওড়া বালির চড়া— মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে সরু জলের রেখা এঁকে বেঁকে, ঘুরে— দৃষ্টির বাইরে। ফুটফুটে চাঁদের আলোয় নিচের বালির কণাগুলিকেও বুঝি স্পষ্ট দেখা যায়। এই সেই অজয় নদ— শান্তিনিকেতনে যেতে-আসতে এই অজয়কে কতবার দেখেছি; বান ডেকেছে অজয়ে— দলে দলে ছুটেছি পথের লাল ধুলো উড়িয়ে তাকে দেখতে। সেই অজয় ঘুরে এসেছে এখানে;— আপনজন দেখার মতো অজয় নদকে দেখে মন খুশিতে ভ'রে গেল।

পুলের এদিকে লাইনের ধারে ছোটো ছোটো তাঁবু। লাইন মেরামত করে কুলিরা দিনে, রাত্তিরে থাকে তাঁবুর ভিতরে। দিনশেষে কাঁচা কয়লা জ্বালিয়েছে, রান্না করবে। আগে এদের দেখে কত দুঃখ করেছি; আজ মনে হল— এই আকাশের নিচে, খোলামাঠের বুকে— এরা না-জানি কত সুখী!

চোখের পলক ফেলছি না, দেখতে কিছু হারাই পাছে। যেন কতদিনের ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত চোখ-মন। যা দেখছি, আকণ্ঠ পুরে পান করছি;— এত ঐশ্বর্য পৃথিবীর বুকে ছড়ানো— এত অঢেল দান তাঁর— তা কই আগে তো দেখতে পাই নি?

বড়ো বিরক্ত করছেন এক ভদ্রলোক। স্টেশনে ট্রেন থামলেই আমাদের কামরার কাছে আসেন— সন্ধানী চোখে নানাভাবে উঁকিঝুঁকি মারেন। আবার কোনো কোনো স্টেশনে এসে বলেন— 'আমার একটা বেতের ঝুড়ি আছে, দিন তো?' বেঞ্চের নীচ থেকে বেতের ঝুড়ি বের ক'রে দিই। কোনো

বারে হয়তো বলেন— 'আমার পায়রার খাঁচাটা— সেটা চাই ; দেবেন ওদিক থেকে ?' পায়রার খাঁচা কোত্থেকে এল এখানে ? এ-বেঞ্চ সে-বেঞ্চ খুঁজে শেষে পাওয়া গেল— সত্যিই কয়েকটা পায়রা সমেত বাঁশের খাঁচা একটা। বের ক'রে দেওয়া গেল তা। এমনিই চলেছে— একটা-না-একটা প্রতি স্টেশনে। শেষে পাঁচরা স্টেশনে আবার সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন কামরার সামনে। নন্দিতা ঝুঁকে পড়ে বলল, 'বলুন দেখি নি, আমাদের সঙ্গে একস্বরে সুর মিলিয়ে — বন্দে মাতরম্। বলুন— আমি বলছি আর আপনি বলতে পারবেন না ? বলুন— বলুন।' ভদ্রলোক 'তা-না-হাঁ' ভাবে ঠোঁট নাড়ছেন, বন্দে মাতরম্ আর বলেন না কিছুতেই ; নন্দিতাও ছাড়ে না, বলছে— 'এই আমরা মেয়েরা বলছি— আর আপনি একজন youngman— আপনার এটুকু সাহস নেই ?'

প্ল্যাটফরমে লোক জমে গেল তাকে ঘিরে। ভদ্রলোকের পিছু হটবারও উপায় নেই। শেষে ট্রেন হুইসেল দিতে এক লাফে পাশের কামরায় উঠে নিস্তার পান। আর নামেন নি কোনো স্টেশনে আমাদের বিরক্ত করতে।

ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখে আমাদের escort মুখ টিপে হাসছিলেন। লোকটি বড়ো ভালো, জাতিতে ব্রাহ্মণ। নন্দিতা তাঁকে কী একটা কথা বলতে, তিনি মুখ নিচু ক'রে বললেন— 'আমরা পুলিশের লোক, আমাদের বিশ্বাস করবেন না।' শুনে বড়ো শ্রদ্ধা হল তাঁর প্রতি।

ট্রেন এসে থামল অণ্ডাল স্টেশনে। Escort বললেন, এখানে আমাদের নামতে হবে। নেমে পড়লুম।

পরের ট্রেন আসবে রাত বারোটা চব্বিশ মিনিটে ; তিন ঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে। প্ল্যাটফরমে একটা লাইটপোস্টের নিচে কম্বল বিছিয়ে হাত-পা মেলে আরাম ক'রে ব'সে যাত্রীদের চলাফেরা দেখতে লাগলুম। সামনে জলের কল ; কেউ এসে হাত-পা-মুখ ধুচ্ছে, কেউ ঘটি ভ'রে খাবার জল নিচ্ছে, কেউ-বা পাশে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের ঠোঙা থেকে খাবার তুলে তুলে মুখে পুরছে। মাথার উপরে দুটো এরোপ্লেন লাল নীল বাতি জ্বালিয়ে বোঁ বোঁ শব্দে চক্রাকারে ঘুরছে। এক ছোকরা শিস দিতে দিতে আমাদের প্রদক্ষিণ করছে আর গান গাইছে :

'শেফালি তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদপ্রাতে—'

আর একজন তুড়ি দিয়ে দিয়ে শরীর দোলাচ্ছে—

'নীল পরী স্বপনে জাগিল রে জাগিল'।

Escort গেলেন ইন্দুমতীকে নিয়ে বাজারে খাবার কিনতে। তিন জন সিপাই রইল আমাদের পাহারা দিতে।

শুয়ে বসে চাঁদের আলোয় বেশ সময় কাটাচ্ছি। স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় ব'সে থাকতে যে এত ভালো লাগে তা জানতুম না। এই অবস্থায় যাতে না পড়তে হয় তার জন্য আগে কত সতর্ক থাকতুম। যদি-বা দৈবে কদাচিৎ এমন ঘটত— অসন্তোষ অসোয়াস্তির সীমা থাকত না; আর আজ মনে হচ্ছে— এই স্টেশনই বা কত সুন্দর— এইভাবে ট্রেনের অপেক্ষায় ব'সে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো কত মধুর।

তেল-চুকচুকে চুলে তেরি কাটা, পায়ে পামশু, গায়ে খাকি কোট— এক যুবক এসে দাঁড়াল সামনে। ডানহাতে তার জলন্ত বিড়ি— বাঁ-হাতে নীল-রঙের চকচকে সিল্কের রুমাল। মুখভরা পান চিবুতে চিবুতে রুমাল দিয়ে সে মুখটা একবার মুছল— বিড়িতে টান দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর ডানহাত কোমরে রেখে হেলে দাঁড়িয়ে— পরম আত্মীয়তার সুরে জিগগেস করল— 'ম্যাডাম, কোন্ জেলার দেবী আপনারা?'

তার রকম দেখে থমকে গিয়েছিলুম, প্রশ্ন শুনে ভড়কে গেলুম! সে তার প্রশ্নের জটিলতা উপলব্ধি ক'রে সহজ ভাষায় বললে—'দেবীদের কোন্ জেলায় আবির্ভাব— মানে মাতৃভূমি?'

শান্তি ব'লে উঠল—'এই জেলায়ই এই সব দেবীর আবির্ভাব; কিন্তু তুমি এখন যাও, দেখছ না কত পুলিশ হাঁটাহাটি করছে এখানে?'

'ওঃ—আচ্ছা, Thank you sir, good night' ব'লে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছে শিস দিতে দিতে সে চ'লে গেল। দেবীরা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

ট্রেনের সেই ভদ্রলোক আবার এসে উপস্থিত— ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে; বললেন—'একটা চাদর দেখেছেন—শাদা চাদর? পাচ্ছি নে খুঁজে; ট্রেনে আপনারা পেতে বসেন নি তো?'

গম্ভীর মুখে সবাই ঘাড় ফিরিয়ে নিল। ভদ্রলোক খানিক এদিক-ওদিক ক'রে চ'লে গেলেন।

Escort-এর কাছে জিগগেস ক'রে জেনেছিলুম ট্রেনের বধূটি ভদ্রলোকের বউদি!

এলা ব'লে উঠল—'জালাতন। ঝুঁড়ি, খাঁচা, পায়রা, চাদর সবই তো হল—

বাকি রইল না আর কিছুই ; এবার এসে দেখো ঠিক জিগগেস করবেন—'বউদি—আমার বউদি কোথায় গেল—খুঁজে পাচ্ছি না ; দেখেছেন তাঁকে ?'

'তা না হয় ভালোই ; কিন্তু বউদিকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি ধ'রে টান না দেয় আবার ?'

ইন্দুমতী একমুখ হেসে দু-হাত জোড়া বিরাট এক খাবারের ঠোঙা এনে ধরল সামনে। পিছনে তার তিনটে ঘেয়ো কুকুর রোঁয়া-ওঠা সরু সরু লেজ নাড়ছে। এত খাবার ! খেয়ে, খাইয়ে, বিলিয়ে, ছড়িয়েও শেষ হয় না ; শেষে ঠোঙাসুদ্ধ বাকি খাবার কুকুরের ভোগে লাগিয়ে ওয়েটিং-রুমে হাতমুখ ধুতে এলাম।

বেঞ্চির উপরে তিনটি শিশু— একটি বিধবা মহিলার কোলে পিঠে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আর পাশের বউটি ব'সে তাদের ধমকাচ্ছে—'ঠাণ্ডা হয়ে বোস— দিদাকে জ্বালাস নে অত।'

বউটির পরনে গোলাপি বেনারসি জমিতে সোনালি বুটি। গায়ে সোনায় পাথরে মিলিয়ে নানা অলংকার। কানে কানবালা, হাতে চুরি, বালা, শাঁখা, উপরহাতে ঝুমকো-ঝোলা বাজু ; গলায় মফচেন নেকলেস ; মাথায় চিরুনিফুল সোনার ক্লিপ ; হাতের আঙুলে গোটা ছয়-সাত আংটি। শ্যামল মুখে কেমন একটা কচিকচি ভাব। পাশে বসতে, সে বললে—'কোথা থেকে আসছ, কোথায় বা যাচ্ছ ?'

বললুম—'আসছি সিউড়ি জেল থেকে, যাচ্ছি বোধ হয় আরেকটা কোনো জেলে—'

'আহা—হা,' ব'লে বউটি আমার হাত চেপে ধরল। করুণায় মুখখানি ছেয়ে গেল ; বললে, 'সাধ ক'রে কেন এমন কাজ করা ভাই ?'

ট্রেন আসবে, ঘণ্টা পড়ল। কুলিদের চিৎকার, যাত্রীদের উৎকণ্ঠা, কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠা শিশুদের কান্না, বাবুদের হাত ধ'রে গিন্নিদের ছুট— সব মিলিয়ে চারদিকে একটা হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি ব্যাপার।

আমরাও ছুটলুম— আগে-পিছে সিপাই নিয়ে।

ট্রেন এসে থামল স্টেশনে। এত যাত্রী অপেক্ষায় ছিল এই ট্রেনের জন্য ! এরা সব ছিল কোথায় এতক্ষণ গা-ঢাকা দিয়ে ? এদিকে ট্রেনের কামরার যা অবস্থা ; প্রায় সব কামরাগুলিই দখল করেছে গোরা সৈন্যের দল। বাকি আছে তিনটি মাত্র কামরা—একটি 'ইণ্টার' ও দুটি 'থার্ড' ; ভিতর ঠাসা, একতিল

জায়গা নেই তাতে। ঝুলে, দাঁড়িয়ে, ব'সে, কাত হয়ে— যাত্রীরা নিশ্বাস ফেলছে কোনোরকমে। এর মধ্যে উঠতে হবে ? অসম্ভব কথা। জায়গা কোথায় যে উঠব ? প্ল্যাটফরমের একমাথা থেকে আর একমাথা— দৌড়োদৌড়ি করছি।

Escort, সিপাইরা ধাক্কাধাক্কি ক'রে এরই একটা কামরায় উঠে জানলা দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি ঠেলে তুলতে লাগল। এলা ভবানীও উঠল— ইন্দুমতীও। হুস্‌-হুস্‌ ক'রে ট্রেন ছেড়ে দিল।

কী করি এখন ? উপায় ! এ-দিকে ও-দিকে ছুটে ছুটে চিৎকার করছি— 'চেন টানো, চেন টানো'। কে শোনে কার কথা। এক এক ক'রে কামরাগুলো প্লাটফরম পেরিয়ে চলল।

পাশ দিয়ে একটি টিকেট-কালেক্টারকে যেতে দেখে শান্তি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরল—'শিগগির শিগগির ট্রেন থামান। নইলে— মানে আমরা political prisoner - শিগগির—'।

ভদ্রলোক হতভম্ব। শান্তি তার হাতে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—'আঃ— সিপাই escort সবাই উঠে গেছে— বুঝতে পারছেন না ? আমরা— আমরা যে political prisoner—'।

এবারে ভদ্রলোক আঁচ করলেন খানিকটা। গার্ডের কামরা প্ল্যাটফরম ছেড়ে যাচ্ছিল ; দৌড়ে গিয়ে তাতে উঠে চেন টানলেন।

ইতিমধ্যে আমাদের Escort'ও ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছেন। হাত-পা ছ'ড়ে গেছে। হাতের রক্ত চুষতে চুষতে ছুটে এলেন।

কিছুদূরে গিয়ে ট্রেন থামল— তাড়াতাড়ি তাতে উঠে বিছানার মোটের উপর চেপে বসলুম। দেখে শুনে ট্রেন ছাড়ল— এবারে আর কেউ বাকি প'ড়ে নেই।

এতক্ষণে কুলকুল হাসিতে ভেঙে পড়ল সবাই। সত্যিই, কী বিষম কথা— ট্রেন চ'লে যাবে মাঝ রাস্তায় আমাদের ফেলে ? আমরা যে political prisoner !

এগারো

শেষ রাত্রে ট্রেন এসে থামল ব্যাণ্ডেল জংশনে। এখানে ঘণ্টাদেড়েক অপেক্ষা ক'রে চড়লুম অন্য ট্রেনে। এখন আর তত কড়াক্কড়ি নেই: রাস্তার লোক-জনের সঙ্গে কথা বলতে পারি, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে এক কামরায় যেতেও পারি, কিন্তু মুশকিল এই— আমাদের সঙ্গে পুলিশ দেখে কেউই আর ভয়ে এগোয় না। কী আর করি, স্কেচ-খাতাখানি বের ক'রে স্কেচ করতে লাগলুম। এক ভদ্রলোক উঠলেন গাড়িতে— সঙ্গে বয়স্কা কুমারী মেয়ে; ভদ্রলোকের পরনে মিহি সুতোর কোঁচানো ধুতি, গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবি, উপরে খয়েরি রঙের সিল্কের ওয়েস্ট কোট, পিঠের দিকে টিনের বকলস আঁটা। কাছাকাছি কোথাকার এক জমিদার তিনি। মুখে একজোড়া মিশকালো পাকানো গোঁফ, গোটা মাথায় শাদা ধবধবে টাক— শুধু কানের দু-পাশে কয়েকগাছি কাঁচা-পাকা চুল। ছোটোখাটো রোগা হালকা চেহারা।

মেয়েটির পরনে টিয়ে রঙের ডুরে-শাড়ি, হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, খোঁপায় কালো জালে মোড়া হলুদ সোনার ফুল, কানে লাল পাথরের দুল। মুখ নিচু ক'রে দৃষ্টি নামিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ব'সে আছে সামনে। গায়ে কাশ্মীরী শাল— পিন দিয়ে আটকানো; মুখ আর হাতের আঙুলগুলি ছাড়া দেহের গৌরবর্ণ সবটাই ঢাকা।

আমার হাতে খাতা-পেন্সিল দেখে ভদ্রলোকের অসোয়াস্তির সীমা নেই; কেবলই উসখুস করছেন— দেখবার জন্য গলা বাড়াচ্ছেন, আর মেয়েকে আড়াল করবার চেষ্টায় আছেন। শেষে কী একটা স্টেশনে গাড়ি ঢুকতেই ভদ্রলোক আর থাকতে পারলেন না; বললেন— 'দেখি আপনার খাতাটা একটু।' দেবার তর সইল না, বাঁ-হাতে আমার খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে— পাতা কয়টির এ-পাশ ও-পাশ উলটে-পালটে, ইন্দুমতীর স্কেচটা মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিশ্চিন্তমনে বেঞ্চের উপর খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে মেয়েকে বগলদাবা ক'রে গোঁফে চাড়া দিয়ে নেমে গেলেন।

নৈহাটিতে এসে আবার আমরা নামলুম। সব স্টেশনের নাম তুলে ফেলা হয়েছে, বোঝবার উপায় নেই— কোন্‌টা কী। কাউকে জিগগেস করলে মুখ

ঘুরিয়ে চ'লে যায়, স্টেশনের নাম বলে না। নিয়ম নেই। নৈহাটিতে ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করতে হবে। দুপুরের খাওয়া এখানকার হিন্দু-হোটেলে সেরে নিতে বেরিয়ে পড়লুম। স্টেশনের পাশেই হোটেল। দু-পাশে পানের পিক ছড়ানো সরু অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ছোট্ট একটা ছাদে রান্নার আয়োজন। একপাশে ছোট্ট একটা খাবার ঘর। পাশের রাস্তা থেকে বটগাছ উঠেছে— একতলা ছাপিয়ে। তারই ছায়ায় ব'সে একটি ঝি তরকারি কুটছে— পেঁপে, কাঁচকলা, কুমড়ো, কচু ঝুড়ি ঝুড়ি। পোষা বেড়াল থাবা বাড়িয়ে ব'সে আছে কাছে।

খাবার জায়গা হয়েছে ঘরে, ভিজে মেঝেতে কুশাসন পেতে। কেরোসিন টিন থেকে জল নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বসে পড়লুম। ঝি পাতলা পিতলের গ্লাস জালায় ডুবিয়ে ভ'রে দিল— উড়ে বামুন পরিবেশন করল— ভাত, মাছের ঝোল, ঝাল, চচ্চড়ি, ডাল।

অনেক কালের কৌতূহল ছিল— এই সব হোটেল সম্বন্ধে— এতদিনে তা মিটল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ওয়েটিং-রুমে ফিরে এলুম। দেখি, দরজার কাছে বিরাট এক লালে লাল মাতাজি ব'সে আছেন ছোট্ট একটি স্টীল-ট্রাঙ্কের উপর। পরনে লাল-গেরুয়া শাড়ি, কাঁধের দু-পাশে ভিজে চুলের রাশি, পা জুড়ে আলতা, কপালে টাকা সমান টিপ, সিঁথিতে তিন আঙুল-চওড়া সিন্দূর, যেন লাল কাঁকরের রাস্তা চ'লে গেছে মাথার উপর দিয়ে। হাতে রুদ্রাক্ষের বালা, তাবিজ, মুখে গালভরা পান, দু-গাল বেয়ে রস গড়াচ্ছে ; কোলে খোলা ধর্মগ্রন্থ ; কিন্তু দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে এ-দিকে ও-দিকে, সামনে পিছনে, নাকের ডগার চশমার উপর দিয়ে।

সময় নেই দাঁড়িয়ে দেখবার। আবার ট্রেনে উঠলুম। নামলুম রানাঘাটে। আবার উঠলুম— নামলুম ঈশ্বরদিতে। আবার উঠলুম। এলা বলে, 'আর পারি নে বাপু— শেষ কি নেই এ-পথের? এই মুহুর্মুহু ওঠানামা আর তো ভালো লাগে না।'

কিন্তু আশ্চর্য! এত স্টেশন ঘুরে এলুম, এত অপেক্ষা ক'রে ক'রে— একটা চেনামুখ নজরে পড়ুক কারো! আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব এত তো চারদিকে ; কোথায় গেল আজ তারা সব? এবারে ট্রেন থামল রাজশাহি স্টেশনে।

ইন্দুমতী হন্তদন্ত হয়ে হাঁক ডাক জুড়ল। সিপাইরা তকমা এঁটে পাগড়ি পরল ; আমাদের উপর কড়াক্কড়ি শুরু হল। বুঝলুম— এখানেই এলুম।

ঘোড়ার গাড়ি আমাদের নিয়ে চলল শহরের ভিতর দিয়ে। বাজার ঘুরে, খেলার মাঠের পাশ কাটিয়ে। দু-পাশে বড়ো বড়ো দালান, বাঁশের বেড়ার ঘর, সারি সারি নারকেল গাছের ঝোপ— তার ভিতর দিয়ে উঁকি মারল কালকের পথের সেই রুপোলি চাঁদ।

শক্ত-গাঁথা উঁচু দেয়ালের পাশ দিয়ে গাড়ি চলতেই চিনতে পারলুম— এই-ই আমাদের বর্তমান বাসস্থান। তাড়াতাড়ি চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আর একবার বাইরের সৌন্দর্য দেখে নিলুম। গাড়ি দেয়ালের ভিতরে ঢুকল।

আবার জেলের অফিস। নামধাম লেখানো, জিনিসপত্তর মেলানো, মেট্রনের হাতে আত্মসমর্পণ, ইন্দুমতীর বিদায়সম্ভাষণ ইত্যাদি চুকিয়ে যখন ফের রাজশাহির জেনানা ফাটকে ঢুকলুম— তখন তিন প্রহর রাত। কয়েদিরা ঘুমে অচেতন। তালা খোলার সাড়া পেয়ে সবাই ভুরভুর ক'রে উঠে পড়ল— মেট্রনের ইঙ্গিতে ঘরের একটা কোণের বিছানা সরিয়ে আমাদের জন্য জায়গা ক'রে দিল। 'মিটিন' এগিয়ে এল, অন্যরা তার পিছনে ভিড় করল।

ট্রেনের ধোঁয়াতে— রাস্তার ধুলোতে সারা অঙ্গ মাখামাখি। স্নান করতেই হবে। মেট্রন আমাদের উঠোনে, কালো আমগাছের নিচে জলভরা লম্বা চৌবাচ্চার ধারে নিয়ে গেলেন। অনভ্যস্ত সাড়া পেয়ে ডালের ঘুমন্ত পাখিগুলো ভয়ে কিচি-মিচি ক'রে পাখা-ঝাপটে উঠল।

এতক্ষণে চাঁদ আমগাছের ঠিক মাথার উপরটিতে এসে থেমেছে।

লম্বা চৌবাচ্চা ঘিরে ব'সে বাটি ক'রে ক'রে জল গায়ে ঢালছি। আঃ কী ঠাণ্ডা! থামতে ইচ্ছে হয় না। মেট্রন দূরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছেন— এই হিমের রাত, এত জল গায়ে ঢালা— শেষে না একটা কিছু বেধে বসে।

স্নান সেরে ঘরে এলুম! শরীর ক্লান্ত পথের শ্রান্তিতে।

বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই চোখ বুঁজে এল। শান্ত ঘরের এককোনা থেকে মিটিনের করুণ স্বর কানে বাজল— 'নয় বছরে এই আজ মাথায় চাঁদের আলো লাগল— কী ঠাণ্ডা, শীতল ক'রে দিল মাথার চাঁদিটা। ভিতরে ঢুকতেই আবার কেমন গরম হয়ে উঠল— ঘুম কি আজ আর আসবে রাতে?'

বারো

বেশ এই জেলটি। সিউড়ির চেয়ে বড়ো, গাছপালাও ঢের। চারকোনা সীমানা, পুবে দেয়ালঘেঁষা একখানা বড়ো ঘর— দু-দিকে লম্বা-চওড়া বারান্দা ঘেরা। দক্ষিণে, উত্তরে, পশ্চিমে খানিকটা ক'রে জমি— গাছে, ফুলে ছাওয়া। ফটক থেকে ঘর অবধি যাওয়া-আসার লাল রাস্তা। উত্তরে— জমির মাঝখানে একটি নিমগাছ ; গাছের নিচে একটি পাতিলেবু ও হাস্নুহানার ঝোপ। তার চারদিক ঘিরে গাঁদা-বেলফুলের সবুজ গাছের সারি। পশ্চিম জমিতে দুটি আম গাছ, একটি কাঁঠাল গাছ। আর জায়গা নেই সেই আকাশটুকুতে। আম-কাঁঠালের পাতার শামিয়ানা মাথার উপরে ; তলায় স্যাঁৎসেতে সবুজ শেওলার শতরঞ্চি পাতা। তারি একপাশে সরু একফালি পথ— পথের ধারে তারের জালের খাটুনি-ঘর। দক্ষিণে— ফলভরা দুটো পাতিলেবু গাছ— কাটাতারে ঘেরা। তার ও-পাশে— ক্যানার সারি, এ-পাশে লাল দোপাটি।

এ-ছাড়া সবুজ দেখতে পাই উঁচু দেয়ালের মাথায় ; নানা রকমের পাতা, ডাল ; বট, পাকুড়, আম, জাম, শিরীষ, নিম— কত কী।

খাটুনি-ঘরে তেইশ চব্বিশটি কয়েদি উলের মোজা, পুল-ওভার বুনছে সৈন্যদের জন্য। শীত এসে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ বলেছেন— যে তাড়াতাড়ি বুনে দিতে পারবে সে 'মাপি' পাবে। 'মাপি'র আশায় কেউ মুখ তুলছে না বোনার কাঠি থেকে। তিনটি শিশু খেলা করছে আপন মনে— মাদের কাছে ব'সে।

হাড়ি, মাড়ি, ভারী এসেছিল ভিতরে। তারা চ'লে যেতে মেট্রন খাটুনি ঘরের তালা খুলে দিলেন। কয়েদিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে দৌড়ে দৌড়ে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে মাড়ি খেয়ে— আবার খাটুনি-ঘরে ঢুকে হাতে বোনা তুলে নিল। মেট্রন আবার তাদের তালাবন্ধ করলেন।

সকাল থেকে এতক্ষণ তাঁর ছুটোছুটির বিরাম ছিল না— এবারে একটু সুস্থির হয়ে কোমরে চাবির গোছা লটকে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। একে তো কয়েদিদের আটকানো সামলানো মহা-এক ব্যাপার ; তার উপরে হাড়ি, মাড়ি, ভারী জমাদার এলে কে কোথা দিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল, কি কে একটু মুচকে হাসল— এ-সব তদারক করতে করতে তিনি প্রায় পাগল হবার জোগাড়।

বললেন— 'কোন্ সকালে অন্ধকার থাকতে উঠছি— এখন পর্যন্ত মুখে একটু জল খাওনের সময় পাইলাম না—মুখ একেরে শুকাইয়া উঠছে— এই খাখেন্।' বলে হাঁ করে শুকনো জিভ মেলে ধরলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর কয়েদিদের ঘরে ঢুকিয়ে এক জমাদারনিকে পাহারায় রেখে— মেট্রন নিজের স্নান-আহার সেরে নিতে বাড়ি গেলেন। কয়েদিরা ভালোমানুষের মতো যে যার জায়গায় ব'সে উল বুনছিল আর আড়ে আড়ে দেখছিল; মেট্রন ফটক পার হতেই তারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকাল থেকে অপেক্ষা ক'রে ক'রে এতক্ষণে আলাপ করবার সুযোগ মিলল।

নানা বয়েসের মেয়ে। বেশির ভাগই যুবতী— কারো বয়স ষোলো, কারো আঠারো; কারো বা উনিশ—কুড়ি— বাইশ। কচি কচি ঢলঢলে মুখ কয়খানি দেখলে মায়া জাগে।

পরিষ্কার ঝরঝরে আঁটোসাটো ক'রে শাড়িখানা পরনে, কপাল অবধি নামিয়ে পাতা-কাটা— পিছনে গোল চ্যাপটা খোঁপা। ফরসা, কালো মুখে ঝকঝকে দাঁতগুলি হাসির ফাঁকে চিকচিকিয়ে ওঠে। বেশ লাগে। হঠাৎ দেখলে কেউ মনে করবে মিশনারি স্কুলের যেন ছাত্রী এরা সব। এদের মধ্যে প্রৌঢ়া কয়েকজন, কয়েকজন আবার বৃদ্ধা।

মেয়েদের জিগগেস করলুম— 'কতদিনের জেল তোমাদের?'

প্রশ্ন শুনে খিলখিল ক'রে হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ল। মিটিন বলল— 'এখানে প্রায় সবাই আমরা বিশ বছরের আসামি।'

'দোষ?'

'খুন।'

সর্বনাশ— এইটুকু টুকু মেয়ে এরা—

হাসি তাদের থামে না— খিলখিল হাসে— আর সবাই সবার পিঠে মুখ লুকোয়।

স্বামী খুনের দায়ে ধরা পড়েছে সব!

বলে কী?

জামিনা— ছোট্ট মেয়েটি; চোখে মুখে মিষ্টি হাসি। জিগগেস করলুম— 'তুমি?'

জামিনা সলজ্জ হাসি হেসে কাপড়ে মুখ ঢেকে স'রে দাঁড়াল। পাশে একটি

মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল— ঝাকড়া-ঝাকড়া চুল খুলে ; তার মুখখানি আরো কচি। সে ব'লে উঠল— 'জামিনা ? ও তো এক কোপে দিইছে ওর সোয়ামিরে সাবাড় কইরা— এক্কেবারে দুই আধখানা !'

জামিনা ওদিক থেকে মুখ বের করে ঝাঁজিয়ে উঠল— 'আর তুই ?'

কালো মেয়ে সৈয়দা ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাকুনি দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

সুরাতন— ফরসা রঙের সুন্দর মেয়েটি। সে হেসে সৈয়দার কাঁধে হাত দিয়ে বললে— 'ক না ! লজ্জা কিসের রে ?'

সৈয়দা এক ঝটকায় সুরাতনের হাত সরিয়ে দিয়ে ঘরের কোনায় গিয়ে চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠল— 'তুই, ক না তর কথাটা ? তুই তো তর সোয়ামিরে বিষ খাওয়াইছস।'

সুরাতন তার কাছে গিয়ে আদর ক'রে বললে— 'আমি তো খাওয়াইলেও খাওয়াইছি— না খাওয়াইলেও খাওয়াইছি ; রাগ করস ক্যান ? আয়, আয়— এইদিকে' ব'লে দু হাতে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে আবার তাকে সামনে নিয়ে এল।

মিছিরন ছিল আমার পাশেই ব'সে। বছর চল্লিশ বয়স হবে তার। ভিজে চুলগুলি মাথার উপরে দু-ভাগ ক'রে বাঁধা। মোজা বুনতে বুনতে একবার ক'রে সকলের দিকে তাকায়— আবার উলটে পালটে দেখে বোনা ভুল হল বুঝি-বা ! বলে— 'আমার হুঁশটা কিছু কম কিনা !'

মিছিরনের মুখখানি বেশ। বয়সকালে বোধ হয় আরো সুন্দর ছিল। চোখ দুটোতে দুষ্টুমি-ভরা— হাসতে গেলে চোখের নিচে গাল দুটো উঁচু হয়ে ওঠে, নাকের ফুটো ফুলতে থাকে ; ভারি ভালো লাগে দেখতে তখন তাকে।

মিছিরন মেয়েদের বলল— 'বোইস না ক্যানে তোরা ? দাঁড়াইয়্যা দাঁড়াইয়্যা কি গল্প জমে ? বোইস, বোইস— সব।'

তারা মিছিরনের দিকে তাকিয়ে হেসে জড়াজড়ি ক'রে ব'সে পড়লে তাকে ঘিরে।

মিছিরনকে দেখলেই মনে হয় খুব রসিকা। বললুম— 'মিছিরন, তোমার গল্পই বল আগে। শুনি, কী করেছিলে তুমি। তোমারও কি বিশবছরের সাজা ?'

মিছিরন বললে— 'হইব না বিশবছরের ? হইবই তো।'

'তুমিও কি তবে স্বামী খুন করেছ ?'

'নিজের হাতে খুন না কইরা থাকি, হুকুম তো দিইছিলাম আমি; সে তো নিজে করারই সামিল হইল— কেমন কিনা?' ব'লে মুখ টিপে হেসে বোনা উলটে গুনতে লাগল : 'সোজা-উলটা, সোজা, সোজা-উলটা—।'

মেয়েরা ওর ভঙ্গী দেখে হি হি ক'রে এ ওর গায় ঢ'লে পড়ল।

মুখনাড়া দিয়ে মিছিরন বললে— 'হাসিস্ ক্যানে তোরা? দুর্মতি হইছিল, পাপ কাজ করছি; এখন তার শাস্তি ভোগ করি— এতে লুকাইবার কী আছে?' বলে— 'রাজ্যের লোকের সামনে কোর্টে বিচার হইল— আর এখন লজ্জায় মুখ ঢাকলে চলব ক্যান?'

জিগগেস করলুম— 'সত্যিই কি স্বামীকে তুমি খুন করিয়েছিলে? কেন? স্বামী কি ভালো ছিল না?'

জিভ কেটে মিছিরন বললে— 'পাপমুখে আর ও-কথা তুলতে নাই; অমন ভালো সোয়ামি কারো হয় না। কোর্টের পিওন ছিল, কত টাকা রোজগার করত— কত সুখে আমারে রাখছিল। নিজের ইচ্ছামতো খরচপত্তর করতাম। মুখ ফুইটা কোনোদিন রা করত না।'

'তবে অমন স্বামীকে মারলে কেন?'

'ঐ যে কইলাম— দুর্মতি হইছিল; আমার কপালে আছে— বিশবছর জেলের ভাত খাওন। আমি না আইলে, আমার ভাগ খাওয়াইতে সরকার বদলি পাইব কারে আর?'

জমাদারনি বললে— 'অন্যেরা তাদের স্বামীর কত নিন্দে করে; কারো স্বামী বদ, কারো স্বামী রাগী, কারো স্বামী কুৎসিত— কত রকমই তো শুনি; কিন্তু মিছিরন কোনোদিন ভুলেও ওর স্বামীর নিন্দা করে না। তবে কী আর বলব এদের কথা, ঐ যে, অন্যলোকের সঙ্গে ভাবাভাবি হয়— তাতেই ঘটে শেষে মরণদশা। এই মিছিরনেরও হয়েছিল তাই।'

মিছিরন মুখ টিপে হাসছে।

শান্তি ব'লে উঠল— 'আচ্ছা, যাকে দিয়ে তুমি স্বামীকে খুন করিয়েছিলে তার সঙ্গে তোমার কী রকম ভাব ছিল?'

মিছিরনের নাকের ডগা ফুলে উঠল; ফরসা উঁচু গাল দুটো লাল হয়ে গেল। বোনার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে নরম দৃঢ় স্বরে মিছিরন বললে —'সে কথা তো কইতে পারুম না দিদি।'

হো হো হাসিতে ঘর ভ'রে গেল। শান্তি অপ্রস্তুত হয়ে আমার পিঠে ধাক্কা দিয়ে বলল— 'কী এমন বলেছি আমি— বলুন না? অন্যায় কিছু জিগগেস করেছি? তবে? তবে হাসছেন কেন এত—অ্যাঁ?'

শান্তি মিছিরনকে আবার জিগগেস করল—'আর সেই লোকটার কী সাজা হল?'

'বিশবছরের সাজা হইল তারও বিচারে'— ব'লে মিছিরন বোনাটা মাটিতে রেখে চুলগুলি খুলে হাতের আঙুল দিয়ে ঝেড়ে একটা ঝুঁটি বেঁধে নিয়ে বললে, 'আদত দোষী তো সে-ই। আমি না হয় হুকুম দিইছিলামই— তুই করতে গেলি কেনে এই কাজ? আর আমিও যে হুকুম দিলাম সেও তো তারই চক্রে? তখন কি জানতাম আমার এই অবস্থা হইব? পাঁচ-পাঁচটা ছাওয়াল আমার! তারা অখন বানের জলে ভাইসা বেড়ায় এর তার দুয়ারে; আর আমি তো এইখানে পইচ্যা মরতে আছিই। আমার শাস্তির হইছে কী? আরও কত কপালে আছে কে জানে? ঠিক হইছে, উপযুক্ত বিচার হইছে; সরকার আমার বিশবছরের সাজা দিইছে। এমন সোয়ামি আমার— তারে কিনা মনে ধরল না— পরান নিলাম— তবে ছাড়লাম!'

শান্তি আবার ব'লে উঠল— 'স্বামী ম'রে গেলে তোমার কি খুব কষ্ট হয়েছিল?'

'কি কও দিদি? সে আমার বিয়া-করা সোয়ামি, কষ্ট হইব না?' ব'লে মিছিরন বাঁশের কাঁটা তুলে তড়বড় ক'রে বোনা শুরু ক'রে দিল।

রাধা। রোগা, পাতলা, লম্বা মেয়েটি। করুণ মুখখানি— ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সামনে। ঠাণ্ডা তার ভাবভঙ্গী— নরম, গলার স্বরটি। কথা কয় যেন মধু ঝরে। রাধা বললে—'দেশের কী খবর বলো না? যুদ্ধের অবস্থাই বা কী রকম?'

নন্দিতা বললে—'সে সব গল্প রাত্রে হবে। এখন বরং তোমাদের একটু গান শুনি। কে কে গাইতে পারো তোমরা এখানে?'

সকলে গিয়ে মিছিরনকে জাপটে ধরল। নাচে গানে সে-ই নাকি ওস্তাদ সকলের চেয়ে। আদত গায়েন মিছিরন, অন্যেরা দোহার। চলতে ফিরতে মিছিরন গেয়েই চলে সমানে; আর তেমনি বকুনিও খায় মেট্রন-মার কাছে।

দু-তিনবার মৃদু আপত্তি জানিয়ে সে মেয়েদের নিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরল—

ওরে, কয়লার মতন ময়লা ছোঁড়া
মজিয়ে গেল মন,
এখন দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই
পাগলের মতন।

সকলের হাসি-উচ্ছ্বাসে দেখতে দেখতেই গান জ'মে উঠল; মিছিরনকে টেনে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল। মিছিরন কোমরে হাত দিয়ে, শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে লাগল—

একবাটি কফি রাঁধি তিন বাটি ঝোল,
মাঠের মাঝে পিরিত করলাম—
গাঁয়ে বাঁধল গোল।—

চারিদিকে হাসির ফোয়ারা ছুটল। মিছিরনকে ঘিরে সকলে হাততালি দিয়ে সুর ধরল—

গাঁয়ে বাধল গোল—

ফটকের ঘণ্টি বেজে উঠল। জমাদারনি চাবি হাতে সেদিকে ছুটল। কয়েদিরা টুপ টাপ যে যার জায়গায় বোনার কাঠি নিয়ে ব'সে পড়ল। মুহূর্তে ঘর স্তব্ধ।

মেট্রন এসে ভিতরে ঢুকলেন। ঘরের শান্ত আবহাওয়া দেখে খুশি মনে কালি-কলম নিয়ে দৈনন্দিন কাজের হিসাব খাতায় তুলতে বসলেন।

তেরো

মেট্রন ভদ্রঘরের বিধবা, জাতে বৈদ্য। অভাবের তাড়নায় এই কাজে ঢুকেছেন আটবছর আগে। শ্যামবর্ণ মুখে বেশ একটা শ্রী; কিন্তু তাতে রুক্ষতার ছাপ। বোধ হয়, সারাক্ষণ কয়েদিদের সঙ্গে চেঁচামেচি করার দরুন। কাঁচাপাকা চুলভরা মাথা, তালুতে সর্বদা খানিকটা ভিজে শিমুল তুলোয় মাখন দিয়ে লাগিয়ে রাখেন; মাথা ঠাণ্ডা থাকবে। না হ'লে মাথা ঘুরে প'ড়ে যান;

এমন কতদিন হয়েছে। কিন্তু, এতে যে বেশি উপকার দেয়— মানে মাথা ঠাণ্ডা থাকে— তা মনে হয় না তাঁর রকম সকম দেখে।

মেট্রনের নিচে আছে দু-জন জমাদারনি। পালা ক'রে সকাল-সন্ধে কাজ করে; তাদের নিচে আছে 'মিটিন' রূপজান বিবি। জেলখানায় বন্দী অবস্থায় এই-ই পদোন্নতি কয়েদিদের। আট-দশ বছর জেল খাটবার পর কয়েদি বুঝে এই পদে বহাল হয়। 'মিটিন' হলে সাধারণ কয়েদিদের খাটুনি তাকে খাটতে হয় না। খাটুনি যারা খাটে, তাদের সে খাটায়; আর রাত্রে ঘরের ভিতরে পাহারা দেয়। রূপজান বিবি দেখতে লম্বা-চওড়া, ফরসা গায়ের রঙ। গোলমুখে ভুরু দুটি কপালের মাঝে উঠে হঠাৎ একটা পাক খেয়ে চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নেমে পড়েছে। সেই কালো ভুরুর নিচে কালো চোখ দুটো যখন হাসিতে পিটপিট করে— ভারি ভালো লাগে।

কেমন একটা আভিজাত্য-ভরা গাম্ভীর্য আছে তার চলায় বলায়। জমিদার ঘরের গিন্নি নাকি সে। পুষ্যিপুত্তুরকে বিষ খাওয়াবার দায়ে বিশবছরের জেল খাটছে।

রূপজান বললে— 'কী করব? আমার নসিব। নয়তো, আমার বারো বছর বয়সে সোয়ামি আমার হাতে এনে তুলে দিল দুই ভাসুরপুতকে; একটি হাঁটতে পারে, আর একটি সাত মাসের কোলের শিশু। বুকের দুধ ছাড়বারও সময় হয় নি তখন। ভাসুর মারা যেতে জা অন্য জায়গায় নিকা বসল। সেই অবধি দুই ছেলে আমার হাতে মানুষ। তারপর আমারও পর পর চারটি সন্তান হল। পুষ্যিপুত্তুররা বড়ো হল। তাদের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনমু। দুই ছেলের ঘরে দুই মেয়ে হল। একটির মেয়ে দেড় বছরের, ছোটো ছেলের মেয়ে তিন মাসের। এমন সময়ে চাচার সঙ্গে বিবাদ ক'রে একদিন তারা আলাদা বাড়িতে ভিন্ন হয়ে গেল। আমি থাকতে পারি না— মাঝে মাঝে যাই, দেখে শুনে আসি; তারাও আসে, আমাকে দেখে শুনে যায়। এই একটু ফারাকেই তাদের ঘর। একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বড়ো বউ ও ছোটো ছেলেটার ভেদবমি শুরু হ'ল; শুনে আমি দৌড়ে গেনু। ডাক্তার কবিরাজ আনানু— কত ওষুধ খাওয়ানু— বউটা ভালো হয়ে উঠল; আর সাঁঝের দিকে আমার ভাসুরপুতটা মারা গেল।

'সারারাত সেখানে কাটিয়ে ছেলেকে স্নান করিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে

তুলে দিয়ে ঘরে চ'লে এনু। ঘরে এসে সটান বিছানায় ঢুকনু। নিজের পেটের ছেলের চেয়েও বেশি ছিল তারা ; আমার ছেলেদের তো পরে পেয়েছি। —তারাই তো আগে এসেছিল আমার কাছে। তা বিছানায় তো আমি প'ড়ে আছি— উঠিও না, খাইও না।

'দু'দিনের দিন পুলিশ দারোগা এসে আমাকে আর আমার সোয়ামিকে ধ'রে থানায় নিয়ে গেল। গাঁয়ে দু-ঘর শত্রু ছিল ; তারা সাক্ষী দিল— তরকারির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে আমি নাকি তাদের খাইয়েছি। আর কী! বিশ বছর হয়ে গেল। এই তো— এই শীতে নয় বছর শেষ হবে জেলে ঢুকেছি। নসিবে না থাকলে কি এমন হয়? আর জন্মে কিছু পাপ করেছি— এ জন্মে তার শাস্তি ভোগ করছি।'

বললুম— 'আপিল কর নি কেন?'

'করি নাই আবার? জলের মতো টাকা খরচ হয়েছে। মাটির নিচে টাকা পুঁতে রেখেছিনু। খেতের ধানচালের টাকা সোয়ামি নিত ; ছাগল ভেড়া বেচে যা পেতাম তা আমিই নিতাম। দলে দলে ছাগল-ভেড়া-গোরুতে আমার গোয়ালঘর ঠাসা। একবার তো হাজত থেকে হাজার টাকা জামিনে ঘরেও গিয়েছিনু তিন মাসের জন্য ; কিন্তু যা হবার নয় তা কী করে হবে আর?

'কোলের একবছরের মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে জেল খাটতে এসেছিনু, মেয়েটা ছয়বছরের হ'তে— তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিনু, তার বাপ এসে নিয়ে গেল। আমার ছেলেমেয়েরা যে কে কী ভাবে আছে— কে জানে? না— আমার ছেলেমেয়ে আর বলব না। দশজনের ছেলেমেয়ে ওরা— দশজনই তো ওদের দেখছে শুনছে। ভালো থাক্, বেঁচে থাক্ ওরা ; নাই বা আমি দেখনু তাদের।' বলতে বলতে রূপজান ছলছল চোখে জানালার পাশে গিয়ে বসল।

আমি তাড়াতাড়ি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশাস্ত্র খুলে ধরলুম—

…ঘনঘটা ঘনিয়ে এলো— পূবে বাদল উঠলো— রিম্‌ঝিম্ বরিষ নামলো ; সামাল ভাই ক্ষেতের আল, ঐ যে জল বয়ে চললো। দুটি লতা— অনুরাগের, বিরাগের— তাদের আজ এই রসের বৃষ্টিধারায় ভিজিয়ে নাও, এমন ক্ষেত লাগাও যেখানে অবাধ মুক্তির ফসল ফলে, ক্ষেতের ফসল কেটে ঘরে তুলতে পারে, তাকেই তো বলি কুশল কিষাণ।…

—'তুমি ঠিক কর নি—এ তোমার উচিত হয় নি—অতটুকু ছেলেকে ফেলে জেলে আসা—।'

চমকে উঠলুম। দেখি জানালার পাশ থেকে রূপজান আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে; বললে—'বুঝি আমি, সবই বুঝি; কোন্ কাজে যে এসেছ, তাও বুঝি; কিন্তু দেখ, বেড়াল কি কেনা মাছ বোঝে? পয়সা দিয়ে কিনে মাছটা রেখেছ—বেড়াল অমনি মুখে নিয়ে পালাবে; যার যা স্বভাব। তোমার ছেলের প্রাণটা তো তোমার জন্যই কাঁদবে; তুমি কেন এখানে এসেছ; সে তো তা বুঝবে না।'

কী উত্তর দিই আর এর?

দৃষ্টি নামিয়ে নিলুম বইয়ের পাতায়; গুন গুন ক'রে পড়তে লাগলুম একই লাইন বারে বারে—

স্বরত নিরত কা বেল নহায়ন
কবৈ খেত নির্বাণী।

চোদ্দ

"বিশ্বজোড়া রূপ মাধুরী সাগরে টলমল করছে; বাতাসে মাধুরী, সাগর জলে মাধুরী, আকাশে মাধুরী, ধরিত্রী মাধুরী বহন করছে, অরণ্যে মাধুরী, পথের ধূলা—তাতেও মাধুরী……"

জানালার ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি—কোথায় মাধুরী?—রূপ সবারই চোখে পড়ে, কিন্তু রূপের মাধুরী তো সবার কাছে ধরা দেয় না!

আকাশে দলে দলে মেঘ চলে যায়, বলে, দেখ, দেখ; ঝিরঝিরে পাকুড় পাতা হাওয়ায় নড়ে ওঠে, বলে, শোন, শোন; হালকা শরীর নিয়ে দুটো খঞ্জনী লেবুতলায় নেচে বেড়ায়, বলে, খুশি হও, খুশি হতে শেখো। থামের মাথা থেকে পায়রা নেমে এসে সামনে, বুকের পালক ফুলিয়ে, হেসে দুলে বুক ঠুক্‌রে বলে, বোকা, বোকা—বোকা তুমি; ভাবো কেন এত?

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরে ফিরে বসি। খাটুনি শেষের ঘণ্টা পড়ে। কয়েদিরা ছাড়া পেয়ে দল করে এসে ভিড় জমায় আমার জানালার সামনে।

অদম্য কৌতূহল তাদের, খাতার পাতায় কালো কালিতে কী লেখা সব? বলি—তোমরা যে আমায় থেকে থেকে অবাক করে দাও, সেই কথাই লিখি বসে।

শুনে— এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে। অবাক হয়ে যাই এদের এক-একজনের কথা শুনে।

ছোট্ট জামিনা— কচি মেয়ে; মাত্র চারবছর জেল খাটা হয়েছে— কুড়ি বছরের মধ্যে। কপালের উপরে ভুরু অবধি নামিয়ে পাতা কেটে চুল বেঁধে দেয় সখি নেছামন। মুখে হাসি তার লেগেই আছে— সুন্দর সরল মুখখানায় কোনো কালিমা নেই। মনে—? মনেও বোধ হয় নেই, তা হলে ছাপ পড়ত বাইরে; কিন্তু যতদিনে জামিনা খালাস পাবে, ততদিনে এর রূপের লাবণ্য, হাসির ছটার কিছু কি অবশিষ্ট থাকবে?

নেছামন জামিনার থুতি নেড়ে বললে— 'জানো, রঙ্গীর কীর্তি? রাত্তির বেলা সোয়ামির গলায় কোপ না বসাইয়াই দুয়ার খুইলা উঠানে ছুইটা আসছে। আইসা শেষে মুখপুড়ির ভাবনা হইছে, লোকটা মরল তো ঠিকই? দেখতে আবার ঘরে ঢুকল; দেখে— সোয়ামির ধড়টা বিছানায়, আর মুণ্ডুটা মাইঝাত্। তখন না নিশ্চিন্ত হইয়া জামিনা বাপের বাড়ি ছুট্ দিল।'

নেছামন দুই ছেলে, এক মেয়ের মা। ছেলে দুটিকে বাড়িতে রেখে, কোলের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে জেলে— আজ তিন বছর। স্বামী বলেছিল —তাকে তালাক দেবে। দেওরের সঙ্গে পরামর্শ করে, বশ করবার ওষুধ এনে স্বামীকে খাওয়াল পানের খিলির ভিতরে দিয়ে; দেখতে দেখতে তিনঘণ্টার মধ্যে ভেদবমি করে মরে গেল লোকটা।

লম্বা ছিমছাম, দেখতে নেছামন। প্রত্যেক কথায় ধাক্কা দিয়ে 'র' ও 'ড়'-এর উপরে জোর দিয়ে, দুঠোঁট উঁচিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনবরত কথা কয় সে। বেশ আদুরে আদুরে ভাবভঙ্গি!

বললুম—'বিষ খাইয়েছিলে, স্বামী মারতে তা হলে? নেছা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে— 'আরে-দূ-র্-র্-র্। মাইরবার ইচ্ছা থাকলে তো কাইটা কুইটাই শ্যাষ্ কইরা দিতে পাইরতাম, ওষুধ খাওয়াইতে যাইমু ক্যানে? দেওরটার মনে কি আছিল ওই জানে। এইবারে গিয়া ও-র্-র্-রে আমি শেষ করমু।— যাই আগে বাড়িতে খালাস পাইয়া' বলে হেসে তেলচিরুনি এনে— মেয়েটা আঁচল

ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে মুখ খিঁচিয়ে 'সইর‍্যা যা দুশমনের বিটিটা'— ব'লে এক ধাক্কা মেরে, জামিনাকে টেনে নিয়ে বসল চুল বেঁধে দিতে।

বারান্দার ওদিকেও বসে গেছে চুল বাঁধতে কয়েক জোড়া সখী। সখিত্বের এইটুকু পরিচয়ই এরা দিতে পারে একে অন্যকে। কয়েক মিনিট সময় পায় দিনের শেষে; এরই মধ্যে টিপেটুপে চুল বেঁধে হাত মুখ মুছে পরিপাটি হয়ে বিকেল শেষ না হ'তে ঘরে ঢোকে। দরজায় তালা পড়ে।

আমিও উঠে পড়লুম। মনটা কেমন যেন হয়ে পড়ে থেকে থেকে। এদের অনেককেই বুঝতে পারি নে। এত তো চেষ্টা করি। কী জানি কী-একটা রহস্য কোথায় যেন আছে। সেদিন সুরাতনকে জিগগেস করলুম, সেও অল্প-বয়সের মেয়ে, যখন এসেছিল এখানে; এখন যুবতী। স্বামীর বাড়া-ভাতে শাদা বিষের গুঁড়ো নিজের হাতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। স্বামীর দোষ ছিল না কিছুই। সুরাতনই কেন জানি সইতে পারত না তাকে। কারণ সেও জানে না নিজে।

বলে— 'কী জানি, তারে দেখলেই যেন আমি জইলা উঠতাম। বারান্দার এই পাশে আমি আর ঐ পাশে যদি আমার স্বামী আইল— কি কমু, এই তোমার হাত ধইরা কইতেছি, এতটুকু মিথ্যা নাই এতে— তাতেই যেন আমার সর্বশরীরে একটা জালা ধরত। ছুইটা পলাইয়া যাইতাম, থরথর কইরা কাঁপতাম। একবার গাঙের জলে ঝাঁপাইয়াও পড়ছিলাম যে— এই পরান আর রাখুম না। কিন্তু সেই পরানই রইল— আর তার পরানটাই গেল। স্বামী আমার বড়ো ভালো লোক ছিল, দেখতে কী সুন্দরই ছিল!— এমন চোখে পড়ে না সচরাচর। গাঁয়ের লোক কইত— "এমন সোয়ামির ঘর —ভাগ্যে হয়, আর তর মনে ধরে না?" ধরলই তো না; নয়তো নিজের হাতে বিষ খাওয়াইলাম কী কইরা?—চক্ষের সামনে দাপাইয়া দাপাইয়া মরল। মরবার আগে আমার হাত ধইরা কইল— "তোমার মনে এই আছিল শেষটায়?"—কইতে কইতেই পরানটা বাহির হইয়া গেল; তখনও আমার হাতটা তার হাতে ধরা।'

—তবুও তোমার মনে এতটুকু কষ্ট হল না?

সুরাতন চুপ করে খানিক ভাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল— 'কই, না —হয় নাই তো কষ্ট একটুও।'

—এখন ? এখনও কি তোমার মনে লাগে না যে, একটা লোককে তুমি নিজের হাতে এত কষ্ট দিয়ে মারলে ?

—'খোদার নাম নিয়া কই আমি বিশ্বাস কর— মনে হয় বাঁইচা গেছি। যত দুঃখই পাই— ফিরা গিয়া তো আর সেই স্বামীর ঘর করতে হইব না আমার।'

—থাকবে কোথায় গিয়ে ?

'ক্যান— বাজানের কাছে। আমার শুধু বুকটা কড়কড় করে এই ভাইব্যা, —যদি আমি জামিনে তখন বাড়ি না যাইতাম, তবে আমার বাজানের অতগুলি টাকা খরচ হইত না। ছোটো ছোটো ভাইবোনগো নিয়া বাজানের কত কষ্ট! তার উপরে আমার লেইগা মামলা মোকদ্দমায় কত টাকা তাঁর খরচ হইয়া গেছে। আমার এই মুখ আমি তাঁরে দেখামু কী কইরা—' বলে সুরাতন মুখ নিচু ক'রে আঁচলের খুঁটে চোখ মুছল। আশ্চর্য।

সন্ধে হয়ে এল। ঝাঁকে ঝাঁকে শালিক এসে আশ্রয় নিল উঠোনের আমকাঁঠাল গাছে। তাদের কলরবে কান পাতা দায়। নন্দিতা, এলা গান ধরেছিল, থামিয়ে দিতে হল।

কয়েদিরাও ঘরে ঢুকল জোড়া জোড়া হয়ে। সেই কোন্ সকালে অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে যায় তারা— এমনি জোড়া জোড়া লাইন করে, আর ঢোকে এসে দিনান্তে শালিকদেরই মতো কলরব করতে করতে। গোটা দিনে রাতে এই সময়েই ঘণ্টাখানেক ফুরসৎ পায়— হাসি গল্প গানে সময় কাটাতে। ক্লান্তি ভুলে যায় সমস্ত দিনের। মুহূর্ত আর নষ্ট করে না নীরব থেকে। যার যার কম্বলের উপর গামছা পেতে বিছানা তৈরি ক'রে ব'সে যায় দলে দলে।

বাইরে ঘন অন্ধকার— অমাবস্যা কাছাকাছি। ঘরের এক কোনায় জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। ও-কোনায় কয়েকজন গান ধরেছে—'ঘরের বউ বিলাপ করে কাঁদছে ; সে গামছা কাঁধে, তেলের বাটি হাতে স্নান করতে এসেছিল মাখন রাজার ঘাটে ; এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুব— সদাগরের পানসি এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে— ভরা পাল তুলে দিয়ে। পানসি থেকে বউ দেখে, — স্বামী ঘাটে এসে, কেঁদে কেঁদে ডাকছে— ফিরে এস বউ—ফিরে এস ঘরে। স্বামীর কথা শুনে বউ মাঝিদের অনুনয় বিনয় করে—

আগে লায়ে উমুর ঝমুর রে—
পাছে লায়ে আমি ;
ধীরে ধীরে বইঠা বাওরে—
আমি স্বামীর কান্দন শুনি—।

কিন্তু কেউ শুনল না কথা। পানসি বয়ে চলল তর্ তর্ করে। নিরুপায় বউ তখন কেঁদে কেঁদে ডেকে স্বামীকে সান্ত্বনা দিলে—

না কাইন্দ না কাইন্দ পতি তোমার
চিত্তে আছে হিয়া—
বাটাভরা টাকা আছেরে— তুমি
কইরো দোস্‌রা— বিয়া— রে—
কেনে আমি লাইতে আইলাম— রে
মাখন রাজার ঘাটে রে— ।

রূপজান ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বলল—'আমাকে একটা পঞ্জিকা আনিয়ে দাও না।'

বুঝতে পারলুম ন', পঞ্জিকা দিয়ে কী করবে সে।

রূপজান গলা খাটো করে বলল— ছেলেগুলোর খবর পাই না —কতদিন হয়ে গেল ; বাছারা ভালোয় ভালোয় থাকুক। এইতো খেতে ফসল পাকতে শুরু হয়েছে — দেবতারা এই সময়ে বের হন ; ঘুরে ঘুরে দেখেন সব। এখন, সময় বুঝে ডাকতে পারলে খুব কাজ দেয়। পঞ্জিকাটা হাতেব কাছে পেলে— সময় দেখে নিতে পারি মিলনী-মাকে দিয়ে। জানি আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু— কিন্তু জেলখানায়— এই এত অনাচার— কিছুই করা যায় না।

বললুম, 'আচ্ছা, আনিয়ে দেব পঞ্জিকা, তুমি সময় দেখে নিয়ো।'

চারদিকে একবার মাথা ঘুরিয়ে, কাছাকাছি কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে রূপজান বললে—'দেখ, সব কথা সবাইকে বলতে নাই। তা তোমাকে বলছি ; বোলো না যাকে তাকে। সবাই কি আর বুঝতে পারে ? এই দেখ, আমার কপালে সিন্দুরের দাগ, আগের জন্মে আমি বামুনের মেয়ে, বউ ছিলাম। চোখের সামনে একটা গরু গলায় দড়ি আটকে মরল— সেই পাপে আমি এ জন্মে মুসলমান হয়েছি।'— এই বলে সে কপালের ভাঁজফেলা চামড়া টান করে মেলে ধরল। লক্ষ্য করে দেখি— ঠিকই, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের

টিপের মতো একটি শাদা টিপ।—সে জায়গাটুকু মুখের রঙের চেয়ে একটু যেন বেশি ফরসা।

রূপজান বললে, 'জনম হয়ে অবধি এ জিনিসটা লুকানো থাকে নি কারো কাছে।'

'তুমি জানলে কী করে আর জন্মের পাপের কথা?'

'ওমা, তা জানব না? আমার আর জন্মের সোয়ামি যে এখনও বেঁচে। তিনি সাধু হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নানা তীর্থস্থানে। তাঁর যে মরণ নাই, মরণকে জয় করে সিদ্ধিলাভ করেছেন; তবে নিজের ইচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারেন। আমার সেই জন্মের মেয়ের সঙ্গে এই জন্মে দেখা হয়েছিল, তার কাছেই তো সব শুনলাম; নয় তো আমার এমন কি পুণ্যির জোর? তা হলে কি আর নীচজাতি হয়ে জন্মাই বামুনের ঘরের মেয়ে হয়ে? সেই মেয়ে কিন্তু আমার— এই জন্মেও বামুনের ঘরে জন্মেছে। ধর্মে কর্মে খুব মন; সেই জোরেই সে তার বাপকে এ জন্মেও খুঁজে বের করেছে। গেরুয়া পরে থাকে; সংসারে থেকেও যোগিনী। শাশুড়ি স্বামী সব আছে তার। একবার সেই মেয়ের কঠিন রোগ হয়— কিছুতেই সারে না; কত চিকিৎসা, কত ডাক্তার কবিরাজ— কিন্তু কিছুই ফল হল না। শেষে সে তারকেশ্বরে ধন্না দিয়ে পড়ল। তিন-দিনের দিন আদেশ এল— "যা— তোর আগের জন্মের মা— অমুক গ্রামে, অমুক নামে, এ জন্মে জন্মেছে মুসলমান হয়ে; তার ঝুটা খা গিয়ে, তবে ভালো হবি।" মেয়ে তো রাজি হয় না; বলে— "সব করতে পারি, কিন্তু বামুনের মেয়ে হয়ে যবনের ঝুটা খাই কী করে?" তিন-তিনবার ধন্না দিল— তিন-তিনবারই ঐ আদেশ পেল। কী আর করে— শেষে খুঁজে খুঁজে এল আমার কাছে; আমার ঝুটা খেয়ে তবে সে ভালো হয়। তার কাছেই তো সব জানতে পারলাম। আমি কি বিশ্বাস করি সহজে? সে বলল— "দেখ্ মা, তোর মাথার ডান দিকের কানের পাশে চুলের ভিতরে একটা দাগ আছে; জানিস্ তা কী? তুই যখন জন্ম নিলি মুসলমানের ঘরে, আমার বাপ এসে তোকে থাপ্পড় মেরেছিল— ওটা সেই ঘা।" ঠিকই, এই দেখো, সেই দাগ'; ব'লে চুল সরিয়ে সরিয়ে রূপজান আমাকে দেখাতে লাগল। বলল— 'সত্যিই এটা ঘটেছিল— গল্পও শুনেছি মার মুখে। আমি তখন আঁতুড়ঘরে— মা আমাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন— সন্ধে হয় হয়; এমন সময় কী যে হল ঘরের

মধ্যে— কে যেন এসে জোরে একটা থাপ্পড় মারল— চটাস্ করে শব্দ হল, কিন্তু কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। পরে দেখেন— আমার কানের পাশ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত বেয়ে পড়ছে। নেহাৎ মার কোলে ছিলাম— তাই কিছু করতে পারে নি; নয়তো সেদিনই আমাকে ও নিয়ে চ'লে যেত।'

মনে পড়ে, শিউড়িতে ইন্দুমতীও একদিন ভরদুপুরে কথায় কথায় বলেছিল যে, দেবী মহেশ্বরী মাঝে মাঝে তার উপরে ভর করেন। সে তখন মহেশ্বরীরই এক অঙ্গ হয়ে যায়। দেশে-গাঁয়ে কত পুজো করে লোকজনেরা। তার ভিতর দিয়ে দেবী কত মহিমা তাঁর প্রচার করেন— ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্য-মিথ্যা বিচার করি না। এতখানি বিশ্বাসের সঙ্গে এত প্রাণ ঢেলে বলে এ-সব কথা, কানে মধুর লাগে— গল্পে মোহ এনে দেয়। দরকার কি এটুকুই বাদ দিয়ে, শুকনো মনে খট্‌খট্‌ করে সত্যিমিথ্যার তর্ক তোলার। আর ধরতে গেলে, সত্যি বলে কী-ই বা আছে এ-সংসারে? গুরুদেব বলতেন— আজ যেটাকে অতি সত্যি ব'লে মনে করি, দুদিন পরে দেখি, তার মতো মিথ্যে আর কিছুই নয়। ছায়ার ছায়া হয়েও তো সে থাকে না। অথচ এই 'না'-টাকেই— এই মিথ্যেকেই আমরা সত্যি বলি; এ কত বড়ো ইন্দ্রজাল বলো দেখি নি।

ঘরের ভিতর হাসির রোল উঠল— হি-হি-হি-হি; হো-হো-হো-হো; রূপজান ছুটে গেল। মিটিন সে; গোলমাল হলে তাকেই দায়ী হতে হয় সকলের আগে; কিন্তু রূপজানের কথা কে শোনে? হেসেই চলেছে সব লুটিয়ে লুটিয়ে। ব্যাপার কী?— কাছে গিয়ে দেখি— মিছিরনকে ঘিরে মেয়ের দল হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। মিছিরন পুরুষ-সাজে সেজেছে; পাজামার বদলে একটা লম্বা হাতওয়ালা কুর্তায় দু-পা ঢুকিয়েছে— গায়ে আর-একটা কুর্তা চাপিয়েছে; মাথায় গামছা জড়িয়ে পাগড়ি বেঁধেছে— বগলে জমাদারনির লাঠি চেপে ধরে মুচকে হেসে মেয়েদের দিকে মিটির মিটির চাইছে— আর মেয়েরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

রূপজানও মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চাপল। বলল— 'কী হচ্ছে এ-সব? বাঁদরামির জায়গা নাকি এটা? চোপ্ চোপ্ কর সব— এক্ষুনি।' কিন্তু মিছিরনের এমন সাজ মাঠে মারা যাবে— বেহুলা পালার বিনোদ ওঝার নাচ-গান না করেই?

মরিয়াম তাড়াতাড়ি কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে মৃত লক্ষীন্দর হয়ে। পায়ের কাছে বান্নু বেহুলা। কান্না জুড়ে দিল—

আমি বিয়া রাত্রে হইলাম রাঢ়ীরে—

এ-এ-এ—

বেহুলার কান্নাতে বাদবাকিরাও যোগ দিল—

এ-এ-এ—।

কী করে লক্ষীন্দরকে বাঁচানো যায়? বিষ তো নামবার নয়। কেউ জানে না এ বিষ নামে কিসে? তবে হ্যাঁ, আছে এক বিনোদ ওঝা, সে যদি আসে— তাকে যদি আনতে পার তবে— বেহুলা, তোমার পতিকে ফিরে পেতে পারো। শুনে বেহুলা কাঁদতে কাঁদতে ডাকল—

ও বিনোদ, তোর হাতে ধরি পায়ে ধরি রে—

এ—এ--এ—

পতিরক্ষা কর রে বিনোদ—

এ—এ—এ—।

বিনোদবেশে মিছিরন এবার ঘরের কোনা থেকে ভুঁড়ি ফুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে এল—

বিনোদ বিনোদ বলি ডাকল মোরে কে রে?

বিনোদ বিনোদ বলি—।

কে ডাকল?— কেনে ডাকল?—

বেহুলা ওঝার পায়ে আছাড়ি বিছাড়ি। চলল দর কষাকষি। বিনোদ বলে, লক্ষীন্দরের বিষ ঝাড়তে পারলে পাঁচঘড়া মোহর চাই।

বেহুলা রাজি।

বিনোদ বলে— মাথায় সোনার মুকুট চাই।

বেহুলা তাতেও রাজি।

তবুও বিনোদের মন ওঠে না। সারা অঙ্গের গহনা কড়ার করালে। শেষে বিনাসুতার মালা পরাবে বেহুলা বিনোদের গলায়— এই শর্তে ওঝা লেগে গেল এবারে বিষ ঝাড়তে।

সে কী বিষ— আর কী তার ঝাড়া। বিষঝাড়ার তালে তালে বিনোদ নাচে, গানে, ভাবে ভঙ্গিতে মাত করে দিল চারদিক। কিন্তু বিষ আর নামতে

চায় না। অত যে বড়ো ওঝা বিনোদ, তাকে পর্যন্ত হিমসিম খাইয়ে দিল। বিষ একবার করে পায়ে নেমে আসছে, আবার গিয়ে চট করে কোমরে উঠে যাচ্ছে—। কোমর থেকে নামিয়ে হাঁটুতে আনে— আবার বিষ মাথায় উঠে যায়— বিনোদ হয়রান—

হাঁটুতে আছিল বিষ— মাথাতে উঠিল রে
কুন কুন কান্নুলের বিষ উজান ভাঁটান যায়রে—
কুন কান্নুলের বিষ—

বিষের উজান-ভাঁটার বিরাম নেই। বিনোদ আর পারে না— ঠেকে গেল বুঝি-বা। বলে—

বারো রুগি ঝাইরা আইসা—
তেরো রুগিতে ঠেকলাম রে—
এমন কারো হয় না—।

কিন্তু এ বিষ নামাতে না পারলে মান থাকে না ওঝার। শেষে অতি কষ্টে, বিনোদের কোমরে তখন খিল ধরল, হাসতে হাসতে সকলের পেটে ব্যথা জাগল, বেহুলার কান্না শুকিয়ে গেল, তখন নামল বিষ লক্ষীন্দরের অঙ্গ থেকে।

বিষ নামতে লক্ষীন্দর বেঁচে উঠেই কপালের চুলগুলি সরিয়ে দু-হাতে দুমা-দুম কিল লাগাল মিছিরনের পিঠে। 'বাপরে— কতক্ষণ আমারে শোওয়াইয়া রাখছিলি তুই— আরে ছিঃ— অমন জানলে কি আর আমি লক্ষীন্দর অই। বিষ ঝাড়তে গিয়া গামছার বাড়ি মাইর‍্যা মাইর‍্যা আমারে শ্যাষ করছে— এক্কেরে—।'

মিটিন বলল, 'ব্যস, অনেক হয়েছে; এবারে তোমরা যার যার জায়গায় যাও, চুপ করে শুয়ে পড়ো।'

কিন্তু ঝোঁক চেপে গেছে সবার, এত সহজে কি ঠাণ্ডা হয় তারা? বেহুলার পালায় নেচেছে শুধু বিনোদ— আর হেসেছে সবাই। এবারে নাচবেও সবাই, হাসবেও সবাই। তুমুল নাচ শুরু ক'রে দিল মেয়ের দল মিছিরনকে ঘিরে।

রূপজান 'বন্ধু'র আর 'পিরিত'-এর গান শুনলে রেগে যায়। মিছিরন দলবল নিয়ে সেই গানই ধরল—

কলিকাতার রেশমি চুড়ি পয়সা পয়সা দাম
সেই চুড়িতে লেখা আছে আমার চ্যাংড়া বন্ধুর নাম।

বাসুর বুড়িমা— ঠেলা মেরে মিছিরনকে সাবধান করে দিল। মিছিরন বাঁকা কোমর আরো বেঁকিয়ে গেয়ে উঠল—

একবার মারলি দুইবার মারলি কাঁচা কঞ্চিতে
এইবার মারলে নালিশ করমু আমি বাবুর বাংলাতে।

রূপজান আর সামলাতে পারল না। রাগে গরগর করতে করতে— এক-পাশে গামছা পেতে বসল— নমাজ পড়বে। নমাজের সময় কেউ গোলমাল করলেই মেট্রনকে ব'লে কেস করাবে।

কেস করার নাম শুনে মুহূর্তে সকলে থেমে গেল। মিছিরনের মুখ শুকিয়ে এল। ভালোভাবে কাজ করলে তিনমাস অন্তর চারদিন ছয়দিন 'মাপি' পায়, 'কেস' করলে তা কাটা যায়। মিছিরন মিটিনের দু-পা জড়িয়ে ধরল— 'আর কখনও না, এই লে মা— কান মলছি, নাক মলছি— আর যদি আমি বন্ধুর গান গাই।'

মিটিন বলল, 'আচ্ছা, তবে মাপ করমু— পা ছাড়।'

মিছিরন পা ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে রূপজানকে কোলে টেনে নিয়ে চোখ বুজে ভুরু কুঁচকে গান ধরল— মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি, বিদায়কালে মার শোক উথলে উঠছে— ; কোলের মধ্যে রূপজানকে জড়িয়ে তার থুতি নেড়ে মিছিরন গাইছে—

ময়নারে— তুমি-ই-ও খোপের কইবুতর
আর কারো বা খোপে যাইবা রে—
আরে, ময়নারে— তুমি-ই-ও শাড়ি পরিয়া— ।

'বন্ধু' না 'পিরিত' না— মিটিন আর বাধা দেয় কী করে? সলজ্জ হাসি হেসে মুখ নিচু ক'রে সে মিছিরনের কোলে বন্দী হয়ে রইল। উপায় কী?— মিছিরনের আবেগ শেষ হবে ; তবে তো— ।

পনেরো

রবিবার। জেল কোড অনুসারে আজ কয়েদিদের ছুটি। তাই রোজকার মতো তারা অন্ধকার থাকতে উঠে, কম্বল দুখানা ভাঁজ করে লেবু তলায় রেখে দুড়দাড় করে যে যার কাজে লেগে গেছে, নয়তো সারাদিনে কাজ সেরে ওঠা ভার। একদল করছে 'নম্বর' পরিষ্কার— টিন, টিন জল ঢেলে; একদল চালাচ্ছে বাঁশের ঝাঁটা খরর্-খর্। কোথাও একটি শুকনো কুটো পাতা পড়ে থাকতে পায় না। একদল খুঁড়ছে খুরপি দিয়ে গাঁদা, বেল, দোপাটির গোড়া; একদল নিকোচ্ছে গোবরজলে আনাচে কানাচের স্যাঁৎসেতে ভিজে মাটি, রোদের অভাবে ঘাস গজাতে পায় না যেখানে।

এ-সব কাজ সারা হলে পরে আসে কাপড় কাচবার পালা। আমগাছের তলায় ভাটি চেপেছে সাজিমাটি-গোলা জলে। মিটিন হাতের কঞ্চি দিয়ে উনুনে শুকনো আমপাতা কাঁঠালপাতা ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। সপ্তাহ-ভর সে এই পাতা গুনে গুনে জমিয়ে রাখে। বলে— 'সব-কিছুর হিসাব দিতে হয় এখানে; ভাটির জন্য একটুকরা কাঠ কি বেশি পাঠায় জেনানা ফাটকে? যা দেয় তাতে কী হয়? এতগুলি লোকের কাপড় সিদ্ধ করা কি চাট্টিখানি কথা? এই পাতা কয়টা না জমালে ভাটির জল গরমই হ'ত না ঐ কাঠের কুঁচি কয়-খানাতে।

ভাটির জল গরম হতেই কয়েদিরা যে-যার গামছা দিয়ে বুক-কোমর কোনোমতে জড়িয়ে পরনের শাড়ি কুর্তা ভাটিতে ফেলে দিল। দুখানা মাত্র শাড়ি। একখানাই বারে বারে পরে, অন্যখানা যত্নে তুলে রাখে। বড়ো সাহেব, ম্যাজিস্টর সাহেব এলে সেখানা পরে লাইনে বসে;— তাঁরা দেখে খুশি হয়ে যান— কয়েদিদের জেলে কেমন ফিট ফাট রাখা হয়।

ধোয়া, মোছা, ঝাড়া হবার পর চারিদিকে চুন লাগানো হল। এবার সবাই ভাটি থেকে কাপড় তুলে নিয়ে চৌবাচ্চার ধারে কাচতে গেল। সে এক পর্ব। লাইনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল কাপড় আছড়াতে। সেই আছাড়ের চোটেই ময়লা যেটুকু ছাড়ে, নামমাত্র সাজিমাটিতে নিশ্চয়ই নয়। জেলখানার মোটা কাপড় জলে ভিজে ভারি হয়, তুলে আছাড় দিতে শরীরে জোর লাগে। সখীরা

ভাগাভাগি করে শাড়ির দু-আচলা দুজনে ধরে ফটাফট তালে তালে তোলে আর ফেলে।

নেছামন জামিনার শাড়িটা তুলতে তুলতে বললে— 'ঐ না বলে—

"আশা কইরা আছিলাম— খাইমু চিড়া দই
বিধাতা কপালে লেখি দিইছে ধান সিদ্ধ খৈ।"

রাত পোহায় না তো— মরণ দশায় ধরে। কিসের-র্ রবিবার? সরকার আমাগো ছুটি দিবার লাগিই আইন্যা পুরছে কি না? নে নে ধর্ তাড়াতাড়ি, বেলা বাইড়্যা গেল, কাপড় শুকাইব কখন? আর-একটু পরেই তো গাছের তলার ছায়া পড়তে থাকব—।'

নেপালি মেয়ে গঙ্গামাঈ— তার খোকা দাজু। এতক্ষণ সে আমতলায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছিল। বোধ হয় ঠাণ্ডা লাগে, না— কি— হাতে-পায়ে ভর দিয়ে, শরীরটা যতখানি পারে উপরে তুলে হামাগুড়ি দেয়— ঠিক যেন ঘেসো কচ্ছপের বাচ্চা। গঙ্গামাঈ দাজুকে পিঠে বেঁধে— হাতে কাপড় নিয়ে চলল কাচতে। কলতলায় ভিড়, জায়গা পাওয়া ভার কিন্তু আর অপেক্ষা করাও যায় না। সব কিছুরই বাঁধা-ধরা সময়; ব্যতিক্রম হলেই অনর্থ ঘটে।

কাদম্বিনী— সবাই তাকে বলে কদমমণি। সে এসে তাড়া লাগাল খেয়ে নিতে। জেনানা ফাটকের ভিতরেই রান্নার ব্যবস্থা। কদমমণি রান্না করে আমাদের জন্য। রোগা লিকলিকে চেহারা— বড়ো বড়ো চোখ দুটো গর্তে ঢোকা, গাল ব'সে গেছে অনেকদিন; টিকে আছে শুধু মুখের উপরে টিকোলো নাক আর ধনুকের মতো বাঁকা কাটের ঠোঁট। অল্পবয়সের বিধবা— জারজ সন্তান হতে-না-হতেই হাসপাতালে মারা যায়। সে বলে— 'আমি কিছুই জানি না; অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম দুইদিন— কি হয়েছে না হয়েছে স্মরণ নাই কিছু। জ্ঞান হলে শুনি— আমিই নাকি দায়ী। ঈশ্বর জানেন সত্যি ঘটনা— তিনিই বিচার করবেন। এখন আমি তো বিশবছরের সাজা ভোগ করে নিই আগে। কত লোক দিনে দুপুরে কত খুন করে;— এই তো মলিনা ছিল এখানে— তোমরা আসবার কিছুদিন আগে খালাস পেয়ে বাড়ি গেছে; সে দুই দুই ছেলে খুন করেছে নিজের হাতে। মলিনা নিজের মুখে আমাদের বলেছে যে, সে জোড়াসন হয়ে বসে কোলের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে এই যেমন বাঁ-হাতের উপরে ছেলেটার মাথা, আর ডান

হাত দিয়ে দায়ের কোপ বসিয়ে দিল তাকে দুটুকরা করে। সে বলত— ছেলেটা মুখ থেকে দুধটা ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল, সেই রকম ভাবেই মাথাটা গড়িয়ে পড়ল। আর— আমার দুদিনের ছেলেটার জন্য হল কিনা বিশবছরের সাজা।

'মলিনা কি পাগল ছিল?'

'না, না, দিব্যি সুস্থ সবল, দিব্যি স্বাস্থ্য। ও তো বলে— স্বামীর অত্যাচার আর সইতে না পেরে ভাবল— ছেলে দুটোকে মেরে নিজেও মরবে; নয়তো ছেলেদের দেখবে কে? তা ছেলেদের মেরে নিজের গায়েও কোপ বসিয়েছিল এলোমেলো কোপ; কিন্তু কপালে আছে ওর দুঃখ ভোগ করা— মরতে পারল না। এখানে যখন এল, তিনমাস আমরা ওর শুশ্রূষা করেছি। কাটা ঘায়ে সর্বশরীর দগ্ দগ্ করছে, বাঁ হাতটা কাঁধ থেকে প্রায় খসেই গিয়েছিল আর একটু হলে, একটুখানি মাত্র লেগে ছিল চামড়ায়।'

কত সহজে বলে এরা এ-সব ঘটনা; যেন ঝড়-খাওয়া কাকের ভিজে পালক —গা ঝাড়া দিয়ে জল ফেলে দেয়; কেউ-বা হাসিমুখে কেউ-বা দুফোঁটা চোখের জলে, কারো বা আবার তাও না। মুখচোখ ওঠে ভীষণ ভঙ্গিতে হিংস্র হয়ে, মনে হয় হাতের কাছে সেই শত্রুকে পেলে এক্ষুনি দাঁতে নখে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে বুঝি বা।

জলিল ছয় বছরের ছেলে। মার সঙ্গে এসেছে এখানে তিন মাস বয়সে। মা সতিনপুতকে সইতে পারে নি। সতিন ছিল 'বিয়া'র স্ত্রী আর সে ছিল 'নিকা'র। তার ছেলের চেয়ে সতিনের ছেলের আদর ছিল বেশি— একই বাপের কাছে। শান্ত মনে তা সইতে পারে এমন সম্বল ছিল না প্রাণে।

রূপজান চুপি চুপি বলল— 'জামিরনের সতিনপুত— এই কোঁত্ কোঁড়া দশ মাসের ছেলে; তাকে করল কি একদিন— ভর সন্ধেবেলা একটা গামছায় পুঁটলি বেঁধে বাড়ির পিছনের ঘাটে কোমর জলে একটা খুঁটি পুঁতে সেই খুঁটিতে পুঁটলিসুদ্ধ ছেলে জলের নিচে বেঁধে রেখে দিল। সতিন গিয়েছিল পড়শি-বাড়ি, দোক্তা ফুরিয়ে গেছে, দুটো পাতা চেয়ে আনতে; ফিরে এসে দেখে ঘরে ছেলে নেই। খোঁজ খোঁজ— পরের দিন দুপুরবেলা, ঘাটে চান করতে একজনার পায়ে খুঁটি বাজল; খুঁটি টেনে তুলে দেখে— তার মধ্যে ছেলে বাঁধা।'

সেই মার ছেলে জলিল। জ্ঞান হয়ে অবধি কাঁচা মাছ, তরকারি চোখে দেখে নি। সন্ধেবেলা মার বুকে শুয়ে শুয়ে গল্প শোনে আর নাম মুখস্থ করে— কলা, কচু, লাউ, শশা, ঝিঙা, কুমড়ো, বেগুন, করলা। আমাদের রান্নার জন্য তরকারি আসে; জলিল ছুটে ছুটে মাকে শুধোয়— 'কুমড়া বুঝি এইটারেই কয় গো—মা? বেগুন— রংটা কী রকম কইলা?— কালাজাম— সেটা আবার কী-টা?'

আজ এল কাতলার পোনা। গোটা মাছ দেখে জলিলের কী ফুর্তি। উল্লাসে এদিকে ওদিকে দৌড়য়, আর মুখে হাত দিয়ে কেবলই হাসে— খ্যাঁক, খ্যাঁক খ্যাঁক; এ-ই হচ্ছে তার প্রাণখোলা হাসির শব্দ। মস্ত হা মুখ-জোড়া, থ্যাবড়া নাক, চোখ দুটো দুরকম— একসঙ্গে দুদিকে তাকায়; ডান চোখটা ড্যাবডেবে, বাঁ'টা দুষ্টুদুষ্টু; একটা যখন হাসে অন্যটা কাঁদে, একটা যখন রাগে ঠিকরে পড়ে অন্যটা কৌতুকে নেচে ওঠে। রোগা, ক্যাংটা, পেটসার দেহ— তাই ছ'বছর পেরিয়ে যেতেও কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে নি এদিকে। নিয়ম— ছয় বছরের পর সন্তান জেলে মার কাছে থাকতে পায় না; যার বাড়িতে কেউ আছে সে বাড়িতে যায়, আর যার কেউ না থাকে, তাকে সরকারি স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। বানুর মেয়ে গেছে সেই স্কুলে— দেড়বছর আগে। জলিলের মারও ভাবনা হয়, কখন না জানি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে বাড়িতে তার কোলছাড়া করে। জলিলের কিন্তু মহা উৎসাহ— সে বাড়ি যাবে, গাড়ি ঘোড়া দেখবে, খেতে কাজ করবে।

মা বলে—'খাবি কী? কে তরে খাইতে দিব?' জলিল একচোখে হাসে আর-চোখে অবাক হয়, বলে— 'ভাবনা কী? থালা-বাটি লাগাইয়া দিমু রাস্তায় দশটা বাজলেই।'

'জন্মে অবধি দেখেছে সে, দশটা বাজলেই ফটকের সামনের রাস্তাটায় থালা-বাটি লাগিয়ে দিতে হয়, আর তা ডালে ভাতে ভর্তি হয়ে যায়। এর জন্য আবার ভাবনার এত কী থাকতে পারে ভেবে পায় না সে।'

ভিজে চুল, ভিজে কাপড়ে একবাটি জল হাতে নিয়ে মিলনী-মা সিঁড়ি দিয়ে বকবক করে আসছেন— 'রোদের তাপ সয় বাবা, কিন্তু বালির তাত সহ্য হয় না। কথায় বলে—

"তেজস্বীর তেজ আমি সহিতে পারি—
নিস্তেজীর তেজ আমি সহিতে নারি।"

এ কি কপালের গেরো— নরলোকে নরকবাস ; জন্মান্তরের পাপের শাস্তি নইলে এ হয় না।'

বড়ো ছুঁই-ছুঁই বাই মিলনী-মার ; কলতলায় কেউ বোধ হয় ছুঁয়ে দিয়েছে বা কেউ ঠেস্ দিয়ে কোনো বাঁকা কথা বলেছে ; এ-জিনিসটার তো অভাব নেই এখানে।

মিলনী-মার আসল নাম মৃণালিনী দেবী। বিধবা— বয়স ষাটের কাছাকাছি। কলকাতায় দু-তিনখানা বাড়ি। কলকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি তাঁর নখদর্পণে। সারাজীবন দেশবিদেশে নানা তীর্থে ঘুরেছেন, রামেশ্বর সেতুবন্ধ থেকে বক্রেশ্বরের উষ্ণকুণ্ড অবধি বাদ রাখেন নি কিছু ; শেষ বয়সে এসেছেন এখানে— মেয়ের জাকে বিষ-খাওয়ানোর দায়ে। সশ্রম কারাদণ্ড, বসে বসে ভাত খাবার হুকুম নেই। সারাদিন ঘরের কোনায় বসে; শতরঞ্চি, আসন বুনে ফেলে দেওয়া নানা রঙের জটপাকানো টুকরো সুতো, বেছে বেছে কাঠিতে জড়িয়ে রাখেন। দৈবাৎ-পাওয়া অবসর মুহূর্তে শ্রীমদ্ভাগবতখানি খুলে পড়েন।

স্নান খাওয়া হয়ে গেছে প্রায় সকলের। কেউ বসেছে রোদ্দুরে চুল শুকোতে ; অবেলায় স্নান, চুলের বোঝা শুকোবে না নয় তো। কেউ দিচ্ছে কাপড়গুলিকে উলটে-পালটে। কারো বা গামছা অতি ছোটো— সে আছে হাঁটু মুড়ে কোনায় ব'সে রোদে-দেওয়া শুকনো কাপড়খানির অপেক্ষায়।

কাঁঠালতলার ছায়ায় বসে আমি। সামনে জলিল— পাকা পাকা হলুদ রঙের কাঁঠাল পাতা কাঠিতে গেঁথে জুতো বানাচ্ছে ; দেখছি একমনে।

হঠাৎ তুমুল কাণ্ড ঘরে— বারান্দায়। একুশ বছরের বানুতে আর পঁয়তাল্লিশ বছরের রূপজানে লেগে গেছে ঝগড়া— কেউ কম যায় না। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে অকথ্য ভাষায় গালি পাড়ছে— আর দুজনে দুজনকে তেড়ে তেড়ে আসছে। অন্য কয়েদিরা যত চেষ্টা করে থামাতে, তত ওদের মনের জ্বালা, গলার জোর বেড়েই চলে। এর মাঝে এগোয় সাধ্য কার?

কী নিয়েই বা ঝগড়া ? রাগের ভাষাও বোঝা দায়। অনেক চেষ্টা ও নিরীক্ষণের পর কিছুটা বোঝা গেল। অমাবস্যায় বানু নাকি কোরান শরীফ প'ড়ে তুক্‌তাক করে। আজ সকালে বানু কাকে দিয়ে একটা কাগজে রূপজান বিবির নাম লিখিয়েছে—তা রূপজান নিজের চোখে দেখেছে। সেই অবধি সে তাকে তাকে আছে— বানু কী করে ধরবে।

রূপজান হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠল— 'গেল বছর ভাদ্রমাসে অমাবস্যার দিন বাহু কোরান শরীফ পড়ে কী-সব তুক্‌তাক করল, বছরভর আমার কত বিপদ গেল ; ভাইটা মরল— সে চাঁদমুখ আর আমি দেখতে পাব না ; আসবার সময় তার কান্নামুখ দেখে এসেছিনু, হাসিমুখ আর দেখা হল না। তারপর জমি নিয়ে শরিকের সঙ্গে মারামারি হয়ে দুই ছেলের আমার জেল হল। মেজ ছেলেটা যুদ্ধে নাম লেখাল। স্বামীটার অসুখ ছাড়ে না ফি-বারেই খবর পাই। এত বছর আমি জেল খাটছি, এমন তো কখনও হয় নাই— আল্লার দোয়ায় সকলেই ভালো ছিল। আর আজ অমাবস্যা না হোক, তবু বাহু না জানি আমার কি সর্বনাশ করবার জন্য আবার কোরান শরীফ খুলে নিয়ে বসেছে !'

বাহু কাঁদতে কাঁদতে বলল—'আমার আর খাইয়া দাইয়া কাজ নাই— আমি গেছি অর লেইগা তুক্‌তাক্ করতে। ও কি আমার '—' নাকি ? পাগলের মতো আছি আমি— সাতমাস মাইয়াটার কোনও খবর পাই না। সংসারে ঐটা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই— আল্লা অরে বাঁচাইয়া রাখুন। মাইয়া আমি কবে ফিরা পামু কে জানে, প্রাণে যেন বাঁইচ্যা থাকে। সময় পাই না মোটে। আজ রবিবার— সব কাজ সাইরা একটু ফুরসুৎ পাইছি, একটু কোরান শরীফ খুইল্যা বসছি কি— বাঘের মতো আইস্যা ঝাঁপাইয়া পড়ল আমার উপরে।'

রূপজান বললে—'মিছেমিছি আমি পড়েছি ? পড় না কোরান শরীফ যত ইচ্ছা, আমার নাম লিখতে গেলি কেন তুই কাগজে ? আমি কি বুঝি না ?— —না— চিনি না বাংলা লেখা ?' ব'লে আমার মুখের সামনে বাঁ-হাতের তেলো মেলে ধরে ডানহাতের আঙুল দিয়ে আঁচড় কেটে বলল— 'এই দেখো, এই রকম—ব-য়ে ই-কার—বি, ব'য়ে ইকার—বি ; হল না—'রূপজানবিবি' ? নিজের চোখে দেখ্‌নু আমি।'

বাহু বললে—'কইতেছি আমি হাজারবার তর নাম আমি লিখতে যামু ক্যান। দিদিরে দিয়া আমি আমার কথা লিখাইছি চিঠিতে, তবু তুই কবি তর নাম লিখছি। বেশ করছি, লিখছি। ঘরে আমার দুই দুই বেটা আছে কিনা— তাদের তর ঠিকানা পাঠাইছি। একটা বেটা তরে নিকা করব, আর একটা তরে '—' রাখব। হইল তো ?' বলে বাহু দাঁত কিড়মিড় করে উঠল।

ঝগড়া চলল সমানে। দেখে মনে হয় না, এ থামবে কোনোদিন ; কিন্তু থামল সত্যিই— মেট্রন ফাটকে ঢুকতেই। মেট্রনের কাছে তারা ধরা দিতে চায় না সহজে, 'কেস'কে তাদের এত ভয়! উদ্যত ফণা নামিয়ে নেয় এই এক মন্ত্র কানে গেলে।

মুখের কথা রূপজান বাম্নুর বন্ধ হল বটে, তবে ঝাঁজ গেল না অত সহজে। চলতে ফিরতে, পাশ কাটাতে, চোখের দৃষ্টিবাণে, চলার ভঙ্গিতে, পা-ফেলার দাপটে, হাতের আঙুল ফোটানোর কায়দায় একে অন্যকে জর্জরিত করতে লাগল সারাক্ষণ।

হাসিখুশি বাম্নু আজ আর সে বাম্নু নেই। রূপজানের প্রফুল্ল মুখ থম্‌থম্‌ করছে। কয়েদিরা দু দল হয়ে দু জনকে সমর্থন করে চলেছে। একজন শুধু গায়ে মাখল না এ-সবের কিছুই, সে হচ্ছে মিছিরন ; কারো কোনো সাতে-পাঁচে থাকে না, বলে— 'ফালতু কথায় আমি নাই, গীতগান হয় তো আমারে কেউ আটকাইয়া রাখতে পারে না।' আজও যখন তর্জনগর্জন কান্নাকাটি চিৎকারে জেনানা ফাটক ঝংকারিত, মিছিরন এককোনায় পা ছড়িয়ে বসে, চোখ বুজে, পায়ের পাতা তালে তালে নেড়ে গুনগুন ক'রে গান গেয়ে গেছে—

হাওয়ার গাড়ি টম্‌টম্‌ন্‌ নেচু-বাগানে,
চইলা গেল হাওয়ার গাড়ি— রে—
আমার বন্ধু আইল না।—

বাগানে পায়চারি করছি। সন্ধের আগে হাত-পাগুলিকে এভাবে একটু নাড়াচাড়া না করে নিলে চলে না। গোনাগুন্‌তি পা ফেলা, তাই কেউ জোরে, কেউ বা ধীরে— নানা তালে পা ফেলছি, যার যা সুবিধে।

এই সময়টিতে রোজ বাম্নু পেটোপেরে চুল আঁচড়ে ওপাশের লেবুগাছতলায় বিশেষ জায়গায় বিশেষ ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ায়, কোনাকুনি ভাবে তাকায় ; কোনোদিন তার ব্যতিক্রম হয় না। কি পায় সে সেখান থেকে? এলা একদিন আবিষ্কার করল সে রহস্য— জেলারের বাড়ির ছাদের কোনায় এক মেট আসে এই সময়ে। একটু দৃষ্টি, একটু হাসি—এই নিয়েই রঙে রসে ডুবে থাকে বাম্নুর মন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর।

সময় হল। দেখি ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে বানু— সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে; সেই বিশেষ ভঙ্গিতে বিশেষ জায়গাতে, লেবু পাতার আড়ালে। পাশ দিয়ে যেতে, চোখে চোখ পড়াতে, হেসে বানু মুখ ঢাকল। জানে সে ধরা পড়ে গেছে আমাদের কাছে।

এই একটু আগে যে চোখেতে বানুর আগুন জলছিল, সেই চোখে এত মধু এত মায়া এত শিগ্‌গিরই ঝরে পড়ছে— কোন্ জাদুগুণে? বিচিত্র মানুষের মন!

নিঝুম রাত্তির। সব কলরব থেমে গেছে; ভিতরে— বাইরে। বারান্দায় পড়েছে আমগাছের ডালের ঘন কালো ছায়া, তারই ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো আলপনা এঁকে দিয়েছে বারান্দাময়; হাওয়ার দোলায় থেকে থেকে তা কেঁপে কেঁপে উঠছে; জানালার পাশে স্তব্ধ হয়ে তাই দেখছি।

তিনপহর রাত্তিরের পাহারা বদলের ঘণ্টা বাজল। ঘরের কোনায় শুনি চাপাগলায় রূপজান ডাকছে— 'বানু, ও বানু, ঘণ্টা বেজে গেছে— ওঠ্, এবারে কয়েদি গুন্‌তি করে নে; তোর পাহারা দেবার পালা যে এখন; ও বানু— বানু—।'

ষোলো

'তোমরা নাকি আমাদের কথা দিয়া গল্প লিখছ খাতার পাতায়?' পিছন ফিরে দেখি, জামিরন চেয়ারের হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে।

বললুম, 'কে তোমায় বললে এ কথা?'

'ঐ ওরা সবাই কয়; কোন্ দিদি নাকি বানুরে নিয়া গল্প লিখ্‌ছেও?'

'তা ভালোই তো; তাতে আর হয়েছে কী? ঠিকই তো ঘটনা সব, মিথ্যা তো নয় কিছু।'

'মিথ্যা তো নয়— কেউ খুন করছি, কেউ বিষ দিইছি। সব সত্যি না হইলেও সত্যিই। কিন্তু যে যা করছি— এই ধরো আমার কথাই— কিসের জন্য কি করলাম, সে জানে এক খোদা; আর জানি আমি— অন্যে বুঝব কী কইরা? ভিতরের কত জ্বালা, কত দুঃখ তা অহরহ আমার এই বুকটার

ভিতরেই বাজছে। একি কওয়া যায়— না বুঝানো যায়,— না— কেউ বোঝে তা ?—'

মুখে খই ফোটাতে ফোটাতে মিলনী-মা এসে দাঁড়ালেন টেবিলের পাশে— স্পর্শ বাঁচিয়ে।

'—আচ্ছা, কলকাতায় যে হাওড়ার পুল হচ্ছিল শুনেছিনু— তা জোড়া লেগে গেছে ? আমি বাইরে থাকতে শুনেছিনু রাস্তা হবে, পুল হবে— গঙ্গার উপরে। আমার বাড়িটা পড়ল রাস্তার মাঝখানে। একদিন এসে ছাদে শিক পুঁতে দিয়ে গেল। সেদিন মেয়ে এসেছিল দেখা করতে ; বললে, বাড়ি ভেঙে ফেলেছে। আমি বলনু— হাজার হোক শ্বশুরের ভিটে— একটি ঈশেন কোনার ইঁট খুলে এনে রেখে দিয়ো ; ভগবান দিন দেন তো ঐ ইঁটখানি দিয়ে ভিত পত্তন করা হবে। ও— এ যে দেখছি মহাভারত— কবে কিন্‌লে ? খোকার বাবা বুঝি দিয়ে গেলেন এবারে ? ছেলের জন্য গল্প লেখা হচ্ছে ? তা বেশ— তা বেশ। আমারও আছে বাড়িতে— এই মোটা, বৃহৎ মহাভারত— ষোলো খণ্ডে শেষ, দাম নিয়েছিল বেয়াল্লিশ টাকা। শ্বশুরের আমলের বই— সে-সব পুরোনো বই কি পাওয়া যায় আর ? আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল খিলাত ঘোষের বাড়ি। তার ছিল পুরোনো বইয়ের মস্ত লাইব্রেরি— কত কত দামি বই ; অমন কারো ছিল না। নিমতলা ইষ্টিটে তার বাড়ি— বহু টাকা তার। ঐ যে পাকুড়ের ছেলে, যে ভাইকে মারল— এখন আছে জেলে, বিশবছরের সাজা হয়েছে তার ; সেই 'কেস'-এ ডাক্তার যে নাকি ইন্‌জেকশন দিয়েছিল— কি এক ভটচার্জি— সে হচ্ছে আবার খিলাত ঘোষের পুরোহিত। তাকেই দিয়েছে করে দু তিনখানা বাড়ি। তা খিলাত ঘোষের লাইব্রেরির কাছেই ছিল কাঠের গুদাম— তাতে লাগল একদিন আগুন, ঠিক রাত দুটোর সময়। জানলা দিয়ে দেখি— ওমা, লাল আলো কিসের গো ? আকাশে লাল মেঘ দেখা দিল নাকি ? বাইরে বেরিয়ে দেখি আগুন। দেড়কোশব্যাপী গোলা, তাতে আগুন লাগা— এ কি সহজ কথা ! আমরা তো ছুটে গিয়ে নিজের নিজের বাড়ির ছাদে বালতি বালতি জল ঢালতে লাগনু। ঢালব না বলো কি ? বাড়ির মাথাই তো ঠাণ্ডা রাখতে হবে সকলের আগে। ওদিকে তক্ষুনি বারোটা দমকল এসে গেল হৈ-হৈ করে। ফিরিঙ্গিরা নল ধরে সমানে জল দিচ্ছে আর সবাইকে বলছে— 'হট্ যাও, হট্ যাও।' পনেরো দিন ধরে চলল আগুন একভাবেই। সেই সেবারের

আগুনে খিলাত ঘোষের লাইব্রেরিও পুড়ে যায়। যে বই কোথাও পাওয়া যেত না, সে বই মিলত খিলাত ঘোষের লাইব্রেরিতে। সে-সব বইয়ের নাম পর্যন্ত অনেকে জানে না। কত হাজার হাজার টাকার বই যে গেল ছাই হয়ে। তা যে বাড়িটা আমার নিয়ে নিল সরকার, সেই বাড়ি থেকে গঙ্গা পষ্ট দেখা যেত। রোজ গঙ্গায় চান করতুম। লোকের যেমন পুকুরঘাট, আমার ছিল তেমনি গঙ্গার ঘাট। আচ্ছা, আজকাল গঙ্গার পারাপার হবার লঞ্চগুলি আছে কি সব? আমাদের কালে ছিল পাঁচখানি লঞ্চ জানকী রায়ের— 'কল্যাণী', 'শোভা', 'কমলা', 'বাসন্তী' আর 'সোনার বাংলা'। কুলিরা পার হ'ত আধপয়সায়, ভদ্রলোকদের লাগত তিনপয়সা। এই তো এমনদিনে ছোটোবেলা— দুপুর গড়িয়ে আসতে কোনো কোনো দিন যদি মনটা হু হু ক'রে উঠত, দু-একজন সমবয়সী নিয়ে উঠে পড়তুম লঞ্চে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে। পাঁচপয়সায় দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসতুম। কোনোদিন বা খড়দায় শ্যাম দর্শন করতুম। কোনোদিন বা বরানগরে কাঁথাধারী পাঠ— ঐ যে নিমাই যখন ভোটকম্বল ফেলে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে ভিক্ষেয় বের হলেন— মাঘমাসে বড়ো মচ্ছোব হয় প্রতি বছর; সেখানে পুরাণ পাঠ হল তো, তাই শুনে প্রাণটা জুড়িয়ে বাড়ি ফিরতুম। বালির পুলটা দেখেছ? ও তো হল গিয়ে আজ আঠারো বছরের কথা; ঐ পুলটা দিয়ে অনেকবার গেছি এসেছি। এবারে গিয়ে মনে সাধ আছে— হাওড়ার পুলটা একবার হেঁটে এপার ওপার হব। ওপারে আছে দিদির বাড়ি, ভাসুরপোর বাড়ি। তাদেরও বাড়ি ভেঙে রাস্তা হওয়াতে ওপারে গিয়ে বাড়ি করেছে। শস্তা জমি— চারশো টাকা বিঘাপ্রতি। আমি আর ফিরে গিয়ে বাড়ি করব না। স্টার থিয়েটারের কাছে আর একটা বাড়ি আছে— সেটা থেকে অবশ্যি গঙ্গা দেখা যায় না; তা যা হোক, ওতেই শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দেব। মরণকালে আর জলের ছিটে কেন? হায়রে! স্বপ্নেও কি জানতুম, এমন অবস্থায় পড়ব। ঐ যা— ঘণ্টি বাজল— না? যাই থালাবাটি লাগিয়ে দিই গিয়ে; পোড়া পেটে তো দিতে হবে কিছু যদ্দিন বেঁচে আছি'— ব'লে যেমন-ভাবে গায়ের আঁচল হাঁটুর কাপড় টেনে তুলে এসেছিলেন, তেমনিভাবেই চললেন তিনি— এপাশ থেকে টিনের থালাবাটি হাতে তুলে নিয়ে।

জামিরন চলে গেছে অনেক আগেই— মিলনী-মার কথার তোড়ে ভেসে। জামিরনের শেষ কথা কয়টাই কানে বাজছিল সারাক্ষণ— 'কত দুঃখে যে কী

করেছি তা আমিই জানি আর জানে খোদা।' সত্যিই তো, অন্যে জানবে বুঝবে কী করে? রূপজান বলে— 'যার ঘা তারই ব্যথা।'

তবু ইচ্ছে হয় জানতে, প্রাণ চায় এদের বুঝতে। নিজের হাতে খুন করেছে এরা অনেকেই— এদের একান্ত ভালোবাসার জনকে। ভালোবাসে এখনও— তাই তো জ্বলে খাক হয়ে যায় বুকের ভিতর। এত ভালোবাসা— তাই বোধ হয়— যাক সে-কথা। তবে এটা সত্যি— অতি স্পষ্ট এদের দাবি, স্পষ্ট এদের কাজ ও কাজের ফলাফল। সেইজন্যই হয়তো মিথ্যে পাপের ভয় ঝাপটে ধরে নি। এদের হাসিমুখ, সরলচোখ, সেই কথাই যেন জোরগলায় বলে বারে বারে। অবাক মানি থেকে থেকে। কিন্তু পাপী বলতে তো কই প্রাণ চায় না।

'চুলগুলি এবার বেঁধে দিই?' রাধা এসে দাঁড়ায় পিঠের কাছে; যেমনি নরম এর গলার স্বর, তেমনি নরম হাত দুখানি। মাথায় হাত দিলে ঘুমে চোখ বুজে আসে আরামে। রোজ এই সময়ে এক ফাঁকে এসে, পরিপাটি করে আঁচড়ে, চওড়া বিনুনি করে থাবড়ে থুবড়ে মাথাজোড়া এক খোঁপা বেঁধে দিয়ে যায়। অভ্যেস খারাপ করিয়ে দিচ্ছে রাধা আমার। রাধা বলে— 'তাতে কী? যখন যে অবস্থায় পড়া যায় সেই মতোই চলা ভালো। সুখ এলে সুখ নিতে হবে, দুঃখ এলে দুঃখকে— অভ্যেস বলে কিছু রাখতে নেই সংসারে।'

এ-কথার পর আর কি কিছু চলে?

Writer এল। নাকের ডগায় টিনের চশমা, হাতে দোয়াত-কলম, বগলে একতাড়া Prisoner's Ticket, সে এসে বসল আমগাছের তলায়। কয়েদিরা ছুটে গেল মেট্রনের পিছু পিছু কার কি খবর এসেছে জানতে। যাদের যাদের সময় হয়েছে মেট্রন তাদের নিয়ে চিঠি লেখাতে বসলেন। কেউ বাড়িতে চিঠি লেখাল, কেউ ম্যাজিষ্টর সাহেবের কাছে দরখাস্ত করল বাড়ির খবর আনিয়ে দেবার জন্য। যাদের নামে চিঠি এসেছে, writer পড়ে তা শুনিয়ে দিল। কারো চিঠিতে খবর সব ভালো, ভাইয়ের বিয়ে শিগগিরই, কারো ছেলেরা ইস্কুলে ভালো পড়াশুনা করছে, মাঝের মেয়েটি ডাগর হয়ে উঠেছে। কারো মা মরে গেছে এই আশ্বিনের সাতই, কারো ভাই— তার জেলখাটা বোনের কুকীর্তির জন্য ও গাঁয়ের লোকের উৎপীড়নে দেশান্তরী আজ তিনমাস যাবৎ। কারো বাড়ি থেকে খবর এসেছে— তারা এর খবর জানতে একেবারে ইচ্ছুক নয়; জেলে আছে জেলেই থাকুক চিরকাল— আর যেন বাড়ির লোকেদের

চিঠি লিখে বিরক্ত না করে ; তারা ধরে নিয়েছে তাদের মেয়ের মৃত্যু হয়েছে অমুক ঘটনার পর থেকেই।

কাজ শেষ করে writer চলে গেল। জামিন ফুর ফুর করে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে— বাড়ির সব সুখবর। রূপজানের মুখে হাসি ধরে না— যে-ছেলের জেল হয়েছিল, সে খালাস পেয়েই চিঠি লিখেছে মাকে। সুরাতনের দরখাস্ত এমনিই ফেরত এসেছে ; বাজানের জন্য প্রাণটা তার কেমন করছে— চোখ লাল হয়ে উঠেছে— এবার বুঝি কেঁদেই ফেলবে ঝরঝর করে। মরিয়ামের বুক-ফাটা চাপাকান্নার সুর ভেসে আসছে, ক্যানাফুলের লাইনের ওপাশ থেকে : মা মারা গেছে। বেচারা জেলে আসার পর প্রতি চিঠিতেই খবর পায়— একজন না একজন টুপটাপ মরেই চলেছে।

কিন্তু কতক্ষণ কাঁদতে পারে সে ? সই বানুবিবি এসে হাতে ধ'রে তুলে নিয়ে গিয়ে খাটুনিঘরে গা ঘেঁষে বসল। নিজে বোনার কাঠি তুলে নিল— মরিয়ামের হাতেও একজোড়া গুঁজে দিল।

কী পদ ধরতে পারছি নে। সুরে মনে হয় পদাবলী ; কে যেন গেয়ে চলেছে মিহি সুরে। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। জালের তারের ভিতর দিয়ে দেখি, খাটুনিঘরের একপাশে কম্বল পেতে বসে, উলের বোনা হাতে নিয়ে, আধ-বোজা চোখের উপরে ভ্রূ-ভুরু কুঁচকে একমনে গাইছে মিছিরন—

আমি সুখেরই লেইগা বান্ধিলাম ঘর মা
অনলে পুইড়া গেল।—

সতেরো

দিন পরে দিন যায়— মাস পরে মাস। ধীরে ধীরে সীমাবদ্ধ জায়গাটুকুর সব কিছুই যেন অতি পরিচিত, অতি পুরাতন হয়ে আসছে। নতুনের মোহ যাচ্ছে কেটে, জানবার কৌতূহল পড়ছে ঝিমিয়ে। যেখানে বাঁধাধরা নিয়মে ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপ সেখানে বৈচিত্র্য এসে থেকে থেকে মন ভুলিয়ে রাখবে কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে ? একঘেয়ে দিন, একটানা কাজের সুর মনকে আজ কেমন নিঃস্ব করে দিচ্ছে যেন ? এই আশঙ্কাই ছিল বরাবর। অসহায়ের

মতো প্রতিজনের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরতে লাগলুম : সেই একই সুর একই কথা তাদের মুখে চোখে। সেই তসিমন সেইভাবেই পড়ে আছে ঘরের কোনায়— ছোটো বোনের স্বামীর সঙ্গে ভাব করে নিজের স্বামীকে খুন করেছিল ; তার হয়েছে বিশবছরের সাজা আর বোনের স্বামীর হয়েছে ফাঁসি— এই জেলেই, কিছুদিন আগে। সেই অবধি তসিমন পাগলের মতো হয়ে আছে ; পড়ে থেকে থেকে নানা রোগে ধরেছে তাকে।

গঙ্গামাঈ সেলাই করছে ছেলের ছেঁড়া জামা। ছুঁচ নেই, সুতো নেই ; ঝাঁটা-কাঠির ছুঁচলো ডগা ভেঙে অন্য দিকটা নখ দিয়ে চিড়ে, তাতে পাড়ের সুতো চেপে ধরে ফোঁড় তুলছে, নামাচ্ছে। কাছেই দাজু ; মা তাকে বেঁধে রেখেছে কোমরে দড়ি দিয়ে লোহার শিকের সঙ্গে। মাথায় জন্মচুল— সে চুলে মুসলমানদের ছুঁয়ে দিলে তারা অশুচি হয়ে যায় ; স্নান না করে নমাজ পড়তে পারে না। ওদিকে গঙ্গামাঈ রেখেছে 'মানসিক' কোনো দেবীর দোরে, ছেলের তিন বছরের চুল দিয়ে পূজা দেবে তাঁকে। দুরন্ত শিশু— সবে দাঁড়াতে শিখেছে, পা এখনো টলমল করে ; সে থাকবে কেন এই অবস্থায় বেশিক্ষণ ? দাজু কতক্ষণ ছট্‌ফট্ করে অবোধ্য ভাষায় অনর্গল বলে গেল কী সব, তবু কেউ শোনে না তার কথা ; শেষে সে না পেরে চোখ বুজে মুখ ভেংচে, দিল কান্না জুড়ে।

ওদিকে কলতলায় বচসা লেগেছে— পাঁচবছরী ও বিশবছরীতে। যার যত বছর সাজা তা দিয়েই এখানে তাদের পদমর্যাদা বাড়ে কমে। পাঁচবছরী চেঁচিয়ে উঠল— 'হলই বা ও বিশবছরী ; তাই বলে কি আমার বাটি সরিয়ে দিয়ে ওর বাটি আগে ধোবে ? কেনে ? আমিই তো আগে এসেছি।'

হাজতি আছে এককোনায় দাঁড়িয়ে, তার স্থান এখনো অনেক নিচে ; এদের মাঝে এগোবে কোন্ সাহসে ? সবে তার মামলা চলছে স্বামী-খুনের। দেখা যাক আগে কয়বছরের সাজা হয়, তবে না নিজের স্থান বাছাই করে নেবে। এখন তো ফুঁ দিলেই উড়ে যায়— হাজতি কি আবার একটি লক্ষ্য করবার বস্তু !

দরজায় ঘণ্টি বাজতে মেট্রন চেঁচিয়ে উঠলেন— 'দেখতো রে, 'হাসপাতাল' আইল নাকি ?' এই সময়ে রোজ 'হাসপাতাল' আসে— দু-তিনটে বালতি হাতে ; ছেলেদের দুধ ও রোগীদের থক্‌থকে বালি নুন দিতে— যুদ্ধের বাজারে চিনি মাগগি !

ডাক্তার আসেন মাসে দুবার কয়লা-মাপা তুলাদণ্ড নিয়ে কয়েদিদের ওজন করতে। দিনের-পর-দিন না খেয়ে অসুখে ভুগলেও ওজনে সবাই বেড়েই চলে —এমনিই তুলাদণ্ডের মাহাত্ম্য !

ইতিমধ্যে দেখি কখন এক সময়ে আমাদের পলিটিক্‌স্‌ও অন্য রূপ নিয়েছে, তার ধারা বদলে গেছে। সকালের প্রথম কাজই হচ্ছে রসদ বুঝে নেওয়া। ভাগে ভাগে আসে নিত্যকার রান্নার জিনিস— তেল, আটা, চাল, তরকারি, কাঠ, নুন, কয়লা, মশলা কোন্‌টা কত কম দিল— নানাভাবে তা পরীক্ষা করে তবে ঘরে তোলা হয়। তেলে কেন গন্ধ, আটায় কেন পোকা, মুলোগুলির ভিতর ফাঁপা, চিনিটুকুর ওজন সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ, চালকুমড়োর বদলে কেন কচু দিল ; সেইসব নিয়ে হয় প্রবল তর্কাতর্কি।

এলা মেয়েদের লেকচার দেয়— কি করে বোনার কাঠি ধরতে হয় ; বলে— 'এই এমনি ক'রে ধরো, যেমন করে কলম ধরে ; নয়তো উলটা ঘুরিয়ে এনে বুনতে কতখানি সময় বেশি লাগে।'

শান্তি এসে বসে খাটুনিঘরে— 'চয়নিকা' খুলে ; বলে—'মিছে সময় নষ্ট কোরো না, হাতে বোনো, কানে শোনো। এই, আমি 'চয়নিকা' পড়ছি, মন দিয়ে শোনো সব। এ খুব ভালো কবিতা— শোনো—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত

মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত।
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে ;
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

বুঝলে ? বুঝতেই তো পারছো— তার পর—

অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে, ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র ॥'

শান্তি প'ড়ে যাচ্ছে আর মাথা তুলে এক-একবার বলছে— 'বুঝলে তো ?' কেউ সাড়া দিল কি না দিল, অপেক্ষা করতে পারে না। পড়ে চলল—

'নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ,
রোগমসীঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ ॥'

এতক্ষণে 'রোগ' কথাটি ধরতে পেরে কয়েদিরা মহা উল্লাসে হাঁফ ছেড়ে বলে উঠল— 'আহা-হা-আহা—'।

খাটুনিঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওপাশের আমগাছের একটি ডাল দেয়াল ছাপিয়ে এদিকে এসে পড়েছে; তলা ছেয়ে গেছে সরু সরু দু-ইঞ্চি লম্বা কাঠির মতো লাল লাল ফুলে। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি আমগাছের ডালে পরগাছা জন্মেছে, তারই ফুল রাঙিয়ে দিয়েছে জেল-খানার এই স্যাঁৎসেতে রাস্তাটুকু।

বাগানে ফুটেছে গাঁদাফুল, কোনোটা হলুদ, কোনোটা কমলারঙের। হাস্নুহানার ডালে ডালে কুঁড়ি ধরেছে অজস্র, ফুটবে বোধ হয় সামনের পূর্ণিমাতেই। হাস্নুহানার ঝোপের ভিতরে ছোট একটি পাখির বাসা— নিশ্চয়ই খঞ্জনীর! কতদিন দেখেছি তাদের দুপুরে এখানে। আহা— থাক, বেশ আড়ালে বাসাটি। জলিল দেখলে রক্ষা নেই। মুহূর্তে ভেঙেচুড়ে দেবে আর খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হাসবে।

জমাদার এল জেনানা ফাটকে এক বুড়িকে নিয়ে নতুন কয়েদি। থুড়থুড়ে বুড়ি, মাথাভরা শাদা চুল, দাঁত কয়টি সবই গেছে কবে কোন্‌কালে। মুখের চামড়াগুলি একটার উপর আরেকটা এসে ঝুলে পড়েছে। কপালের চামড়া ঝুলে পড়েছে ভুরুর উপরে, ভুরু পড়েছে চোখ ছাপিয়ে নাকের উপরে, নাক পড়েছে ঠোঁটের উপরে— সেই ঠোঁট আবার অন্য ঠোঁটটিকে ডিঙিয়ে এসে পড়েছে থুঁতির উপরে। এ হেন বুড়ি থরথর করে কেঁপে আর আঁউ আঁউ করে ফোঁকলা মুখে কেঁদেই অস্থির। তার নামে ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া মরে গেছে গাড়ির আর লাইসেন্স নেওয়া হয় নি। বিচারে ঠিক হল— পাঁচটাকা জরিমানা, অনাদায়ে পাঁচদিনের কারাবাস! বললুম— 'ভালোই তো বুড়ি, কেন মিছে পাঁচটা টাকা দিতে যাবে ঘর থেকে; তার চেয়ে পাঁচদিন এখানে থেকে যাও! আমাদের সঙ্গে— ভালোই থাকবে।'

বুড়ি বললে— 'তা তোমাদের থাকতে থাকতে অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার

বলে তিনটা নাতি, পাঁচটা নাতনি, চারটা ভাইপো, সাতটা ভাইঝি— আর আমার কপালে কিনা এই দুর্ভোগ। আমার নাতির নাতি হল এই সেদিন— আমার কপালে হল ফাটক খাটা— ওরে— ওহো-হো—। দু-হাতে বুড়ি কপাল চাপড়ে সারা; কেউ আর তাকে বুঝিয়ে শান্ত করতে পারি না। একদিন হোক আর পাঁচদিন হোক, 'ফাটক খেটেছে'— বুড়ো বয়সে এ লজ্জা বুড়ি রাখবে কোথায়? বলে— 'আমাকে যদি বাড়ি থেকে ধরে আনত তবে পাঁচ টাকা কেন দশ টাকাও আমি দিয়ে দিতুম ঘটিবাটি বেঁচে। তা না, আমাকে ধরে আনল কিনা নিরালা রাস্তা থেকে; ডেকে হেঁকে যে কাউকে বলে আসব সে উপায়ও ছিল না গো!'

এলা বললে— 'এই দেখো না, সব— বিশবছরের করে এক-একজনের ফাটক খাটার সাজা হয়েছে, তারা আছে কেমন করে? আর তুমি পাঁচদিন থাকতে এত কান্নাকাটি করছ?'

শান্তি বললে—'দিয়ো না টাকা। কেন টাকা দেবে? পাঁচটাকা দিয়ে পাঁচদিন তোমরা খেয়ে থাকতে পারবে। দিয়ো না, কিছুতেই দিয়ো না টাকা সরকারকে। কে সরকার? সরকার বলে কিছু নেই— বুঝলে?'

বুড়ি মাথা দুলিয়ে মাটিতে চাপড় মেরে বলল— 'আমি বুঝেছি ঠিকই, বুঝছো না তোমরাই। 'ফাটক-খাটা' আমার এ-বয়সে— এর চেয়ে কি গো টাকা আমার বেশি?'

এলা বললে— 'তার জন্য তুমি কাঁদবে কেন এত? আমরা কি কাঁদছি?'—

বুড়ি খেঁকিয়ে উঠল— 'তোমরা কাঁদবে কি? দোষ করেছিলে, তাই তোমাদের ধরে এনেছে— না থেকে করবে কি? ঐ যে বলে— "বাইন্ধ্যা মারে— সয় বড়ো" কিন্তু আমি তো কোনো দোষ করি নাই— আমি কেন ফাটক খাটব— আমাকে কেন ধরে আনল— গো।'

এলা এগিয়ে গিয়ে বুড়ির মুখোমুখি বসে বললে— 'আচ্ছা কি দোষ আমরা করেছি ব'লে তোমার মনে হয়?— খুন?—'

'তা একেবারে খুন না করতে পার, তবে কিছু একটা করেছ নিশ্চয়ই' বলে বুড়ি মুখের ঝুলে-পড়া চামড়া টান করে সকলের দিকে সন্দেহাত্মকভাবে তাকাতে তাকাতে সরে বসল।

এমন সময় খবর এল— বুড়ির ছেলেরা খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি জরিমানার টাকা জমা দিয়ে মাকে নিয়ে যেতে ছুটে এসেছে। শুনে বুড়ির ফোক্‌লামুখে হাসি আর ধরে না। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে মেট্রনের হাত ধরে বলল— 'চলো মা চলো— শিগ্‌গির বাইরে চলো ; কথায় বলে— "যার মুখে ঝাঁটার বাড়ি— সে আসে এই বাড়ি।"

মেট্রন তাকে বাইরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। বললেন— 'এ তো কিছুই নয়, এর চেয়ে এক খুনখুনে বুড়ি এসেছিল একবার, ঝোরাতে করে অজ্ঞান অবস্থায়। বুড়িটির একটি মেয়ে ছিল, তারও জেল হয়েছিল সেই সঙ্গে। কি জানি, পাড়ার লোকেই বুঝি চক্রান্ত করে মা-মেয়েকে জড়িয়েছিল ডাকাতির মামলায়। জামিনে খালাস ছিল তারা বাড়িতে। এদিকে মকদ্দমায় হার হল— পাঁচমাস জেল খাটতে হবে। শমন নিয়ে পাইক চৌকিদার এল। মেয়েটা এই-না শুনেই ঘরের ভিতরে ঢুকে গলায় ফাঁস দিল। বুড়ি-মা গিয়েছিল ভায়ের বাড়ি ; এসে দেখে এই অবস্থা— তক্ষুনি পড়ে গেল মাটিতে— অজ্ঞান হয়ে। পাইক চৌকিদার তুলে নিয়ে এল তাকে সেই অবস্থাতেই।'

খাটুনিঘরে গোলমাল শুনে মেট্রন ছুটে গেলেন সেদিকে। মায়া বললে, 'দেখলেন, কী সুন্দর সরকারের বিধিব্যবস্থা! একটুও এদিক ওদিক হবার জো নেই। মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে ঘরে— ঝুলুক না ; তা বলে বুড়ি-মার জেল-খাটার সময় তো বইয়ে দিতে পারা যায় না!'

আঠারো

সকাল থেকে মিলনী-মা আজ ব্যস্ত— বদলি হবার খবর এসেছে। বিকেলের ট্রেনেই জলপাইগুড়ি যেতে হবে তাকে। কাপড় চাদর যা আছে, পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। অন্য কয়েদিরাই আজ অতি আপনজনের মতো তার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করে দিচ্ছে। কেউ দিল তার কাপড় ধুয়ে, কেউ দিল ছেঁড়া-জায়গাগুলি সেলাই করে। কদমমণি জ্বরে পড়েছিল, এখনো হাসপাতালের 'ডায়েটে' আছে, সে ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে বারান্দার রোদ্দুরটুকুতে এসে ব'সে গেল মিলনী-মার গায়ে তেল মাখতে। সুখে দুঃখে একইভাবে দিন কাটে সকলের—

মায়াও বসে যায় একের অন্যের প্রতি ; তাই এটুকুর মধ্যেও যখন যাওয়া-আসার ভাঙচুর হয়— ব্যথা বাজে বুকে, চোখ ভ'রে যায় জলে।

বহুদিন আগে মিলনী-মা চেয়েছিলেন মহাভারতের একটি দুর্গার স্তব, বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা। লিখি লিখি করে লেখা হয় নি। আজ তাড়াতাড়ি বসলুম কাগজ কলম বই নিয়ে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। বড় গপ্পি-মানুষ ছিলেন মিলনী-মা। কারাবাসকালে বহু জেল ঘুরেছেন তিনি। বহু রহস্যের সন্ধান জানেন জেলের, বহু তথ্য আবিষ্কারও করেছেন— কতক চোখে-দেখা, কতক কানে-শোনা। অবসর সময়ে নিরালায় ব'সে বলতেন এক-এক করে ; এমন সব ঘটনা যা জেলের সীমানার বাইরে পা বাড়াতে পারে না কখনো। শুধু জেলের গল্পই নয়— জীবনভর যে নানাদেশের নানাতীর্থে ঘুরেছেন, কোথায় কী করেছেন, কী দেখেছেন, কী কিনেছেন, কোন্ রাস্তায় কত আনা ঠিকে গাড়ির ভাড়া দিলেন, কোথায় কোন্ পুলের উপরে ট্রেন অ্যাক্‌সিডেণ্ট হ'ল, কেদারবদরীর কোন্ পথে যেতে কোন্ নদীতে দেখলেন এক সিদ্ধযোগী মুখ দিয়ে পেটের সব নাড়িভুড়ি বের ক'রে শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নদীর জলে ধুয়ে পরিষ্কার করল —ইত্যাদি ইত্যাদি কত অফুরন্ত গল্প ঘটনা তার ঠিক নেই। শুনতে শুনতে এক-এক সময়ে বলতুম— 'এবার ছাড়া পেলে আপনার সঙ্গে তীর্থদর্শনে বের হব। কত অলৌকিক ঘটনা আপনার চোখে পড়ে— আপনার ভাগ্যে আমারও দেখা হয়ে যাবে।' তিনি বলেন— 'ভালোই তো, ভাগ্যে যদি থাকে যাওয়া যাবে। তোমারও তো বয়েস হয়ে এল এবারে— ধম্মকম্ম করবার ; ছেলে যে তোমার নাতির বয়সী।' শুনে এলা গুব্ গুব্ করে হেসে ওঠে—। মিলনী-মা মুখ তুলে তাকান।

তাড়াতাড়ি সাম্‌লে নিই— বলি— 'ঠিকই বলেছেন ; আমার নাতি হবারই তো বয়স হয়েছে— হলই বা ছেলে আমার ছোটো, তা ব'লে বয়েস তো আর পিছিয়ে প'ড়ে থাকে না—।'

'তবেই তো মা, ঠিক বুঝেছ তুমি— আমিও তো তাই বলি ; তা তোমার ব্যাটা তো আমার নাতি সম্পর্ক— কী বল ? এই বউকে পছন্দ হবে তোমার ব্যাটার ?'

জোরগলায় বলি— 'খু-উ-ব। ব্যাটার আমার ভাগ্যি কত!'

মিলনী-মা খুশিতে ফেটে পড়েন, মুখে হাসি ধরে না ; হাতের সুতো

বাছতে বাছতে মাথা নেড়ে নেড়ে রঙ্গরস ক'রে কতরকমের ছড়া কেটে যান।

সম্প্রতি শাস্তি ঠিক করেছে ক্যারেক্টার স্টাডি করবে; বলে— 'জানেন রানীদি, এ সুবর্ণ সুযোগ— এরাই তো হচ্ছে এক একটি আসল ক্যারেক্টার।' কিন্তু মিলনী-মা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। শাস্তি তাড়াতাড়ি খাতা পেন্সিল নিয়ে তার কাছে গিয়ে বসল; বলল— 'জানেন, মনের ভিতরে আপনার একটা ভয় আছে।'

মিলনী-মা হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

শাস্তি বলল— 'তা না হলে আপনি কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে অত চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন কেন?'

'ও তো বোবায় ধরেছিল।'

'তা নয়, আসলে আপনার মনে পাপ আছে; শিগগির বলে ফেলুন, নয়তো শাস্তি পাবেন না। মনের পাপ, ভয়— যা কিছু থাকে ব'লে ফেলা ভালো; বলুন— বলুন—।'

এবার মিলনী-মা হেসে উঠে পড়েন— অনেক কাজ তাঁর এখনো বাকি।

দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে এল। মিলনী-মার ডাক পড়ল অফিস থেকে। ট্রেনের দেরি আছে অনেক, রাত নয়টায় গাড়ি; কিন্তু বাবুদের ছুটির ঘণ্টা পড়ে যায় যে। কাজ সেরে তাদের যেতে হবে ঘরে। শীতের রাত্তির গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে বসে কাঁপে কাঁপুক না কয়েদিরা স্টেশনে পাঁচঘণ্টা— কী যায়-আসে তাতে?

মিলনী-মা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে এসে বিদায় নিলেন। দু-হাত আমার দু-কাঁধে রেখে বললেন— 'কী আর বলব, মনে রেখো, আশীর্বাদ করি আমার মাথার যত চুল তোমার বেটা তত বছর বেঁচে থাকুক— তোমার বুক জুড়িয়ে।'

সকলেই এগিয়ে গিয়ে দোর অবধি তাঁকে পৌঁছে দিলুম।

মনটা কেমন করে উঠল। সংসারে যাওয়াটা অতি স্বাভাবিক— অতি অভ্যস্ত ব্যাপার হলেও অতি সহজে তাকে মেনে নিতে পারা যায় না; তা যে-রকম যাওয়াই হোক-না কেন।

চুপচাপ এসে লেবুতলায় বসলুম। নিরিবিলিতে এ জায়গাটিতে বসে

বড়ো আরাম পাই। কেউ বড়ো আসে না এদিকে, কারো লোভও নেই এই স্যাঁৎসেতে জায়গাটুকুর প্রতি। একমনে লেবুতলায় ছোট্ট ছায়াটুকুতে বসে কত কথা ভাবতে ভাবতে বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেছে; এমন সময়ে মেট্রন ফাটকের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন একটি ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরে।

মেয়েটির গায়ে লাল সেমিজ, পরনে বাহারে পাড়ের একখানি পাতলা মিলের শাড়ি, নাকে নাকছাবি, কানে রুপোর মাকড়ি, হাতে গোছা গোছা কাচের ও রবারের চুড়ি— চুড়ির সামনে রুপোর মোটা বালা, গলায় নানা রঙের পুঁতি দিয়ে গাঁথা নকশাকাটা চিক্। মেয়েটি ফাটকে ঢুকেই সকৌতুকে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মেট্রন বললেন— 'দেখ্, ত'র কোন্ ঘরটা পছন্দ হয়। ভালো কইরা দেইখা ক'; চলব তো এইতে? থাকতে পারবি তো? ঐ— ঐদিকে একটা আলাদা ঘর আছে; ছোটো হইব কিন্তু।'

মেয়েটি হাসিমুখে মাথা হেলিয়ে জানাল— তাতেই তার চলে যাবে।

উঠে এগিয়ে গেলুম।

মেট্রন চোখ টিপে হেসে বললেন— 'কিগো, আপনাগো কোনো আপত্তি নাই তো? আপনাগো ছোটো ঘরটা— যাতে জিনিসপত্র রাখেন, সেইটা দিতে পারবেন তো অগো থাকবার লেইগা? এ অর সোয়ামির ভাত আর খাইব না, যার ভাত খাইব তার লগেই আসছে এখানে। অফিসে ধস্তাধস্তি— কিছুতেই ছাড়ব না তারে। কইলাম— আগে তুই চল ভিতরে, ঘর দেইখ্যা পছন্দ হয় তো তবে অরে আইস্যা লইয়া যাইস্ অনে।'

যে যেখানে ছিল সকলে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। মেট্রন তাড়াতাড়ি মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরের দরজায় তালা লাগালেন। আর যাবে কোথায়—

মেয়েটি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মেট্রনের হাতের চাবির গোছা ধরে টানাটানি শুরু করল— 'তুমি দরজায় তালা দিবা কেনেরে— খুইলা দাও তালা শিগ্‌গির কইরা রে— ওরে বাব্বা রে— আমারে কাইট্যা ফেলাইল রে— ওরে তুমি দেইখ্যা যাও রে—'

বাসু, মরিয়াম জাপ্‌টে ধরলো তাকে দুদিক থেকে। চেষ্টা করল সরিয়ে আনতে।— সে আসবে না দরজা ছেড়ে। পাগলের মতো দরজায় এলোপাথারি

কপাল ঠুকতে লাগল— 'আর ফেইলা আমি থাকমু না রে— অরে আইন্যা দ্যাও রে— নাইলে আমি জান দিমু রে— অক্ষনি জান দিমু রে—'

দরজার ওপাশ থেকে ঘণ্টি বাজছে— জমাদারনি ভিতরে আসবে, দরজা খুলতে হবে। মেট্রনের ইঙ্গিতে মেয়েরা সকলে মিলে কেউ তার হাত, কেউ পা, কেউ কোমর, কেউ মাথা ধরে চ্যাংদোলা করে জোরজবরদস্তির সঙ্গে তাকে এনে ফেলল আমতলাতে।

সে তখন উদ্দাম ; এদিকে ছোটে ওদিকে ছোটে— দেয়ালে মাথা ঠোকে, মাটিতে আছাড়ি পিছাড়ি গড়াগড়ি যায়। চেঁচাতে চেঁচাতে তার গলা চিরে গেল, ঠোঁট জিভ শুকিয়ে উঠল। কিছুতেই আর সামলানো যায় না। তাকে ঘিরে মেয়ের দল জেনানা ফাটকের সীমানাটুকু দৌড়ে ঘুরতে লাগল।

রূপজান কোরান পড়ছিল, বেগতিক দেখে একটা আমগাছের ডাল নিয়ে রুখে এল— অ্যাঁ, মুসলমানের মেয়ে হয়ে তোর এত বড়ো বুকের পাটা? এখানে আনতে চাস্ মরদ মানুষকে? ঘর থেকে বেরিয়েছিস্ বলে কি লাজের মাথাও খেয়ে বসেছিস্?' রূপজানের এই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে মেয়েটি মুহূর্তে থম্‌কে গেল।

জমাদারনি এগিয়ে এল— টেনে টেনে গায়ের গয়নাগাটী সব খুলে নিল— মায় নাকছাবিটি পর্যন্ত। পরতে দিল তাকে কয়েদিনের পুরনো একখানা ময়লা ছেঁড়া শাড়ি। গুদোম থেকে এনে দিল খানিকটা সাজিমাটি হাত-পা ধুতে।

মেয়েটি করুণ মুখে, ভয়-বিহ্বল চোখে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পরণের শাড়ি সেমিজ বদলে, সাজিমাটি ঘষে হাত-পা ধুয়ে ধীরে ধীরে কাঁঠালতলায় এসে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়াল। জীর্ণবস্ত্রে নিরাভরণ দেহে তাকে দেখে বুকের ভিতরটা হায় হায় করে উঠল। এই একটু আগে রূপে লাবণ্যে যে ছিল পরম রমণীয় বস্তু, অকস্মাৎ সে মাধুরী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, চোখের সামনে ফুটে রইল এক অতি দীনহীনা নগণ্যা বালিকামূর্তি। ছেঁড়া আঁচলটি গায়ে জড়িয়ে সে থরথর কাঁপছে ; খানিকটা ভয়ে ; খানিকটা শীতে।

সময় নেই আর বেশি— ঘরে বন্ধ হবার। কয়েদিরা টানতে টানতে তাকে নিয়ে বসল ভাত খেতে। ভাতের থালা সামনে দিতে সে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল— এ ভাত সে খায় কী করে? সে যে পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছে 'তার' ভাত ছাড়া আর কারো ভাত খাবে না এ জীবনে।

যত সান্ত্বনা দেওয়া যায় ততই বেশি কাঁদে। মহা মুশকিল। মেট্রন কী ভেবে একহাতে ঘাগড়া ধরে অন্যহাতে চাবির গোছা দোলাতে দোলাতে ব্যস্তভাবে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মিনিটখানেক বাদে আবার ফিরে এলেন ; বলেন— 'নে, নে— শিগ্‌গির খাইয়া নে। সে-ই তর লেইগা ভাত পাঠাইয়া দিইছে— এই ত আমি জাইনা আইলাম। বাইরে দাঁড়াইয়া রইছে সে : নে— খাইয়া নে সক্কালে তবে তো তার কাছে যাবি তুই।'

শুনে মেয়েটি নিশ্চিন্তমনে তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে মুখ ধুয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ফাটকের পাশে এসে দাঁড়াল ; তৈরি সে, এবারে গেলেই হয়।

ভাবগতিক দেখে মেট্রন সেখান থেকে স'রে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই জমাদার এসে ঢুকল। কয়েদিরা দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় বসল জোড়া জোড়া সার বেঁধে। জমাদার তড়বড় করে সবাইকে গুণে গেঁথে 'নম্বর' ঢুকিয়ে ঝন্‌-ঝন্‌ন্‌ শব্দে তালা বন্ধ করে চলে গেল। মেট্রনও পিছু পিছু দৌড়ালেন— এবারে তাঁর ছুটি।

জমাদারের আবির্ভাব হতেই সকলের দৌড়, ঝাঁপ, জমাদারনির চিৎকার, মেট্রনের ব্যস্তত্রস্ত ভাব-ভঙ্গি দেখে মেয়েটি গিয়েছিল হতবুদ্ধি হয়ে। কখন কার টানে সেও এসে বন্দী হয়েছে ভিতরে— এতক্ষণে তার সংবিৎ ফিরে পেল ; কিন্তু আর উপায় নেই।

জোড়া জোড়া সখী এসে ঘিরে ধরল তাকে। কেউ লাগল সহানুভূতি দেখাতে, কেউ লাগল নানা প্রশ্ন করে— কৌতূহল মেটাতে, কেউ কেউ আবার ঠাট্টা জুড়ে দিল ; মিছিরন এসে তার সামনে কোমর ঘুরিয়ে দুপাক নেচেও গেল। রূপজান ঘুরে ফিরে বলতে লাগল— 'আহারে, এইটুকু মেয়েকে জাদু করেছে রে— বেমালুম জাদু করেছে—।'

সেখান থেকে এসে জানালার পাশে বসলুম। সংসারে এই আসা-যাওয়া চলেছে পাশাপাশি ; একটা যায় তো আর-একটা আসে। শোক, উৎসব করবারও সময় থাকে না ; বিধাতার এমনই বিধি।

আজ পূর্ণিমা— দিগ্‌বিদিক ছেয়ে গেছে চাঁদের আলোয় ; বাদ পড়ি নি আমরাও তা থেকে। একখণ্ড আকাশ— আকাশের গায়ে আম কাঁঠাল গাছ— তার তলায় আলোছায়ার খেলা ; এই বা কম কী! আহা বেচারা মিলনী মা, এখনো হয়তো বসে আছেন স্টেশনে। কতদিন বাদে বাইরে বের হলেন। মনে পড়ে একদিনের কথা— সেদিন ছিল রাসপূর্ণিমা ; পুব-উত্তর কোণ ঘেঁষে

আকাশের গায়ে গোল হয়ে চাঁদ উঠেছে। কী কারণে সেদিন জমাদারের আসতে দেরি হচ্ছিল। আমরা কজন বাইরে ঘোরাফেরা করছি, আর উচ্ছ্বাসে 'আঃ, উঃ' বলছি। মিলনী-মা সকলের সঙ্গে জোড়া বেঁধে ঢাকা বারান্দায় ফাইলে বসে আছেন, আর আমাদের 'উঃ, আঃ' শুনে উসখুস করছেন। বলছেন— কত বড়ো চাঁদ উঠেছে গা? এই এত বড়ো থালার মতো হবে? পূর্ণ গোল হয়েছে তো? হবেই তো, রাসপূর্ণিমার চাঁদ যে।

বললাম, 'আসুন না বাইরে। এই এখানে এলেই দেখতে পাবেন— আসুন না— আসুন উঠে—।'

মিলনী-মা দু তিনবার 'ওঠ বোস' করে শেষে ধপ করে বসে পড়লেন; বললেন, 'নাঃ থাক্। কপালে থাকে ছাড়া পেয়ে দেখব আবার!'

বুড়ো মানুষ। এই বয়সে শেষে সকলের সামনে মেট্রনের ধমক খান, সে বড়ো লজ্জা!

তাই ভাবছি বসে, যাক্, আজ মিলনী-মা চাঁদ দেখতে পাবেন রাতভর। নাই-বা হল রাসপূর্ণিমার চাঁদ— তবুও চাঁদ তো? চাঁদের আলোর নীচে মুহূর্ত থাকতে পাওয়াও যে বিশ বছরের কয়েদির পক্ষে অতি দুর্লভ।

উনিশ

আজিমন মেয়েটির নাম। বিয়ের বছর দুয়েক যেতে না যেতে এক পড়শির সঙ্গে ভাব হয়। স্বামী তাই গঞ্জনা দেয়। আত্মীয়রা লাঞ্ছনা করে। ঘরে থাকা অসহ্য। বেরিয়ে পড়ল একদিন সেই পড়শি বন্ধুকে নিয়ে একেবারে জনসমুদ্রের মাঝে। এ-জায়গা সে-জায়গা ঘুরে বেড়ায়, লোকের তাড়া খায়। ঠিক করল— ট্রেনে উঠে দূর দেশে চলে যাবে। স্টেশনে কতকগুলি গুণ্ডা তাদের টাকাকড়ি সব চাইল; তারা দিতে অস্বীকার করল। গুণ্ডারা থানায় খবর দিল। সিপাই দারোগা এল। এলোমেলো দুজনকে মারল। তার পর থানা থেকে এখানে চালান দিয়ে দিল। অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

নিরালা দুপুরে লেবুতলায় বসে তার কাহিনী শুনছি। আমার সঙ্গ ছাড়ে না আজিমন। আমি নাকি তার ফুফুতো-বোনের মতো দেখতে। বই-

খাতায় চোখ নামালেই বলে — 'রাগ কইরো না, আমার দিকে ফিরা বোস খানিক।'

খাতা-কলম ফেলে তাকে মুখ দেখাতে ঘুরে বসতেই হয়। তার ফুফুতো-বোনের মতো আমি দেখতে— আমার তো একটা দায়িত্ব আছে তার প্রতি!

বলি— 'আজিমন, দারোগা যে তোমাকে মেরেছিল, খুব লেগেছিল কি?'

মুখে কাপড় দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। মারের ব্যথা এখনো তার অঙ্গ ছেয়ে আছে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল— 'পরের হাতের মার— সেকি মমতা রাখে কখনো?'

'তাই বুঝি ভয় পেয়েছিলে— এখানে যখন আনে তোমায়?'

'হাঁ, বুবু। ভাবলাম— আবার বুঝি মারবো, অরে আর আমারে। তাই, আমি আপিস ঘরে অরে ছাড়তে চাই নাই— কপালে যা আছে একসঙ্গেই ভোগ করি যেন; দুঃখই হউক আর সুখই হউক। আচ্ছা, অরে কি খুব মারছে এরা এখানে?'

বললাম— 'না, না— মারবে কেন? এখানে আর তোমাদের গায়ে কেউ হাত তুলবে না। বিচার হবে কোর্টে। তাতে খালাস পাবে, নয় কয়েকমাসের জেল হবে। ভাবনা কোরো না কিছু।'

সে বললে— 'না বুবু, দুঃখের ভাবনা তো করি না। কপালে আল্লা যা লেইখা দিছে তাই হইবো; তবে অর লেইগা পরানটা কেমন পাগল পাগল করে— অরে যে আর দেখতে পামু না— নয়তো মরতেও আমার কোনো দুঃখ আছিল না।'

এইখানেই তো যত বাধা। মনে পড়ে— একদিন তালডাঙার চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের মাতব্বররা জড়ো হয়েছে। তখন মাঝরাত্তির। বাইরে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। থামের গায়ে একটি মিটমিটে লণ্ঠন জ্বলছে। সেই আলোতে বাইরের অন্ধকারকে আরো যেন জমাট করে তুলেছে— ভিতরের ভারি হাওয়া থম্‌থম্ করছে। আলোচনা শেষ হল। বাগদি এক মোড়ল— জোয়ান পুরুষ, কলো কুচকুচে শরীর, চওড়া বুকের পাটা, এতক্ষণ চোখ বুজে থামের গায়ে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছিল; এবারে দুলতে দুলতে এগিয়ে এসে হাত নেড়ে বলল 'তা শুনুন বটেক আপনকারা, 'বন্দেমাত্‌রম্' বলতে পারবো—

পিকেটিংও করতে পারবো, গুলিও খেতে পারবো; কিন্তু মরে যদি যাই তো ঘরে এসে যে তাকে আর দেখতে লারবো—।'

মাতাল বলে সকলে তাকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু সেদিন আর কোনো কথা চলল না। আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। আস্তানায় ফিরবার মুখে অন্ধকার পিছল পথে পা টিপে টিপে চলতে চলতে কেবলই মনে হতে লাগল— এত কথার মধ্যে আজ মাতাল বাগদিই বললে সবচেয়ে খাঁটি কথা! প্রিয়জনকে না দেখতে পাওয়ার দুঃখ যদি মনকে আকুল করে না দিত— তবে মরণে আর ভয় ছিল কি?

জেল-গেটে বিরাট জনতার সমবেত কণ্ঠস্বরে ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম্' শোনা গেল। অন্য জেল থেকে চালান এল বোধ হয়। কয়দিন থেকেই রাজবন্দী সমাগম হচ্ছে এ-জেলে। শুনছি কলকাতায় বোমা পড়েছে। আছি যে-জায়গায়, আঁচ লাগে না কিছুরই। ভাবনা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই হাতে। কী যে হচ্ছে বাইরে— কল্পনা করি কত মতে!

সর্দার এসে ঢুকল জমাদারের সঙ্গে— জেনানা ফাটকের রাস্তা মেরামত করতে। এইরকম কাজ উপলক্ষে পুরুষ কয়েদিরা আসে মাঝে মাঝে— অবশ্যি বাছাই-করা সব বুড়োর দল। বাইরে পায়চারি করতে করতে সুযোগ বুঝে তাদের সঙ্গে আলাপ করি। এমনি করেই একদিন আবিষ্কার করেছিলাম এই সর্দারকে। সবাই তাকে এই নামেই ডাকে। খিদিরপুর ডকে তার বাড়ি; মায়ের একমাত্র সন্তান— নানির প্রচুর সম্পত্তির মালিক। কিন্তু হলে হবে কী, ত্রিশ বছর পেরোতেই দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপল; নানা দেশের নানা লোক নিয়ে দল তৈরি করে নানা দেশে ডাকাতি করে বেড়াতে লাগল। শেষে এক জজসাহেবের বাড়ি ডাকাতি করতে গিয়ে দলের একটা লোক ধরা পড়ে যায়— সঙ্গে সঙ্গে গোটা দলটারই নাম জানাজানি হয়।

জিগগেস করি, 'থাকতে তো দলের এক-একজন এক-এক জায়গায়, কী করে খবর দিতে তাদের?'

'দলের প্রধান প্রধানদের তার পাঠিয়ে দিতাম— "অতটাকা অমুক তারিখে পাঠাও শিগ্‌গির"। তারা, যত টাকা চাই ততজন লোক নিয়ে এসে হাজির হত।'

'দলে যখন নতুন কোনো লোক টানো— কী করে বোঝো আগে— কাকে টানা যাবে বা কাকে যাবে না?'

'তা দিদি, শরীরের মধ্যে ভগবান চোখ বলে দুটো পদার্থ তো দিয়েছেন;' বলে সর্দার মৃদু হেসে রাস্তায় জল ছিটিয়ে দিয়ে সঙ্গের লোকটিকে বলে, 'নে, মানিক, তাড়াতাড়ি দে— কয়েকটা দুরমুশ পিটিয়ে। জেলখানার কাজ— উপর পালিশ থাকলেই হল। তেরো বছর ধরে দেখছি তো এই ব্যাপার!'

'তেরো বছর জেলে আছো সর্দার? কত বছর বয়সে ধরেছিল তোমায়?'

'এই— বত্রিশ পেরিয়ে তেত্রিশে পড়েছিলাম দিদি তখন।'

মাত্র ছেচল্লিশ বছর! কিন্তু সর্দারকে দেখলে মনে হয় ষাটবছরের বুড়ো। চুল দাড়ি পেকে গেছে, গাল ভেঙে তুবড়ে গেছে, গলার কণ্ঠা দুটো দু ইঞ্চি উঁচু হয়ে বেরিয়ে পড়েছে— এই কি এই বয়সের উপযুক্ত চেহারা? সর্দারের এই লম্বা শরীর, চওড়া বুক, যখন শক্ত মাংসপেশীতে ঢাকা ছিল— তখনকার সেই চেহারাই যে তাকে সর্দারের আসনে বসিয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানিক বলে— 'আমিও দেখছি আইস্যা অর এই বুকের পাটা— এই হাত-পায়ের গোছা! জেলখানার খাওয়ায় কি শরীর টেকে?'

সর্দার বলল, 'শরীর টিকুক আর নাই টিকুক, সরকারের কাজ হাঁসিল হলেই হল। নয়তো, মানুষ তো দূরের কথা, পশুরাও এত খাটতে পারে না, এত কষ্টে বেঁচে থাকতে পারে না। এই তো দেখুন না, হুকুম হল— রাস্তা মেরামত করো, স্নানের জায়গায় সিমেণ্ট লাগাও; কিন্তু একঝুড়ি চুনসুড়কি বের করবে না ঘর থেকে— হুকুম দিয়েই খালাস। এবারে করো তোমরা যেমন করে পারো; নেহাৎ জানের ভয়— না হলে দেখিয়ে দিতাম একবার।'

বললাম, 'সুপারই তো বলে গেলেন যে, আমাদের স্নানের জায়গা বাঁধিয়ে দেবেন— তবে চুনসুড়কি মিলবে না মানে?'

'ও দিদি, সাহেবের ঐ কথাটি বাদ দিয়ে যেয়ো বরাবর। সাহেব একচোখে তোমাদের 'হ্যাঁ, হ্যাঁ' বলেন আর-এক চোখে এমনি করে আপিসের বাবুদের 'না, না' করেন।' বলে সর্দার চোখে টিপে-টিপে সাহেবের গুপ্ত কায়দাটি দেখিয়ে দিল।

সর্দারের কথাবার্তায় মজা বেড়েই চলে। একে একে অনেকেই ঘিরে দাঁড়ায় তাকে। তার গল্পে মন আকৃষ্ট করে— শুনতে আগ্রহ বাড়ে। বলি— 'আচ্ছা সর্দার ভাই, তোমরা ডাকাতি করতে গিয়ে মেয়েদের গায়ের গয়নাও খুলে নিতে জোর করে?'

সর্দার জোরে মাথা নেড়ে জিভ কেটে বললে, 'না, না, তা কখনো ভালো ডাকাতরা নেয় না। মেয়েদের গায়ের গয়না খুলে নিলে সে ডাকাত রাস্তায়ই ধরা পড়ে যায়।'

'ডাকাতি করতে গিয়ে কী কী করো— বলো না ?'

'কী আর তেমন ? যাই মোটরে করে, সোজা গিয়ে বলি : চুপ— এই দেখ পিস্তল ; চিৎকার করেছ কি— গেছ ; শিগগির ফেলে দাও আয়রন সেফের চাবি।'

'যদি না দিতে চায় ?'

'দু একটা খোঁচা লাগাই— চাবি তখন আপনিই বেরিয়ে আসে।'

'কত টাকা পেয়েছিলে সেইবারে— জজের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে ?'

'বেশি না , ছাব্বিশ হাজার মাত্র। নামেই সে জজ ছিল— তবে ভদ্রলোক ছিল খুব ; গিয়ে বলামাত্রই চাবি বের করে দিল। টাকাকড়ি নিয়ে পাঁচটা মোটরে করে হুস করে চলে এলাম। দারোয়ানটা একটু উসখুস করছিল— দুটো খোঁচা মেরে দিলুম তাকে একেবারে সরিয়ে।'

'ধরা পড়লে তবে কী করে ?'

'সে পাঁচমাস পরে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একজনকে ধরতে পেরেছিল ; তাতেই মাটি করল। সেটা ভিতু ছিল বেজায়।'

'খুন খারাবি করো নি— সত্যি ?'

'খুনই যদি করতাম তবে কি আর জেলে আসি ? তা হলে নাড়ীতেও জ্বর থাকত না— হাকিমও ডাকতে হত না।'

'কারো উপর কি আক্রোশ আছে তোমার ? খালাস পেলে কী প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা রাখো ? সেই জজসাহেবের উপর বা আর কারো উপর ?'

'না, জজসাহেবের উপর আমার কোনো আক্রোশ নাই ; তবে জুরিদের বংশে বাতি দেবার যেন কেউ না থাকে— খালাস পেলে তা-ই একবার দেখে নেব। তারাই তো আমার তেইশ বছরের সাজা দিল কিনা সব একজোট হয়ে !'

মানিককে দেখে মেট্রন একদিন সন্দেহ করেছিলেন। কয়েকবছর আগে

একটি মেয়ে কয়েদি ছিল; তাকে বের করে আনার দায়ে ধরা পড়েছিল কয়েক-জন— মানিক হয়তো তাদেরই একজন হবে বা। শুনে মানিক রুখে ওঠে—'না, না, না আমি ও-সবে নেই, আমার murder case।'

'Murder case? কাকে খুন করেছিলে?'

শত্তুরে আমার ঘরে আগুন লাগায়— বার বার তিনবার। শেষবারে তারেই পুড়াইয়া মারলাম ঐ আগুনে। আগুন লাগাইয়াই শত্তুরে পলাইবার মতলবে যেমন দৌড় দিইছে; আমি আছিলাম তাকে তাকে— গিয়ে ধরলাম জাপটাইয়া— আর যাইবা কই? দিলাম তারে ঘরের ভিতরে ঠেইলা দরজায় শিকল তুইলা।'

স্বচ্ছ ভাষায় বলে যায় মানিক। মনে কোথাও এতটুকু গ্লানি নেই। যত নৃশংস ব্যাপারই হোক-না কেন, এদের এই পুরুষালি তেজ বিস্মিত করে মন। পাপের ভোগ তখনই— যখন সে অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করে। সেই অনুশোচনাকেই এরা ধিক্কার দেয় যেন।

সর্দারের কথা শুনে মানিক হেসে তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—'জানো, ও এমন অবিশ্বাসী পুত্তুর নিজের মার কাছে পর্যন্ত স্বীকার যায় নাই; তাই তো অর এত সাজা!'

মাথা দুলিয়ে সর্দার বলল, 'তা ঠিক। মাকে বললে আমার সাজা অনেক কমে যেত; মা উকিল ব্যারিস্টার দিয়ে মামলা চালাত। আমার প্রমাণ ছিল না কিছু, খালাস পেলেও পেতে পারতাম।'

'তবে কেন বলো নি তোমার মাকে সব কথা খুলে?'

'তাই কি বলে কখনো? হাজার হোক মেয়েমানুষের বুদ্ধি— বলে দেবে হয়তো একে-তাকে। মা যখন আমায় জিগগেস করল "বল্ বাবা, আমাকে সত্যি করে বল্ তুই।" আমি মার মাথায় হাত দিয়ে কসম করে বললাম—"সত্যি বলছি মা— আমি এ-সবের কিছুই জানি না।"'

'এত বড়ো মিথ্যে কথাটা তুমি বলতে পারলে— নিজের মার মাথায় হাত দিয়ে?'

'কী আর করব— মাই হোক আর যেই হোক; মেয়েমানুষকে বলতে নেই এ-সব কথা!'

'পরিবার আছে তোমার?'

'এক বছরের ছেলে রেখে সে মারা গেছে— আমি বাইরে থাকতেই। ছেলে আছে আমার মার কাছে।'

'চিঠিপত্র লেখে না, দেখা করতে আসে না?'

'এলেও দেখা করি না, চিঠি লিখলেও উত্তর দিই না; প্রতি মাসেই মা চিঠি দেয়।'

'উত্তর দাও না কেন?'

'কী হবে লিখে? লিখলেই মা এসে কান্নাকাটি করবে। জানিয়ে দিয়েছি —আমি অন্য জেলে চালান হয়ে গেছি; নসিবে থাকে— বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে তাদের সঙ্গে।'

'মার খবর যে রাখো না, মা বুড়ো মানুষ— মরেই হয়তো গেল একদিন টুক করে—'

'কী আর করব? আমিই যদি আজ মরে যাই? সংসারে কে কার! কেউ কারো নয় দিদি!'

সর্দারের কথা যেমন স্পষ্ট তেমনি জোরালো; বড়ো ভালো লাগে ওর কথা শুনতে। কয়েকবার খাওয়া-আসাতেই সর্দারের সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে। আজ বললাম— 'সর্দার-ভাই, বাইরের খবর শুনেছ কিছু?'

নির্লিপ্তভাবে সে বললে— 'শুনছি বই-কি। কলিযুগের শেষদশা; এ না হয়ে উপায় কী? হতেই হবে যে। এমন পোড়া দেশে পোড়া কপাল নিয়ে জন্মেছি— না খেয়ে মরব, বোমার আগুনে মরব, সরকারের বুটজুতোর চাপে মরব; তবুও নিজের দেশের জন্য, নিজের জনের জন্য দু ঘা দিয়ে মরতে পারব না।' বলতে বলতে সর্দারের হাতের, বুকের শুকনো মাংসপেশীগুলো কেঁপে উঠল; দুরমুশে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ উদাস দৃষ্টি মেলে; বলবার আর কোনো ভাষা জোগালো না মুখে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমিও— রাস্তাটির এ-পাশে কমলা রঙের গাঁদাফুলভরা গাছগুলি ঘেঁষে।

কেরোসিনের ছোট্ট লণ্ঠন। নটা বাজতে না বাজতেই বার-কয়েক দপদপ করে উঠে নিভে যায় নিঃশেষে তেলটুকু পুড়িয়ে দিয়ে। জেলখানার হিসেব-করা তেলের বাতি— হিসেব-করা দণ্ডপলের সঙ্গে তাল রেখে চলে। নিয়মের একটু এদিক ওদিক হবার উপায় নেই। নিবন্ত লণ্ঠনের শুকনো পলতে দু-চার বার ঘুরিয়ে, বাড়িয়ে-কমিয়ে, নিরাশ হয়ে শেষে বিছানায় গিয়ে ঢুকি। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় করে ঢোকে মাথার মধ্যে যত ভাবনা, যত ঘটনা, ভূত-ভবিষ্যৎ, অতীতের। প্রহরের পর প্রহর কাটে, জেলারের বাড়ির ছাদের উপরে বড়ো ঘণ্টায় ঢং ঢং করে সংখ্যা বেজে চলে , নম্বরে নম্বরে পাহারা বদল হয়— তাদের হাঁক-ডাকের সুর বদলে যায় ; মাঝে মাঝে মাথার দিকে বাইরের উঁচু দেয়ালের উপর পেঁচার অদ্ভুত কর্কশ ডাক কানে আসে— সঙ্গে সঙ্গে মনটা শিউরে ওঠে।

আজ সকালে ঘন কুয়াশায় চারদিক ছিল ঢাকা। দেয়ালের ও-পাশের পুবের আকাশে বোধ হয় রাঙা হয়ে সূর্য উঠছে— তারই আভা পড়েছে মাথার উপরে আকাশটুকুতে। গাঁদাফুল থেকে হাতের তেলোয় শিশির ঝেড়ে ঝেড়ে মুখে হাতে মাখছি। শীতের হাওয়ায় চিড়বিড় করে ফেটে-যাওয়া চামড়ায় সকালের শিশির উপকার দেয় ; রূপজ্ঞান দিয়েছে পরামর্শ টা। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছেও মনে হয় শুনেছিলাম এমনিতর কথা।

মনে পড়ল— মামার বাড়ি গিয়েছি বেড়াতে। মাঘ মাস। কনকনে শীত। সূর্য উঠবার আগে উঠে চলেছি দু-বোনে দিদিমার আঁচল ধরে গাঁয়ের সেরা পুকুরঘাটে, লালুব্রত করতে। ঘাড়ের কাছে গেরো-বাঁধা গায়ে জড়ানো কাঁথা একখানি। তারই ভিতর থেকে কোনো মতে হাত বের করে, অতসী ফুলে ঢাকা মাটির লালু বসানো ছোট্ট পিঁড়িখানি ধরে ঠকঠক করে কাঁপছি আর পা ফেলছি। পাড়ার সঙ্গিনীদের মধ্যে কে কত আগে উঠে ঘাটে আসতে পারে রোজই চলত তার প্রতিযোগিতা। তা ছাড়া তাগিদও ছিল ব্রতের। আমরা 'লালুব্রত' করে পুকুরঘাটে বসে 'খুয়া' ভাঙব— তবে তো সূর্যি ঠাকুর উঠবেন আকাশে ; নয়তো মাঘ মাসের এই ভারি খুয়া ভেদ করেন সাধ্য কি

তার ? কিন্তু পথের দু-ধারে ঘাসে পাতায়, মটকিলা গোটায়— ছোটো-বড়ো নানা আকারের মুক্তোর মতো শিশিরবিন্দু থামিয়ে দিত আমার চলাকে। দিদি তাড়া লাগাতেন, দিদিমা হাত ধরে টানতেন ; তাড়াতাড়ি— উপুড় হয়ে চলতে চলতেই তাদের উপরে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতুম। এ যেন এক খেলা ছিল সকালের শিশিরের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে মন চলে গেল মামাবাড়ির গ্রামের সেই সরু পথটি ধরে পুকুরঘাটের পারে ; দল বেঁধে এসে দাঁড়াল ঘিরে শৈশবের খেলা-সঙ্গিনীরা। তারই মধ্যে দেখছি কোমরে ডুরে-শাড়ি জড়ানো, লাল কালো সুতোয় নকশা-আঁকা কাঁথা গায়ে ছোট্ট একটি মেয়েকে— কুয়াশার আবছা আড়ালে। সেই আবছায় আজ দেখছি আবার তাকেই উঁচু দেয়ালের ভিতরে গাঁদাফুল গাছের পাশে।

হঠাৎ নজরে পড়ল— গাঁদাফুলের উজ্জ্বল রঙ ম্লান হয়ে এসেছে, জায়গায় জায়গায় যেন ফ্যাকাশে রঙ ধরেছে। দিন শেষ হয়ে এল বুঝি এর ; এই দু-দিন আগেও এই গাঁদাফুল তার নানা রঙ-বেরঙে জেলখানার নীরস আঙিনা-টুকু আলো করে রেখেছিল। যে গাঁদাকে কত অবজ্ঞা করেছি, বাগানের আনাচে কানাচে যদি বা উঠেছে কখনো একটি দুটি, নজরে পড়ামাত্র তা নির্মূল করে সোয়াস্তি পেয়েছি মনে, সেই গাঁদাই জেলখানার বদ্ধ সীমায় চোখে আঙুল দিয়ে লজ্জা দিত বারে বারে। কিন্তু আজই— এত শিগগির এর যাবার সময় এসে গেল কেন ? উপর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি আমের ডালে পরগাছায় যে থোকা থোকা লাল ফুল দেখা যেত, যে ফুল রাঙিয়ে দিত তলায় চলার রাস্তাটুকু— সেখানে রঙের চিহ্নটুকুও আজ নেই। কখন এও নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে পালা শেষ করে চলে গেছে, জানতেও পারি নি।

নিমগাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ছে— ঝুরঝুর করে ; তলা ছেয়ে গেছে সরু সরু হলুদ পাতায়। হাস্নুহানার পাতায়ও রঙ লেগেছে ঝরে পড়বার, দিন-কয়েকের মধ্যে তারও কাজ শুরু হবে। চারদিকেই কেমন একটা চলে যাবার ইঙ্গিত। সবই যদি একসঙ্গে বিদায় নেয় তবে থাকব কী নিয়ে ? কে আবার আসবে— নতুন করে— মন ভোলাতে, প্রাণ মাতাতে !

তৃষ্ণার্ত চোখে ক্ষুধিত মন নিয়ে ঘুরতে লাগলাম সীমাবদ্ধ জায়গাটুকুতে। এ-কোণ, ও-কোণ, সব খালি ; মাথার উপর, পায়ের নীচ সব শুকনো। ঘুরতে

ঘুরতে পুব-দক্ষিণ কোণের শ্যাওলাঢাকা লেবুতলায় গিয়ে আছড়ে বসলুম। দুটো টুনটুনি আমায় দেখে পাতার ঝোপে ঢুকে গেল— আবার বেরিয়ে এল— আবার ঢুকল। বাঃ, ডালের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়ালাম; দেখি, সবুজ কুঁড়িতে ভরে গেছে ডালের ডগা; দুটি-একটি একটু শাদা হয়ে এসেছে, পরশু নাগাদ ফুটবে হয়তো! একটা মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। ঘরে এসে বই খুলে পড়লুম--

'খুলে দাও ক্ষণ তরে
ঢাকা দাও ক্ষণ পরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারই কী ধন
কে লইল বুঝি হরে।
দেওয়া নেওয়া তব— সকলি সমান
সে কথাটি কে-বা জানে,
ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে।'

ঘরের ও-কোনায় কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অনেকক্ষণ ধরে। অনেকবার শুনেছি এই কান্না গভীর রাত্তিরে। কত কান্না, কত বেদনা চাপা থাকে এদের বুকে; তাই নিষুতি রাতে এমনি করেই চেপে কেঁদে হালকা করে বুকের বোঝাটাকে।— এ ছাড়া আর তো পথ নেই কোনো!

নম্বরে পাহারা বদল হবার সময় হল। বারান্দায় লোহার খাটে জমাদারনি নাক ডাকাচ্ছে বিচিত্র স্বরে। রসুনবিবি জানালার পাশে গিয়ে তাকে ডাকল —'ও জমাদারনি মা, জমাদারনি মা, আমার পাহারা শেষ হল; এবার জামিরনকে এক কুড়ি সতেরো জন কয়েদি বুঝিয়ে দিলাম— শুনলেন? ও জমাদারনি মা—।'

জমাদারনি জড়িতকণ্ঠে 'উঃ হুঃ-হুঃ' বলে পাশ ফিরে আবার নাক ডাকাতে লাগল।

উঠে বসলাম এসে জানালার পাশটিতে। যত দিন যায়, দিনের ভার তত ভারি হয়ে ওঠে, চলার সহজ গতিকে অসহজ করে তোলে। স্রোতের মুখে নৌকো চলবে তরতর করে— পাল তুলে দিয়ে; তা নয় এ যেন কাদাজলে লগি ঠেলে ঠেলে দিন কাটানো!

ছায়ার মতো রাধা এসে বসল পাশে ; ফিসফিস করে বলল, 'কখন থেকে দেখছি আমি— চোখ পিটপিট করে তুমি কেবলই উসখুস করছ, ঘুম আসছে না বুঝি ? ভাবনা হচ্ছে, নয় ?'

বললাম, 'এত রাত অবধি তুমিই বা জেগে আছ কেন ? আমাদের রাতে ঘুম না এলেও দিনে সেটা পুষিয়ে নিতে পারি ; তোমাদের তো তা হবার জো নেই। উঠতে হবে সেই কোন্ সকালে, রাত না-পোহাতেই ; যাও শোও গে —যাও।'

'শুলেই কি আর ঘুম আসে ? তা কি নিজে বুঝতে পারছ না ? বিছানা পেতে শুই— কি মাথার মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে থাকে— আগুন ছোটে যেন ; কিছুতেই শান্ত হতে পারি নে। রাতের পর রাত চলে এমনিই। ভাইদের জন্য মন কেমন করে। যতই দিন যায়, যাতনা বেড়েই চলে ; এর কি আর নিবৃত্তি হবে না ?'— বলতে বলতে রাধার গলার স্বর কেঁপে উঠল, ঝরঝর করে দু-চোখের ধারা গড়িয়ে পড়ল ; আমার কোলে তার মাথাটি লুটিয়ে দিল।

কী বলব, কী দিয়ে সান্ত্বনা দেব ? এ দুঃখের সীমা-পরিসীমা নেই। রাধা চাপা মেয়ে, মুখ ফুটে বলে না কিছু। আপন মনে নিজের কাজ করে যায় সারাদিন। সময় পেলে কোনায় বসে জপতপ করে একটু। কারো বাদ-বিসংবাদে থাকে না সে। দেখতেও রাধা সকলের চেয়ে সুশ্রী। লম্বা ছিপছিপে, গায়ে মেদমাংসের বাহুল্য নেই, মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ, চোখে ধীরভার। রাধাকে দেখলেই মনে একটা সম্ভ্রম আসে ; অন্য কয়েদিদের চেয়ে তাকে আলাদা করেই দেখতে ইচ্ছে যায়।

যেমন সকলের হয়— তারও হয়েছিল অতি শৈশবেই বিয়ে ; কিন্তু কী একটা কারণ আছে ভিতরে— যার জন্য সে স্বামীর ঘরে যায় না বড়ো। স্বামী আছে কি নেই তা হয়তো জানে না— হয়তো বা জানে ; জিগগেস করলে মুখ নিচু করে রাধা বলে— 'আমি তো বলি, সে নেইকো।' এ রাগের কথা, কি অভিমানের বুঝতে পারি নে।

সে বলে, 'বলব একদিন সব তোমায় খুলে ; তবে আজ নয়, যেদিন খালাস পাব, সেদিন।'

হেসে বলি, 'আমাকে তখন কোথায় পাবে তুমি ?'

'যেখানেই থাকো, ঠিকানা জেনে রাখব। খালাস পেলে একবার ভাইদের একটু চোখের দেখা দেখেই চলে আসব তোমার কাছে। সংসার আর করব না— এ মুখও আর কাউকে দেখাব না।'

বড়ো দুঃখে, বড়ো অভিমানেই রাধা বলে এ কথা। মা-বাপ-মরা পাঁচ ভাইয়ের একমাত্র বোন সে। অতি আদরেই থাকে ভাইদের সংসারে। বড়ো ভাই ছিল তার পিতৃতুল্য; সে-ই রেখেছিল রাধাকে আড়াল করে, সংসারের সবকিছু ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচিয়ে। সেই বড়ো ভাইকেই খুন করার দায়ে পড়েছে রাধা।

একদিন বিকেলে অন্য ভাইরা গেছে, কেউ-বা বেড়াতে কেউ-বা হাটে, কেউ-বা ঘাটে মাছ ধরতে; বউরাও এদিকে ওদিকে কাজে ব্যস্ত; রাধা দুইছিল দুধ বাইরের দিককার গোয়ালঘরে— এমন সময়ে চিৎকার সকলের। ভিতরে এসে দেখে, বারান্দায় বড়ো ভাইয়ের রক্তমাখা দেহ থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে উঠোনে গড়িয়ে পড়ে আছে। পুলিশ এল, দারোগা এল, সিপাই-সান্ত্রিতে ছোটো গ্রাম ভরে গেল; বাড়িসুদ্ধ সকলকে টেনে নিয়ে গেল থানায়। সেখানে চলল সকলের উপরে মারপিট, নানা অত্যাচার। তার পর একদিন বিচারে রাধা দেখে— গাঁয়ের লোক কোর্টে সাক্ষ্য দিল— রাধার নাকি মাথা খারাপ; সকলে দেখেছে, মস্ত এক খাঁড়া হাতে রাধা ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে উঠোনময়; ভাইকে কেটে মহা আনন্দ তার।

কাঠগড়া থেকে রাধা প্রতিবাদ করতে উঠতেই সকলে তাকে থামিয়ে দিল। পাগলের কথার আবার মূল্য কী? হয়ে গেল তার বিশ বছরের সাজা। রাধা করুণ হাসি হেসে বলে— 'আলিপুরের জেলে যখন আমায় নিয়ে এল, সাহেব ডাক্তার এল আমার মাথা পরীক্ষা করতে। সেই অবধি মাথা ঝিমঝিম করা আমার রোগ দাঁড়িয়ে গেছে। এইসব কথা ভাবলেই মাথার মধ্যে কেমন করে, পেটের ভিতর মুচড়ে মুচড়ে যন্ত্রণা হতে থাকে। অথচ এই ভাবনা ছাড়া থাকতেও পারি না একমুহূর্ত।'

আজ বোধ হয় এই-সব ভাবনাই রাধাকে ভিতরে ভিতরে উতলা করে তুলেছে। তিন বছর মাত্র সে কাটিয়ে উঠেছে বিশ বছরের মধ্যে। আর বছরগুলি কাটবে কী করে, কবেই বা কাটবে; তাও তো কম ভাবনার নয়!

রাতের হাওয়ায় ভাপসা ঘর দেখতে দেখতে শীতল হয়ে এল। রাধা

অনেকটা শান্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে তার কম্বলে গা এলিয়ে দিল। আমিও উঠলুম।

আবার পাহারা বদলের ডাক শোনা গেল— ও জমাদারনি মা, জমাদারনি মা—

বাকিটা না শুনেই জমাদারনি উঃ-হুঃ-হুঃ করে উঠল।

একুশ

ভোর চারটের ঘণ্টা বাজতেই কয়েদিদের কলরব শুরু হয়ে গেল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যে যার কম্বল গামছা ভাঁজ করছে ; রূপজান তাড়া দিচ্ছে— জলদি কর সব, এক্ষুনি মেট্রন মা আসবে 'নম্বর' খুলতে ; জোড়া জোড়া হয়ে ফাইলে বস শিগগিরি।

ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে মা-রা কম্বলের কোট গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিল। ছেলেমেয়েরা আর একটু ঘুমোক, তারা তো আর কয়েদি নয়, কয়েদির ছেলে ; একটুকুন তাদের সরকার 'মাপি' করে দিয়েছেন। রূপজান লম্বা লাঠিটা দিয়ে মাথার উপরে টানানো লণ্ঠন নাবিয়ে লাঠিটা জমাদারনির হাতে জিম্মে করে দিল। সব ঠিক। এবারে মেট্রন এসে দরজা খুললে সব গুড়গুড় করে বের হবে ঘর থেকে।

কিন্তু আসছেন না কেন মেট্রন? সময় তো হয়ে গেছে। উবু হয়ে বসে দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে কয়েদিরা দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করছে, কতক্ষণ বসে থাকা যায় এমনি করে? তার চেয়ে একটু শুয়ে থাকলে কাজ দিত। ঠাণ্ডা মেঝেয় ঠাণ্ডা হাড়ে কাঁপুনি ধরায়।

দেখতে দেখতে রাতের আঁধারটুকু কেটে গেল। দিনের আলোর আভাস পেতেই কাক শালিকরা এদিক ওদিক থেকে সাড়া দিতে লাগল। মশারির ভিতর আমরাও উসখুস করে উঠলাম। চারদিক ফরসা হয়ে গেল তবু মেট্রন আসেন না কেন আজ? অন্যদিন এর কত আগে গরম কাপড়ের ঘাগড়া জ্যাকেট পরে কেরোসিনের লণ্ঠন হাতে নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে আসেন, তড়বড় করে তালা খোলেন, সকলের মশারি তুলে তুলে গোনেন— এক দুই তিন চার

—সংখ্যায় ঠিক আছে তো সব হিসাবমতো? অনেক সময় নিজের দৃষ্টি-শক্তিকেও তিনি বিশ্বাস করেন না, ডেকে ডেকে সকলের সাড়া নেন।

এলা বলে, 'বুড়িকে একটু না নাচিয়ে ছাড়ছি নে।' একদিন মেট্রন দরজা খুলতেই এলা ধড়মড়িয়ে আমার খাটে এসে কম্বলের নীচে মুখ ঢেকে শুয়ে রইল আমার পিঠ ঘেঁষে।

মেট্রন ঘরে ঢুকে এলার খাটের মশারি তুলেই আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন— 'কই গেল— অ্যাঁ, কই গেল সে?' কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি সব খাট। মেট্রন অন্ধকার ঘরে এ খাটে ও খাটে ঠোক্কর খেয়ে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলেন, আর ফিরে ফিরে গুনতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই সংখ্যায় মেলে না। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা সত্ত্বেও সকলের লেপকম্বল চাপা হাসিতে কেঁপে উঠতে লাগল। মায়া ও ভাবী এ জেলে চালান এসেছেন কয়দিন আগে। মেট্রন মায়ার খাটের কাছে গিয়ে মশারির ভিতর হাত ঢুকিয়ে মাথার দিক পায়ের দিক টিপে টিপে দেখতে লাগলেন। মোটা লেপে নাকমুখ ঢেকে ঘুমানো অভ্যেস মায়ার; শুধু তাই নয়— লেপের নীচে সে মুহুর্মুহুঃ চরকিবাজি ঘোরে। এই দেখি সে দক্ষিণশিয়রী আছে। খানিক বাদে দেখি উত্তরশিয়রী হয়ে গেছে। মেট্রন লেপের নীচে টিপে টিপে মায়ার মাথা খুঁজে বের করে তবে রোজ সোয়াস্তি পান মনে। বলেন, 'কি জানি গো, কার মনে কী আছে। এই রকম লেপকম্বল ঢাকা অবস্থায়ই তো কতজনে উধাও হইয়া যায়। এই তো সেদিন অমুক জেলে শুনি এই কাণ্ড। সকালে সবাই ভাবল শুইয়া আছে বুঝি কয়েদি লেপকম্বল ঢাকা দিয়া; শেষে ওমা, ঢাকা তুইলা দেখে ঢাকার নীচ ফাঁকা— পক্ষী উড়ছে।'

সেদিন মায়াকে কয়েকবার টিপবার পর মায়া রুখে উঠল 'কি রোজ রোজ রাত না পোহাতে টেপাটিপি শুরু করে দেন? লোক কি একটু স্বস্থির হয়ে ঘুমোতেও পারবে না এখানে? সারা রাত তো কাটে নানারকম কাকুলিতে— তার পর আবার এই জ্বালা; মাথা খারাপ হবার জোগাড় হল দেখছি এবারে।'

সেখান থেকে তুরতুর করে মেট্রন এলেন আমার খাটের কাছে। এবারে লাগলেন আমার মাথা টিপতে। এদিকে লেপের নীচে এলা হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেছে, শাসিয়ে রেখেছে— খবরদার, যদি মুখ খোল। মেট্রনের আতঙ্ক যত বাড়ছে, তত আমার মাথায় জোরে চাপ পড়ছে। মেট্রন আর

পারেন না স্থির থাকতে; কেঁদে ফেলেন আর কি! ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'আগো, কন না— কয়জন আছেন আপনারা এই খাটে? সত্য কইরা কন, একজন না দুইজন?'

আর চুপ করে থাকা যায় না। চার পাশ হতে হাসির রোল উঠল। এলা তার মুখের ঢাকা খুলে আত্মপ্রকাশ করল। মেট্রনেরও আতঙ্ক ঘুচল। তাড়াতাড়ি ফাইলের কাছে গিয়ে মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে বললেন ইস্‌কোয়াড্— এটেনসন— আইজবার। সঙ্গে সঙ্গে সকলে তড়াক করে উঠে সেলাম ঠুকে যে যার ঝাঁটা হাতে নিয়ে কাজে লাগল।

এমন যে মেট্রন, যাঁর কর্তব্যে এতটুকু এদিক ওদিক হয় না, বলেন—'আমি কি সরকারের নুন খাই না যে গাফিলতি করুম?' সেই তার আজ হল কী? এত দেরি কেন আসতে? অঘটন কিছু ঘটেছে নিশ্চয়ই। বন্ধ ঘরের ভিতরে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম সবাই।

হঠাৎ বাইরে একসঙ্গে অনেকগুলি হুইসিল বেজে উঠল। ঝন্‌ঝন্ শব্দ হল। জেলারের বাড়ির দোতলার ছাদের উপরে বড় পাগলা ঘণ্টিটা চারদিক কাঁপিয়ে ত্রাসসঞ্চারিত শব্দে বেজে উঠল— ঢং ঢং— ঢং ঢং।

হুল্লোড় পড়ে গেল ভিতরে বাইরে। জেলের ভিতরে কোনো কিছু গোলমাল হলেই এই বিরাট পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোহার ফটক খুলে যায়, দলে দলে সেপাই ঢোকে বন্দুক বাগিয়ে। ঘটনাস্থলে যাকে পায় হাতের কাছে, তার উপরেই চলে মারপিট— বন্দুকের নানা ব্যবহার, যতক্ষণ না মনে হয়— গোলমাল মিটেছে ঠিকমতো।

তাই এই ঘণ্টির শব্দ এত ভীতিপ্রদ।

জেলের নিয়মে, এক ঘণ্টির শব্দ কানে যাওয়া মাত্র যে যেখানে আছে, কাজকর্ম, নাওয়া খাওয়া ফেলে, সবাইকে দৌড়ে নম্বরে ঢুকতে হয়। জমাদার, মেট্রন কয়েদিদের তালাবন্ধ করে অপেক্ষা করে, নিরাপদসূচক সংকেত পড়লে আবার খুলে দেয়।

আজকে আমরা ঘরে বন্ধই আছি। তবুও অস্থির হয়ে উঠলুম। বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি, ঘরময় ঘুরে ঘুরে ছটফট করছি —কী না-জানি ঘটল আবার। কান পেতে শুনছি বাইরে দলে দলে লোকজনের যাতায়াত, গোলমাল, গুঞ্জন, একটা কিসের উত্তেজনা।

এতক্ষণে মেট্রন শুকনোমুখে ছুটতে ছুটতে এলেন। দরজার তালা দৌড়ে দৌড়ে টেনে টেনে দেখলেন ঠিক আছে কিনা। আতঙ্কে তাঁর চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তাঁর অবস্থা দেখে আমাদের অস্থিরতা আরো বেড়ে গেল, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করতে লাগল— কী জানি কী একটা সাংঘাতিক বুঝি কিছু। জানতেও সাহস হয় না এমন অবস্থা। কোনো রকমে শুকনো স্বর টেনে জিগগেস করলুম— 'কী হয়েছে, কী ঘটেছে?' মেট্রনের মুখে আওয়াজ নেই; হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিলেন— 'পরে— পরে জানতে পারবেন।' তাঁর হাবভাব দেখে একেবারে বসে পড়লুম।

ওদিকে পাগলা ঘন্টি বেজেই চলেছে সমানে— ঢং ঢং— ঢং ঢং—

মেট্রন কেবলই ছুটে ছুটে বারান্দার এদিক ওদিক করছেন। অশান্তচিত্ত আর শান্ত হয় না। শেষে তিনি চোখ বুজে বিড়বিড় করে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম জপতে শুরু করে দিলেন।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর॥
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥

তাঁর সঙ্গে আর কথা বলবার সুযোগ পাই না। কী করি, অগত্যা নিরুপায় হয়ে নিজেদের চিত্ত শান্ত করতে লেগে গেলুম এবারে।

খানিক বাদে পাগলা ঘন্টি থামল; মেট্রন দরজা খুলে দিলেন। আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। জেলারের ছাদের উপরে সর্বদা জেলের সিপাইরা পালা করে পাহারা দেয়। আজ সেখানে অনেকগুলি বাইরের পুলিশের লাল পাগড়ি দেখা গেল। মেট্রন উপর দিকে মুখ তুলেই আতঙ্কে 'অ্যাঁক্' করে একটা শব্দ বের করেই কাঁঠালতলায় দৌড়ে গিয়ে দু-হাত বুকে তুলে আবার নাম জপতে লাগলেন। কয়েদিরা নীরবে যে-যার কাজে হাত দিল। থমথম করছে চারদিক; একটু শব্দ করতেও কানে বাজে। জামিনা একপায়ে দু-পায়ে মেট্রনের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে— মেট্রন মা, আজ কার লম্বর ঝাঁট দিবার পালা?

মেট্রন তখন দ্রুত নাম জপে চলেছেন—

যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥—

জামিনার কথা শুনে তিনি হাতের আঙুলগুলি ঝাড়া দিয়ে বললেন, 'যা, যা— যে হয় কর, যে হয় কর।'

জামিনা ভড়কে গেল। ভয়ের আবহাওয়া তাকে আরো ছেয়ে ফেলল।

এলা বললে, 'আজ ছাদে লাইনের পুলিশ উঠেছে কেন, মেট্রন ?'

মেট্রন দু-চোখের দৃষ্টি একবার আকাশের দিকে তুলে, একবার মাটির দিকে নামিয়ে 'পরে, পরে কমু, অখন না' বলে তেমনিভাবেই আওড়ে চললেন—

পুরন্দর নাম রাখে দেব শ্রীগোবিন্দ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম দেব দীনবন্ধু ॥

কী আর করা যায় ? উপায় নেই যখন কিছু জানবার, তখন আপন আপন কাজে লাগা-ই ভালো। কিন্তু মনের ভিতর কেমন একটা যন্ত্রণা হতে থাকে এই অবস্থায়। পঞ্চাশ হাত দূরে দেয়ালের ও-পাশে ভীষণ কিছু একটা হয়ে গেলেও তার ঘুণাক্ষর জানতে পারা যায় না। এ নিদারুণ ছটফটানির তুলনা নেই।

বেলা দশটা। ছাদের উপর থেকে লাল পাগড়ি নেমে গেল। মেট্রন তখনো আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে নাম জপছেন—

কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
সে ধনে বঞ্চিত হলে কি হবে উপায় ॥
—উপায়, কি হবে উপায়—

তাঁকে গিয়ে বললাম, 'এ আবার কী ব্যাপার ? লাল পাগড়ি উঠলই বা কেন আর নামলই বা কেন ?'

—'অ্যাঁ, নাইমা গেছে ? সত্যই ?' মেট্রন দু-হাতে ঘাগড়া ধরে ছুটে এলেন এদিকে নিজের চোখে দেখতে। দেখে তেত্রিশ কোটি শত দেবতাকে ডেকে পুবমুখী দাঁড়িয়ে চোখ উলটে বারে বারে দু হাত কপালে ঠেকালেন। এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, 'তা হলে দয়াময় হরির দয়ার একটা মীমাংসা বোধ হয় হইয়া গেল।'

—'কিসের মীমাংসা ?'

ধীরে ধীরে জানা গেল, জেলের সিপাইরা আজ ধর্মঘট করেছিল, ভাতা

বাড়াবার জন্য। কর্তৃপক্ষ আগেই খবর জেনে যায়, একরাত আগে থেকে সশস্ত্র গুর্খা আনিয়ে রাখে, তেমন তেমন হলে ঠাণ্ডা করতে হবে তো?

মেট্রনের এক ছেলে এই জেলেরই এক সিপাই। তাই আশঙ্কা এত মর্মস্থলে গিয়ে আঘাত করেছিল তাঁর।

বিকেলের দিকে সঠিক জানলাম কর্তৃপক্ষ ভাতা বাড়াবার প্রতিশ্রুতি তো দিয়েছেই, আরো স্থবিধে করে দেবে— বাজারে চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি যে দরে পাওয়া যায়, সে-সব শস্তা দরে এখন থেকে এদের সরবরাহ করবে।

মেট্রনের খুশি-মুখে হাসি আর ধরে না।

বাইশ

একে একে আরো অনেকেই এসে গেছেন এ জেলে। দল আমাদের বেশ ভারি। কুমিল্লা থেকে লাবণ্যদি এসেছেন, যমুনা এসেছে; আরো অনেক মহিলাকর্মীও এসেছেন।

ঠিক হল স্বাধীনতা দিবসে পতাকা তুলতে হবে। জাতীয় পতাকা একটি তৈরি করা দরকার। এলা কারো বিছানার চাদরের কোণ কেটে, কারো গামছা হলুদ জলে ছুপিয়ে; কারো সবুজ শাড়ির আঁচলা ছিঁড়ে— শাদা, হলুদ, সবুজ তিন রঙের তিন টুকরো খদ্দর নিয়ে অতি যত্নে অতি সন্তর্পণে পতাকা সেলাই করে জামার ভিতর লুকিয়ে রেখেছে কয়দিন আগে থেকে।

সব ঠিকঠাক। ২৬শে সকাল বেলা। দরজার তালা খুলতেই হুড়মুড় করে সবাই এসে জড়ো হলাম নিমগাছের তলায়। খাটের সঙ্গে বাঁধা মশারি টানাবার বাঁশ একটি খুলে এনেছে এলা। যমুনা তাড়াতাড়ি তাতে পতাকা লাগিয়ে উঁচু ডালে বাঁশটি বেঁধে দিল। নন্দিতা, মায়া জেলখানার ভোরের হাওয়া কাঁপিয়ে গান ধরল—

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
জয় জয়—

ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়াতে মেট্রন হকচকিয়ে গেলেন। কাছে এসে ফিসফিস করে শুধোলেন, 'এইটা আবার কী গো? আইজ আপনাগো কী?'

'আজ স্বাধীনতা দিবস।'

'ওঃ' বলে তিনি পাশঘেঁষে দাঁড়ালেন আমাদেরই একজন হয়ে।

আগে থেকেই কথা ছিল অনুষ্ঠানের পর পতাকা নামিয়ে ঘরে তুলে আনা হবে; যেন কোনো অশুচি হাত না লাগে এতে। গান থামতে ঘন ঘন বন্দে মাতরম্ ধ্বনির সঙ্গে পতাকা নামানো হচ্ছে—এমন সময়ে জেলারের বাড়ির বারান্দায় ঝোলানো চিকের পাশ থেকে হাঁকডাক করতে করতে জেলারের বিরক্তিভরা মুখ উঁকি মারল। 'সকাল বেলা জেলের ভিতর এ-সব হচ্ছে কী?' —জেলার মেট্রনকে হুমকি দিতেই মুহূর্তে মেট্রনের শান্তমূর্তি বদলে গেল। গলার স্বর পঞ্চমে উঠল— রাগে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন আর-কি। ফটকের কাছে গিয়ে গলা উঁচু করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জেলারকে তিনি বলতে লাগলেন— 'গোড়া থেইকাই ত আমি বারণ করতে আছি; শুনে কি তারা সহজে? আমি অনেক চেঁচামেচি করার পর না এই তারা পতাকা নামাইয়া লইল।'

জেলার ধমকে উঠলেন, 'তুলতে দিলে কেন তুমি? কেড়ে নিতে পারলে না?'

মেট্রন ঘাগড়া ঘুরিয়ে দু-পাক খেয়ে ফোঁস করে উঠলেন, 'হঃ, আমি একখান কইলে আমারে তারা দশখান শুনাইয়া দেয় না? আমার সাধ্য কি তাগো লগে পারি? তবুও আমি হেন মাইয়া দেইখ্যা, আমার সাধ্যমতন চেষ্টা করতে ছাড়ি না।'

মেট্রনের এই যুদ্ধং দেহি বীরাঙ্গনা মূর্তি দেখে ও নির্জলা নির্ভীক কৈফিয়ৎ শুনে হাসি আর থামে না কারো। নিমেষে কি আমূল পরিবর্তন!

জেলার জানালা থেকে অদৃশ্য হতে মেট্রন গড়গড় করতে করতে ঘরে ঢুকলেন; ফুলতে ফুলতে বললেন, 'আচ্ছা এক বিপদে এখন ফেলছেন আমারে। কন দেখি আপিসে আমি এর জবাব দিমু কি অখন?'

মেট্রনের কথা শেষ হতে না হতে পুবদিকের 'ছোকরা-ফাটকে'র দেয়াল ঘেঁষে বাঁশের ডগায় একটি জাতীয় পতাকা মাথা তুলল। উত্তর কোণে, দক্ষিণ কোণে বহু কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠল। সে ধ্বনি জেলের মোটা দেয়ালের এপাশ-ওপাশ ঝংকারিত করে দিল। এক ধ্বনিতে জেলের সকলে আজ এক হয়ে গেল। এ বড়ো আনন্দ!

মেট্রনকে বললাম— 'আর ভাবনা নেই; আপিসে আপনি একলাই জবাবদিহি করবেন না, আরো সঙ্গী পাবেন।'

তেইশ

গান্ধিজি অনশন শুরু করেছেন।

এলা চরকা কাটছিল নিমগাছ তলায়। সেখানে গিয়ে তার পাশে বসলাম। আকাশের নীল রঙটি আজ কী উজ্জ্বল! জায়গায় জায়গায় ধোনা তুলোর মতো হালকা হালকা শাদা মেঘের স্তূপ, সে কী বাহার! এমন দিনে এমন আকাশ দেখেছি কি এর আগে আর? কী জানি হয়তো দেখেছি, হয়তো বা দেখি নি; হয়তো বা খেয়ালই ছিল না দেখবার। দূরে পাকুড়গাছের ডগায় বসেছে কতকগুলি বাজ, কয়েকটা কাক—।

'বেশ করছি, মারছি তো জন্মের মতো মাইর‍্যাই আসছি— তা বইল্যা আধমরা কইর‍্যা তো রাইখ্যা আসি নাই যে, সাপের মতো বেড়াইয়া ধরবো আবার।'—বলতে বলতে সামনে দিয়ে চলে গেল সুরাতন। খোঁচাটা গিয়ে যেখানে পড়ল, সে তখন কাপড়ে সাবান মাখছিল কলতলায়। কানে কথা যেতে মুখ বেঁকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে দমাদম হাতের কাপড় আছড়াতে লাগল।

সুরাতন, সৈয়দা দুই সখী। সকাল থেকেই আজ কিসের মনোমালিন্য দুইজনেতে। সামনাসামনি কথা বন্ধ। চলতে ফিরতে ঠারে ঠোরে তাদের কথার ধাক্কাধাক্কি, খোঁচাখুঁচি চলেছে। সুরাতন বিশবছরী, সৈয়দা আটবছরী। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জলের গ্লাসে তুঁতে গুলে দিয়েছিল, বলেছিল, 'খা, খেয়ে মর্ তুই'। স্বামী তক্ষুনি পাড়াপড়শিদের ডেকে এনে চাক্ষুষ সাক্ষী রাখল, রাগের মাথায় দারোগা ডাকল, সৈয়দাকে চালান দিল— মামলা হল, সৈয়দাকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়ল।

এখন নাকি স্বামী প্রতি চিঠিতে 'হায় হায়' করে। একটু আগে সৈয়দা বালতিতে জল ভরতে ভরতে বলছিল বুঝি সুরাতনকেই উদ্দেশ করে 'আমার আর কী, কয়টা দিনের কথা; সারাজীবনের মেয়াদ লইয়া তো আসি নাই জেলে।' সুরাতনও কথা ফেলে রাখবার মেয়ে নয়।

রসুনবিবি ফোকলামুখে হাসতে হাসতে এসে একটি বেশ বড়ো হল্‌দে রঙের কাচের টুকরো এনে ধরল সামনে; বলল, 'এ-ই সেই'। সাত বছর আগে

ঢেঁকির পাড় পড়ে তার ডান হাতে। মোটা মোটা চ্যাপ্টা ডায়মণ্ডকাটা গোছা ভরা রঙ-বেরঙের চুড়ি ছিল হাতে— ভেঙে তা টুকরো টুকরো হয়ে হাতের নানা জায়গায় ফোটে। তার মধ্যে একটি টুকরো আবার মাংসের ভিতরে অদৃশ্যও হয়। ঘা শুকিয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে সেই টুকরোটায় চাপ পড়লে কচকচ করে বিঁধতো এই যা ; নয়তো রসুন আছে বেশ তাকে নিয়ে। কেউ জানেও না কিছু। দিন কয়েক আগে বাসন মাজা নিয়ে রসুনের দারুণ আপত্তি। কী কারণ ? না— রসুনের হাতের তেলোয় খানিকটা জায়গা শক্ত হয়ে উঠেছে, বাসন মাজতে গেলে কচকচ করে কী যেন বেঁধে। ডাক্তার দেখলেই ছুরি চালাবেন শুনে রসুন আজ দুদিন থেকে আপ্রাণ চেষ্টায় ছুঁচ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা বের করে আনল। বড়ো খুশি রসুন। বলে, 'কাঁচটা কিন্তু ফুটেছিল উলটোদিকে, বের হল তো আর-এক দিক দিয়ে— এ কী তাজ্জব ?'

প্রায়ই ভাবি রসুনকে জিগগেস করব, ওর দাঁতগুলি সব পড়ে গেল কী করে। বয়েস তো দেখে মনে হয় না, ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি। হাতের পায়ের গড়নও সুন্দর, বড়ো বড়ো চোখ দুটি, থেকে থেকে কারণে অকারণে সলজ্জভাবে এদিকে ওদিকে তাকিয়েই তক্ষুনি আবার নামিয়ে নেয়— ব্রীড়াময়ী ভঙ্গিতে থুঁতির নীচে আঙুল লাগিয়ে মুচকে হেসে দাঁড়ায় ; সবই বেশ, কিন্তু ফাঁকা মুখের ঐ হাসিটিই মাটি করে দেয় সব।

বললাম, 'রসুন, এই অল্প বয়েসে তোমায় দাঁত পড়ে গেল কী করে ?'

সে বললে, 'কী জানি। তবে একবার খুব জ্বরজারি হল, গাঁয়ের কবিরাজ কি একটা টোটকা ওষুধ খাওয়াল, মাস খানেকের মধ্যে সব দাঁতগুলিই পড়ে গেল।'

মেট্রন ঘুরে ঘুরে তদারক করছিলেন সবার। কাছে এসে বললেন, 'আচ্ছা গো, না খাইয়া মাইনষে থাকে কী কইর‍্যা গো ? আমরা যে একাদশী করি— এইটা ওইটা খাই, তবুও পরের দিন সকালে যেন এলাইয়া পড়ি, বিছানা থেইকা উঠতে পারি না। আর আপনাগো গান্ধি, উনি শুনছি নাকি এইবারে একুইশটা দিন এক্কেবারে কিছু না খাইয়া থাকবেন ?'

—'ও মেট্রন মা, মেট্রন মা, দেইখ্যা যান, মরিয়ম থালাসুদ্ধা ভাত ফালাইয়া দিল। ও মেট্রন মা—' মিছির ডাকল।

মেট্রন তাড়াতাড়ি ছুটলেন সেদিকে। মরিয়ম আজ দুপুরেও ভাত খায় নি।

মন খারাপ। ফুফুতো-ভাই বলে পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখেছে তাকে কে একজন ; আজ সকালে পেয়েছে সে চিঠি। সকলেই নাকি জানে কী ব্যাপার, এ রহস্য বুঝলও সবাই। মেট্রন নাকি ভুরু টেনে বলেওছিলেন 'ফুফুতো-ভাই এতকাল তোর আছিল কোথায় লো ? তার নামগন্ধও শুনি নাই কখনো। তা চিঠি পাইছস, পাইছস, কিন্তু লিখতে পারবি না তা বইল্যা।'

এ কথা শোনার্ পর মরিয়মের খিদে-তৃষ্ণা থাকে কী করে ? অন্তত একটি দিনেরও জন্য !

মরিয়ম ভাত খাবে না কিছুতেই, মেট্রনও ছাড়বেন না। শেষে মেট্রন উঠলেন রেগে। বললেন, 'ভাত ফেলতে পারবি না তুই, খাইতেই লাগবো। দাওতো বান্নুর মা অর মুখে ভাতের গরাস তুইল্যা।'

বান্নুর মা বুড়ি ; মরিয়মের মুখে জোর করে ভাতের গ্রাস ঠেলে দিল। মরিয়ম গালভরা ভাত নিয়ে দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ঘর-ভরা আর সকলে মজা দেখছে। মিছির বাঁদরের মতো কুঁৎকুঁৎ করে সকলের দিকে তাকিয়ে শুকনো ভাত মুখে পুরছে ; আর ভাত-ভরা মুখ হা করে সারাশরীর কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হেসে উঠছে। মরিয়মকে জব্দে ফেলে তার বড়ো ফুর্তি।

মেট্রন পিছন ফিরতেই থু থু করে মুখের ভাত মাটিতে ফেলে দিয়ে মরিয়ম উঠে দাঁড়াল।

মিছির চিৎকার করে উঠল, 'মেট্রন মা, মরিয়ম কিন্তু খাইল না, উইঠ্যা যায় গিয়া।'

মেট্রন ঘুরে দাঁড়ালেন। মরিয়ম বসে পড়ল। বান্নুর মা আবার তার মুখে ভাত তুলে দিল, মরিয়ম দু-হাঁটুতে মুখ ঢাকল।

এইভাবে চলল খানিকক্ষণ। মেট্রন পিছন ফিরতেই মরিয়ম উঠে পড়ে, মিছিরন অমনি ডাকে মেট্রন মাকে। মেট্রন হুমকি দেন, মরিয়ম কাঁদে। আর মিছিরন ভাতে-ঠাসা মুখ হা করে নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়ে। অদ্ভুত তার এই হাসি, বড়ো বিশ্রী। মন কেমন বিরক্তিতে ভরে উঠল।

মেট্রনকে বললাম, 'না খায় মরিয়ম, না-ই বা খেলো একদিন ; কী আর হয়েছে তাতে ?' পায়চারি করতে লাগলাম আম-কাঁঠালের তলায় তলায়।

এই মিছিরনের হাসি এত ভালো লাগত ; ওর কথা, গান শোনবার জন্য

কত আগ্রহ থাকত! আর আজ কেন বদলে গেল তার ভাব-ভঙ্গি-সুর—সবই একসঙ্গে একই সময়ে। এদের কলরব কোলাহল-মুখরিত আঙিনাটুকুতে নিজেকে মিলিয়ে রেখেছিলাম এতদিন; কিন্তু আজ আর পারছি নে। মনে হয় ছুটে চলে যাই কোথাও জনমানবহীন নিস্তব্ধ নিরালায় বসি গিয়ে খানিক। কেন এমন হয়?

মাথার উপরে ডালের ভিতর থেকে কোকিল একটি ডেকে উঠল কুহুঃ কুহুঃ—।

স ঞ্চা রী

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩। মঙ্গলবার সকাল :

১০ই থেকে গান্ধিজি অনশন শুরু করেছেন ২১ দিনের জন্য।

এলা বলে, 'ভালো লাগছে না কিছু। এই কয়টা দিন আপন মনে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। সকাল থেকে খাওয়া-রান্নার হই-হল্লা বাদ দাও। চলো দিনান্তে হবিষ্যান্ন করি আর সুতো কাটি।'

'বেশ তো।'

মায়া বলে, 'এটা নিশ্চয়ই একটা জেদ আপনাদের। নয়তো সারাদিন না খাওয়ার কী মানে হয়?'

সন্ধে .

রূপজান জলিলের মার কাছে বসে বসে কাঁদছে। কাল ফাইলে সে সাহেবের কাছে 'লালিশ' জানিয়েছিল, 'মিটিন' হয়েছে, তা জুতো পাবে না কেন রূপজান। পুরুষ 'মেট'রা তো পায়। সাহেব হেসে বলেছিল, 'মেয়েমানুষে আবার জুতো পরবে কি?'

১৭ই ফেব্রুয়ারি। বুধবার রাত সাড়ে নটা :

বাইরে চাঁদের আলো ফুটফুট করছে। মিলনী-মা থাকলে বলতেন 'আহা, জোছনায় যেন ফটিক ফুটছে গো!'

খাটের পাশে মাথার দিকে একটা চেয়ারে কেরোসিনের লণ্ঠনটি রেখে মশারির ভিতর ঢুকেছি। অন্যেরাও যে যার মশারির ভিতর ঢুকেছে; মায়া, ভবানী ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদিকে মিছিরন কম্বলের ভিতর থেকে ডেকে ডেকে অল্প বয়সের মেয়েদের সঙ্গে কী-সব রসিকতা জুড়েছে, টের পাচ্ছি তাদের হাসির সুরে। দূরে কোথায় যেন বাজছে খোল, করতাল ঝমঝম করে। ভাবী ডেকে উঠলেন—'ও রসীদ, শুনছো, ওদের ফাগুয়া লাগি গেছে।'

আজ এসেছে সরলা নামে এক হাজতি, নাটোর জেল থেকে চালান হয়ে। 'সেশনে' মামলা উঠেছে তার। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। মুখের, গলার, বুকের

হাড়গুলি সব যেন ঠেলে ঠেলে উপরে উঠেছে ; সেই-সব হাড়ের গায়ে পাতলা চামড়া চিমসে লেগে আছে। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে— উঠতে বসতে ধোঁকে সে। গাঁ থেকে একজন ওকে এনে আর একজনের কাছে দেয় ; বলে— 'থাক এখানে, এর ঘর সংসার দেখ, ভালো খাবি, পরবি, সুখে থাকবি।' গত শ্রাবণ থেকে তারই সংসার করে সরলা। দু-মাস বাদে একদিন ভোরে সেই লোকটি মারা যায়। মারা যাবার পর বালিশের তলা থেকে পড়শিরা একটুকরো কাগজ পায় ; তাতে লেখা : 'এই বিধবা মেয়েলোকটি আমায় বিষ খাইয়েছে, তাই আমি মারা যাচ্ছি।'

কোনো রকমে কথাগুলি শেষ করেই সরলা বুকে দু-হাত চেপে ঝুঁকে প'ড়ে হাঁপাতে থাকে। অদৃষ্ট নিয়ে দুঃখ করবার শক্তিটুকুও তার নেই। এর উপরে কপালে হয়তো ঝুলছে বিশবছরের জেল।

সু বলেন, 'শাস্তি নেবার শক্তি থাকলে তবেই তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

'তাই কি ? কিন্তু হয় কই ?'

সু বলেন, 'নয়তো, এ শাস্তি অত্যাচার।'

১৮ই। বৃহস্পতিবার সকাল :

বিছানায় শুয়ে আছি, ভাবী মশারি তুলে আমায় ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'এ রানীদি, উঠো, উঠো ; খবরের কাগজটা পঢ়ি লেও। নয়টার সময়ে কাগজ ফিরি লিই যাবে, জমাদার বলল।'

উঠে বসলাম।

খাটুনি-ঘরে ঝগড়া করছে মিছিরন জলিলের মার সঙ্গে, 'আমি কেনে তর দরদের বন্ধু হইতে যামু ? তর দরদের বন্ধু বানু, তর দরদের বন্ধু মরিয়ম, তর দরদের বন্ধু বানুর মা।'

চৌবাচ্চা পরিষ্কার করে সকলে পালা করে। আজ ছিল জলিলের মার 'পালি'র দিন। মিছিরন বুঝি ঠাট্টা করেই বলেছিল 'শীত কাইল্যা দিন— আহা, আহা, তুই বইস্যা থাক, আমিই দিমু অনে চৌবাচ্চা ধুইয়্যা।' মিছিরনের চোখমুখের ভাবভঙ্গিতে জলিলের মা চটে যায় ; বলে, 'ও হো হো হো ; কী আমার দরদের বন্ধুরে!' আর যাবে কোথায় ? দেখতে দেখতে দুজনের গলা উঠতে উঠতে সপ্তমে উঠল, কথাবার্তার খেই হারাল।

দুপুর :

চরকা কাটছিলুম বিছানায় বসে। বারান্দায়, ঘরে আরো ছয়খানা চরকা ঘুরছে বিচিত্র সুরে। এলা এসে পাশে শুয়ে পড়ল চাদর গায়ে জড়িয়ে। বললাম, 'শুয়ে পড়লি যে এ সময় ?'

'শোব না তো কি ঘোড়ার ঘাস কাটব ?' এলা রুখে উঠল। একটু আগেই সে চরকা কাটছিল বারান্দায়। বুঝলাম চরকা বেদখল হয়ে গেছে। টেকো থেকে নাটাইয়ে সুতো জড়িয়ে চরকা খালি করে দিলাম। এলা উঠে চরকা নিয়ে আবার বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

নেপালি মেয়ে গঙ্গামাঈ সবে বাংলা বলতে ধরেছে। দুরন্ত ছেলে দাজু, সবে হাঁটতে শিখেছে। মার কোলে শান্ত হয়ে বসে দুধ খাবার চেয়ে ভাঙা টিনের মগটা নিয়ে খেলা করতেই ঝোঁক বেশি তার। গঙ্গামাঈ দাজুর পিঠে গোটা দুই-তিন কিল বসিয়ে হাত ধরে হিঁচকে টেনে বললে, 'হারামজাদি, কার পেট ভরবে ? আয়, খেয়ে লে মা শিগগির।'

বিকেল :

জেলারের বাড়ির দোতলায় চিকফেলা বারান্দার ভিতর থেকে একটি 'মেট' উঁকি মারতেই মেট্রনের চোখে ধরা পড়ে যায়। —'কে রে ! বড়ো রস লাগছে, না ? শুয়োরের হাড্ডিটা কোথাকার।' খ্যান্‌খ্যানে গলায় বলতে বলতে মেট্রন দু-পা এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে, মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন ; যেন এক্ষুনি চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি দেন আর কি। পরক্ষণেই, সে নাগালের বাইরে উপলব্ধি করে, শুদ্ধ-ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হারামের বাচ্চা হারাম তুমি।' অতদূরে এত জোর-গালি পৌঁছল কিনা সন্দেহ, আর পৌঁছলেও সে যে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল না চিকের আড়ালে গাল শুনতে তা নিঃসন্দেহ।

১৯শে। শুক্রবার দুপুর :

খাটুনি-ঘরের পাশ দিয়ে আসতে কানে এল, মিছিরন দুঃখ করছে সঙ্গিনীদের কাছে : 'কপালও আমার খারাপ ছিল না, অদেষ্টও না। নিজের দোষেই আমি নিজে মইলাম রে ভাই— এই কথা কই কারে ?'

কদমমণি খুশিতে দুলতে দুলতে হাতের আঙুল গুনে বললে, আমি বাবা কাটিয়ে দিয়ে এলোম বলে। আর আমার বাকি আছে মোটে দু-বছর; কাত্তিকে আট, আঘনে নয়, পোষে দশ— মোট দু-বছর দশমাস।

জানালার কাছে বুঝিবা অনেকক্ষণ ধরেই বসেছিলাম চুপ করে। এক সময়ে কাঁধে হাত পড়ল— দেখি, ননীদি এসে দাঁড়িয়েছেন; বললেন, 'কী এত চিন্তা করছেন, চলুন একটু বাইরে হাঁটি গিয়ে।'

২০শে। শনিবার সকাল:

খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হেডলাইন—'অনশনের নবম দিবসে মহাত্মাজির স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি।' 'দেহ ও মন অবসাদগ্রস্ত।' স্টেট্‌স্‌ম্যান লিখেছে—'Heart action feebler'। সকাল থেকে সকলেরই মন ভার। ননীদি এতক্ষণ শুয়েছিলেন, এবারে স্নান সেরে এলেন। যমুনা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মায়া কাতরমুখে বিছানায় বসেছিল, আর পারে না বসে থাকতে, শুয়ে পড়ল। এলা প্রতিদিনকার মতো চরকা কাটছে, শান্তি বই পড়ছে, নন্দিতা ব্লাউজে ফোঁড় তুলছে। ভবানী উষাদি রান্নায় ব্যস্ত। শৈলদি, সুষমাদি স্নানের জোগাড়ে আছেন। ভাবী খোলা চরকাতে মিনিট চারেক সুতো কাটছেন আর উঠে উঠে চার দিক ঘুরে ঘুরে দেখে আসছেন—কোথায় কে কী করছে না করছে।

২১শে। রবিবার সন্ধে:

দুপুরে সব কয়েদিদের নিয়ে প্রার্থনা করা হল—মহাত্মাজির স্বাস্থ্যের উন্নতি কামনা করে। গুরুদেবের গান হল কয়েকটি। বড়ো ভালো লাগল যখন সবাই গাইছিল—'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।' কিন্তু সব শেষে যখন গান হল 'সমুখে শান্তিপারাবার'—কেমন করে উঠল মন। 'হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়—বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়, পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার;'—এই কি পার্থিব প্রাণভিক্ষার গান? যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রার্থনায় বসেছি সবাই, তার মানে যেন কেমন বদলে গেল। বেখাপ্পা সুর নিয়ে উঠে এসে দু-হাতে চোখ জড়িয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

জানালার পাশে নিরালা বারান্দার কোণে সাবিত্রীদি তার শিশুপুত্র সতুকে কোলের কাছে দাঁড় করিয়ে চাপা গলায় বলছেন—'বল তো বাবা, "জয়, মহাত্মা গান্ধী কি জয়"।' সতু দু-হাত তুলে লাফিয়ে উঠল—'দয়'। সাবিত্রীদি বলছেন—'বল তো বাবা, "স্বাধীন ভারত কি জয়"।' সতু আরো লাফিয়ে হাত তুলে বলল—'দয়'। বড়ো মিষ্টি লাগল।

২২শে। সোমবার সকাল :

বিছানায় বসে চরকা কাটছি ; লেবুফুলের সুগন্ধে প্রাণ আকুল করে দিচ্ছে, টেনে টেনে নিশ্বাস নিয়েও যেন তৃপ্তি হচ্ছে না। অনেকটা কামিনীফুলের মতো গন্ধ।

বারান্দায় ফাইলে বসেছে সবাই। 'সাহেব' আসবেন আজ। বোনা হাতে করে যে যার জায়গায় বসে অনর্গল কথা কয়ে চলেছে। মিছিরন বলছে, 'জানস্, কত রকমের মাইয়ামানুষ আছে ? হস্তনী, শঙ্খনী, পদ্‌মনি, দুখ্‌মনি, চিন্তনী। হস্তনীরা কুঁজির মতন খায় আর গইড়ায়, দুখ্‌মনির দুঃখে দুঃখেই জীবনটা যায়। শঙ্খনী হয় ঝগড়াইটা, কেবল ছোবল দিয়া বেড়ায় ল্যাজে মুড়ায় এক কইর‍্যা। ভারি বজ্জাৎ শঙ্খনীরা, বুঝলি রে ? এই আমাগো সৈয়দাটা মনে হয় শঙ্খনীই হইবো বা।'

'আর, পদ্‌মনিরা কী রকম হয় মিছিরন ?'—এপাশ থেকে ডেকে জিগগেস করলুম।

মিছিরন একহাত জিভ কেটে সলজ্জভাবে নড়ে চড়ে বসল। বলল, 'পদ্‌মনিরা কেবল খায় আর ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা বেড়ায় ; আর কিছু করে না।'

'চিন্তনীরা ?'

'তারা কাইলকারটা ভাইবা আইজ খায়।'

বিকেল :

মরিয়মের আবার একটি চিঠি এসেছে। এবারে 'প্রেয়সী' সম্বোধন করে তাকে কে যেন লিখেছে। আফিস থেকে মেট্রনকে জানিয়েছে 'মেয়েটির যদি স্বামী বেঁচে থাকে ও এই চিঠি যদি তারই লেখা হয় তবে যেন মেট্রন আপিস থেকে চিঠিটা নিয়ে যায়। স্বামী খুন করার 'কেস্' মরিয়মের—এই প্রশ্ন ওঠে কী করে !

মেট্রন জিগগেস করলেন, 'কে তোকে লিখতে পারে বল্ না ? তবেই তো আনতে পারি চিঠি। কান্নাকাটির দরকার কী ?'

সুরাতন মুখে কাপড় দিয়ে মরিয়মকে ঠেলা মেরে বলল—'বল না, খালাতো-ভাই, নাম গনিমণ্ডল।'

সত্যিই 'গনিমণ্ডল' নামই আছে চিঠিতে। ওরা জানল কী করে ? তবে কি আগেরই বলা-কওয়া ছিল নাকি কিছু ? মেট্রন চলে যেতে সুরাতন হেসে গড়িয়ে পড়ল—এলার গলা ধরে বলল, 'দিদি, এই সেই 'মেট'টা ; খালাস পাইয়া 'গনিমণ্ডল' নাম নিয়া চিঠি লিখছে। আগেই জানাইয়া গেছিল যে।'

২৩শে। মঙ্গলবার সকাল :

সরলাকে নিয়ে আর পারা যায় না। ডাক্তার তার টিকেটে লিখে দিয়েছে 'sick'। হাসপাতালের লোহার খাট, গদি, বিছানা, চাদর, বালিশ, মশারি—সবই পেয়েছে সে। মেট্রন তাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে বললেন—'নাও, "সিক" হইছ, এইবার চুপচাপ শুইয়া থাকো। এইখানে সেইখানে ঘোরাঘুরি কইরো না।'

সরলা বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে না। দেখতে না দেখতে উঠে এদিকে-ওদিকে চলে যায়। একটু আগেই উঠে গেছে সে ; বারণ করলুম শুনল না। বলে 'মাইন্ষে নি পারে কখনো এমনি কইরা শুইয়া থাকতে চৌপহর ?'

একফাঁকে কলতলায় গিয়ে সরলা পা ধুচ্ছে তো পা-ই ধুচ্ছে ; শেষ আর হয় না পায়ে জলঢালা। মিটিন রূপজান দেখতে পেয়ে সরলাকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল। মিটিনের দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন সে পাল্লা দিতে ; বাঁ-হাত মিটিনের হাতে ধরা আর বাকি শরীরটা সরলার ছেঁচড়াচ্ছে মাটিতে। মিটিনের রাগ থামে না। কোনোরকমে বারান্দায় সরলাকে এনে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কতবার বারণ করি, তুই উঠবি না এই শরীর নিয়ে, কোথায় পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে মরবি ! শেষে তো মিটিনকে নিয়েই আপিসে টানাটানি করবে। তোর মা আছে না বোন আছে এখানে যে তোকে দেখবে ? নিজের শরীর নিজে বুঝবি না তো বুঝবে কে ? এই এখন যদি আমি না দেখতাম তো কী কাণ্ড হইত বল দেখি ? ইও-বাথে নর্দমা, উও-বাথে চৌবাচ্চা, মাঝখানে

দু-পা মেলে দাঁড়িয়ে পায়ে যে জল ঢালছ তুই, পড়ে যদি যাইতিস— কে দেখত তখন ?'

সরলা নাকি সুরে কুঁই পাড়তে পাড়তে বলল, 'ওরে বাবা রে, তুমি আমারে অমন কইর‍্যা রাগ দেখাইও না রে। আমার শরীরে কিছু নাই, ফুঁ দিলে বলে পইড়্যা যাই ; তার উপরে এমন রাগ দেখাইলে আমি মইর‍্যাই যামু— উঃ-হুঃ-হুঃ— ।'

মিটিন ফুলতে ফুলতে হাসপাতাল থেকে দেওয়া কতকখানি থক্‌থকে বার্লি এনে দিল নুন দিয়ে গুলে। সরলা বার্লির দিকে তাকিয়ে হাপুস নয়নে কান্না জুড়ল ; এ বার্লি তার গলা দিয়ে যায় কী করে ? বলে, 'এই খাইয়া নাকি আমার শরীরে রক্ত হইব ; এ-ও একটা কথার কথা ? যেটুকুও রক্ত আছিল গায়ে— কম্বল গায়ে দিয়া শুই— কম্বলই শুইষ্যা নিল সব। সর্বনাশা আমার কী কইর‍্যা গেল রে, মরা নিজেও মরল, আমারেও মাইর‍্যা গেল রে·· !'

দুপুর :

দুটি পায়রা বাসা বাঁধছে খড়কুটো দিয়ে বারান্দার থামের মাথায়। এর আগেও দু-বার বাসা বেঁধেছে তারা একই জায়গায়। দু-বারই বারান্দার ঝুল ঝাড়তে গিয়ে মরিয়ম, কদমমণি ফেলে দিয়েছে ডিম সমেত বাসাটি তাদের। এবার তিনবারের বার। একটি পায়রা কোথা থেকে খড়টি, কুটোটি, শুকনো আমপাতাটি ঠোঁটে করে এনে আরেকটির ঠোঁটে গুঁজে দিচ্ছে, আর সে সেটি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে বাসার চার দিক ঘিরে। পছন্দ না হলে সেই কুটোটি নীচে ফেলে দিচ্ছে। অন্যটি আবার উড়ে যাচ্ছে খড়কুটোর খোঁজে। কিছুক্ষণ থেকে দেখি সে কেবলই শুকনো ঘাস-ফুল নিয়ে আসছে। এ ঘাস-ফুল অনেক আছে আমাদের ওখানে, পোষা ঘেসো কচ্ছপগুলো খেত রোজ এর পাতা। কিন্তু এখানে কোথায় তা ? বাইরে গিয়ে পায়রাটির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলুম ; দেখি দক্ষিণ দিকে উঁচু দেয়ালের ওপাশে— ঘরের একটি চৌকো ছাদ, ইটের গাঁথনি দেওয়া, বহু পুরনো। সেই ইটের ফাঁকে উঠেছে নানা জাতের ঘাস-ফুল, অশথ চারা, আরো কত কী ! তা থেকে বাসা-বাঁধবার রসদ জোগাচ্ছে এই পায়রাটি !

সম্বন্ধে :

বিকেলে পায়চারি করছি রান্নাঘরের পাশে সরু রাস্তা ধরে। মেট্রন কাছে এসে গালে হাত দিয়ে ‘ফচ’ করে মুখে একটা শব্দ করে হেসে দৃষ্টি নামিয়ে ঘাড় হেলিয়ে বললেন, ‘কী আর কমু, কত রকমের ব্যাপার এখানে ঘটে নিত্যনৈমিত্তিক।’

জিগগেস করলাম, ‘কী ঘটল আবার নতুন কিছু?’

মেট্রন একবার ঘুরে ডাইনে বাঁয়ে দেখে নিয়ে আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, ‘কাল সকালে রসুনের ছেঁড়া শাড়ি বদল দিবার লেইগা টিকিটটা বাইর কইরা দিলাম এক ‘মেটে’র হাত দিয়া। বিকালে পুরান শাড়ি বদলাইয়া ‘মেট’ নতুন শাড়ি আর টিকিটটা ফেরত দিয়া গেল। শাড়িটা রসুনরে ডাক দিয়া তার হাতে দিলাম, টিকিটটা নিয়া গুদামে ঢুকলাম বাকসে তুইল্যা রাখতে। হঠাৎ কী মনে হইল তারিখটা দেখি তো ঠিক আছে কি না? উলটাইয়া দেখি টিকিটের পাশ দিয়া কী যেন সব লিখা। আরে মর, এইভাবে বাঁকা কইর‍্যা টিকিটে লেখে ক্যান, সুজাসুজি না লেইখ্যা? মনে মনে উঠলাম চইট্যা গুদামিবাবুর উপরে। আলোতে আইন্যা লেখাটা পড়লাম। ওমা! দেখি কি— এ তো কাপড়ের হিসাব না, কোন্ মেট যেন রসুনরে কি লেইখ্যা রাখছে। ডাকলাম— আয় তো-রে রসুন, শুইন্যা যা তো এইদিকে। পরেই আবার ভাবলাম অরে জিগাই কি, অর হাতে তো পড়ে নাই টিকিট। ও জানবই বা কোইত্থিকা।’

‘কী লেখা ছিল টিকিটে?’

‘বিশেষ কিছু না। লিখছে— ‘তোমার বাড়ি কই তা তো জানি না, আমাকে জানিয়ো। আমি এই জেলেরই’। লইয়া গেলাম টিকিট আপিসে।’

‘কে লিখেছে প্রমাণ পেলেন?’

‘হ্যাঁ, সে নিজেই স্বীকার গেছে ডেপুটিবাবুর কাছে। বলে, ‘কী জানি, আমার হাত উসখুস করছিল, লেইখ্যা দিইছি।’ পনরো দিনের ‘মাপি’ কাটা গেল তার।’

এলা আজ নাছোড়বান্দা। বলে, ‘কী লেখ তুমি রোজ দেখবই।’ খাতার পাতাগুলি উলটেপালটে বললে, ‘ওরে সর্বনাশ, আর যদি মুখ খুলি আমি।’

যাই— ননীদি 'কালান্তর' পড়ে শোনাচ্ছেন কয়েকজন মেয়েকে ; গিয়ে শুনি খানিক।

মহাত্মাজির জন্য বড়ো আকুল হয়ে আছি। দেখি কাল সকালে আবার কী খবর পাই কাগজে।

২৪শে। বুধবার সকাল :

অভিজিৎ লিখেছে : আমাদের শিমুল গাছে ফুল ফুটছে। গুরুদেব দাদুর পলাশ গাছেও অনেক ফুল ফুটছে। আমি রোজ সর্ষের তেল মাখি। ভালো ছেলে হয়ে গেছি। বাবা আমায় বলেন 'মাই গুড সান'।

দক্ষিণ হাওয়া জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে এসে মুখের উপর স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। চকিত হয়ে মুখ তুললাম। লেবু-ফুল আর আমের মুকুলের সুবাসে ছেয়ে গেছে চার দিক। আমডালের ভিতর থেকে কোকিল একটি ডাকছে, কুহুঃ, কুহুঃ, দূরে কোথা থেকে সঙ্গী তার উত্তর দিচ্ছে কুহুঃ, কুহুঃ— ক্ষীণস্বরে ভেসে আসছে বাতাসে থেকে থেকে।

ঘরের ভিতরে কয়েদিদের ফাইল ঝাড়া নিচ্ছে মেট্রন, জমাদারনি, মিটিন ও পাহারাওলিরা মিলে। অন্যান্য কয়েদিরা আছে খাটুনি-ঘরে তালাবন্ধ।

কাল বিকেলে লেবু ঝোপের আড়ালে কদমমণি একখানি সাবান জমাদারনির হাতে গুঁজে দিল। মাসে একটিমাত্র সাবান পায় কয়েদিরা— গায়ে মাখতে, চুলে ঘষতে। সেই সাবানটি যদি এমনিতর দানের কাজে খয়ে যায় তবে দুঃখের কথাই। আবার ভাবি, বিশবছরের কয়েদি সব— সকাল থেকে রাত অবধি তাড়না খেয়ে খেয়েই জীবন কাটে এদের। কারো কাছ থেকে ভালো মুখ পায় না বড়ো। তাই নিজেদের সাবান-তেলটুকুর বদলে যদি ক্ষণিকের জন্যও একটু দরদ পায় কারো কাছে, মন্দ কী ?

সবকিছু ঝেড়ে ঝুড়ে দেখার পর মেট্রন হাতে করে নিয়ে এলেন ছোট্ট ছোট্ট কাগজের মোড়ক। বামুর 'ফাইলে' পাওয়া গেছে আট-দশটা গোলমরিচ। রূপজান বললে, 'সেদিন দিদিদের রসদ দেবার সময় ধনিয়া-গোলমরিচের কাগজটা মাটিতে পড়ে যায় ; বামু তা কুড়িয়ে নেয় ; এই গোলমরিচ কয়টা সেদিনেরই। মিছিরনের ফাইলে পাওয়া যায় দুটি কাঁচালঙ্কা, জামিরনের ফাইলে একটু তেঁতুল। নেছার ফাইলে কয়েকটা বাংলা সাবানের টুকরো ; বলল,

'দিদিরা দিইছিল কাপড় কাঁচবার লাগি।' আর খতে বেওয়ার ফাইলে পাওয়া যায় একমুঠো আতপ চাল— চেয়ে নিয়েছিল দিদিদের কাছ থেকে, চিবিয়ে খাবে; বলে, 'দাঁতগুলি সুরসুর করে, দুইটা চাউল পাইলে চিবাইয়া বাঁচতাম।'

সতুকে সাবিত্রীদি গুম গুম করে কিল বসিয়ে দিলেন পিঠে কয়েকটা— দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে আর পারেন না; বড়ো বিরক্তই হয়েছেন আজ নিশ্চয়। দাজুকে নিয়ে বসেছে গঙ্গামাঈ বাঁধানো ঢাকা-দেওয়া কুয়োর পারে। তারও দুরন্তপনার সীমা নেই। চোখে চোখে রাখতে হয়। তবু এরই মধ্যে একদিন দাজু পড়ে গিয়েছিল জলভরা চৌবাচ্চায়। ভাগ্যিস জবার নজরে পড়ে, নইলে কি কাণ্ডই হত সেদিন?

মায়া জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বললে, 'সত্যিই তো, গান্ধিজিকে ছেড়ে দিয়ে দেখলেই তো পারে। উনি যদি আবার আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন নাহয় আবার ধরলেই হয়!'

ননীদি বললেন, 'মনে হচ্ছে, গান্ধিজিকে ছেড়ে দিলেই যেন গভর্নমেণ্ট প্যারালাইজ্‌ড হয়ে যাবে, ফিরে তাঁকে ধরবার আর ক্ষমতা থাকবে না। একে তো প্রেস্টিজ বলে না, এ হচ্ছে জেদ!'

ভাবী গল্প করছেন জলিলের সঙ্গে। বলছেন, 'আচ্ছা জলিল, আমরা এখানে আসার পর তো তুমি কত জিনিস শিখলা; মাছ চিনলা, কত তরকারির নাম জানলা, ডিম দেখলা'—

জলিল বলল, 'ডিম, ডিম আমি আগেও দেখেছি। কবুতরের ডিম, টিক্‌-টিকির ডিম—'

ধোপা এসেছে। এলা বললে, 'সতরঞ্চিটা ময়লা হয়ে গেছে, ধোপাবাড়ি দিই। যাবার সময়ে বিছানা বেঁধে নিয়ে যেতে হবে তো? কী বল?'

যাবার সময় হতে হতে আরো কত কতবার ধোপার হাতে কাপড় দিতে হবে— ধোপার হাত থেকে কাপড় নিতে হবে; কিন্তু বিছানা বেঁধে নিয়ে যাবার সমস্যা নিয়ে এলার চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আর বলতে হল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতিই জানালাম। তবে ভাবনা হল মনে এই এতদিন এখানে-ওখানে বসব কী পেতে?

নন্দিতা একটা বড়ো মশা ধরে কাগজের বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিল, মেট্রনকে

দিল; বলল, 'ভেবেছিলাম ডাক্তারবাবুকে উপহার পাঠাব, কতখানি যত্ন নেন কয়েদিদের স্বাস্থ্যের প্রতি যে, শেষটায় গোরুর মশা এসে খেয়ে যায় রাতভোর কয়েদিদের গায়ের রক্ত। একটু ধূপধুনো দেবার পর্যন্ত ব্যবস্থা করেন না এঁরা। কত বড়ো 'ডাঁশ'! দেখুন একবার, কাল রাতে ঢুকেছিল মশারির ভিতর।'

দুপুর :

চায়ের প্যাকেটে একটু রুপোলি রাংতা জড়ানো ছিল। বান্নু, মরিয়ম, গঙ্গা, ওরা দুপুরে বসে বসে তা দিয়ে গয়না গড়িয়েছে; কেউ কানে দুলিয়েছে মাকড়ি, কেউ পরেছে নাকছাবি, কেউ-বা ঝুলিয়েছে ঠোঁট-ছাপানো বেশর। জলিলও একটি নোলক লাগিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হেসেই সারা।

রাত্রি :

রাধার শরীর খারাপ। কয়দিন থেকেই মাথা ধরে— জ্বর হয়। বলে না কিছু মেট্রনকে, নিজের কাজ করে যায় আপন মনে। বলে, 'কাজ কী বাপু বলে? বললেই তো ডাক্তার 'সিক' লিখে দেবে, আর ঐ বার্লির জল খেতে খেতে প্রাণ বেরবে।' সন্ধেবেলা কম্বল বিছিয়ে বাঁ-হাতে মাথা রেখে ঘরের কোনায় শুয়ে ছিল সে। পাশে গিয়ে বসতে রাধা বললে, 'আজ কী খবর দিয়েছে কাগজে গান্ধিজির শরীর সম্বন্ধে? কেমন আছেন তিনি?' রোজই এই সময়টিতে একবার করে জিগগেস করে সে এই কথা। বললাম, 'লিখেছে তো, আজ তিনি অনেকটা ভালো আছেন। সংকটজনক অবস্থা কেটে গিয়েছে বলেই আশা করছেন ডাক্তাররা। তবে কি জানো, বয়েস তো হয়েছে— তাই বলা যায় না কিছু।'

রাধা বললে, 'তা উনি কি না জেনেশুনেই উপোস করছেন? ভালোই থাকবেন।'

বললাম, 'তবুও ধরো, শরীর যখন অক্ষম হয়ে পড়ে তখন যে কিছুতেই কিছু হয় না।'

রাধা তড়াক করে উঠে বসে বলল, 'তা হতে পারে; কিন্তু ওঁর কথা আলাদা, উনি সবই জানতে পারেন আগে থেকেই। মহাত্মা মানুষ— এ তাঁর লীলা দেখাচ্ছেন শুধু!'

২৫শে। বৃহস্পতিবার সকাল :

ভোর থেকেই এলোমেলো বাদলা হাওয়া দিচ্ছে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, পুব হতে। গাছের পাকা, আধপাকা, সবুজ, কচি সব পাতাগুলিই ঝরে পড়ছে সে হাওয়ার দাপটে। আমের মুকুলে ছেয়ে গেছে গাছের তলার সবুজ ঘাস। হালকা মেঘে আকাশ ঘোলাটে। থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা।

নন্দিতা বারান্দায় সতুকে লুফে নিয়ে নিয়ে গাইছে—'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।'

মাসকাবারি পাগলাঘন্টি পড়তেই কয়েদিরা দৌড়ে এসে নম্বরে ঢুকল। চুন-আলকাতরায় মাখা সকলের পা-হাত। আই. জি. আসবেন শিগগিরই ; তাই চুন-আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে শোভাবর্ধন করা হচ্ছে জেলখানার।

জুতোর উপর দারুণ ঝোঁক দাজুর। কার দুটি স্যাণ্ডেলে তার খুদে দু-পা ঢুকিয়ে কোমর বেঁকিয়ে ঘসর ঘসর ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে ; রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা। আমরা এসেও দেখেছি দিব্যি নাদুস নুদুস চেহারা ছিল তার।

রাধা বললে, 'আরো মোটা ছিল দাজু। এই মোটা মোটা হাত-পায়ের গোছা যখন এল এখানে ; আর গাল দুটো কী লাল টুকটুক করছে— যেন রক্ত ফেটে পড়ছে মা-বেটা দুজনেরই। সেই লাল রঙ কোথায় যে গেল ?'

রাধার বাড়ি জামালপুরে, মিষ্টি তার কথার টান।

সরলা উঠে জানালার ধারে যেতেই মিছিরন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মিটিন, মিটিন, তর উগি কিন্তু উঠল রে।'

এরা অনেকেই 'র' কে 'অ' বলে আর 'অ' কে 'র' বলে। এরা 'রুল' দিয়ে গরম জামা বোনে, 'আগ' করে ভাত খায় না, 'ওগে' ধরলে কান্নাকাটি করে— ডাক্তার বার্লি দেয় খেতে, তবুও 'উটি' দেয় না একটিও !

দুপুর :

মেঘে ছাওয়া আকাশ। ঘরের ভিতরে আবছা আলো। জানলার ধারে বসে গল্প টুকছি বকাসুরের। হঠাৎ যেন ঝকঝকে আলোতে ভরে গেল ঘর-বারান্দা। মেঘের ফাঁকে সূর্য দেখা দিল ক্ষণিকের জন্য। কী উজ্জ্বল আলো, কী সুন্দর আর কী অদ্ভুত স্নিগ্ধ তীব্র ! বারান্দায়-পড়া আলোটুকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম— তুলনা করলাম অন্যদিনকার এইসময়কার রোদ্দুরের

আলোর সঙ্গে। হয়তো বা এমনিই। শুধু আজকের আলোকে সুন্দর করে তুলেছে— তার মহিমা বাড়িয়েছে আকাশ-ছাওয়া ধূসর মেঘ। ক্ষণিকের জন্য ধরা দিল বলেই এ আলোটুকু এত দুর্লভ হয়ে উঠল!

সন্ধে :

বিকেলে বাগানে পায়চারি করছি। মেট্রন ডেকে ডেকে কয়েদিদের বললেন, 'আইজ তোদের একটা কাজ কমল রে। বাগানে জল দিতে হইব না, বৃষ্টিই দিল আইজ সে কাজ কইর‍্যা। এই লগে নিমগাছের পাতাগুলিও সব যদি নিত আইজকার হাওয়াতে ঝরাইয়া, বাঁচতাম আমি।' আই. জি. আসবেন ; বাগানের কোথাও শুকনো পাতা একটি পড়ে থাকবার হুকুম নেই। কয়দিন থেকেই অনবরত নিমপাতা ঝরে পড়ছে— এবারকার মতো তাদের পালা শেষ করে নতুনকে জায়গা ছেড়ে দিতে। কিন্তু জেলখানায় শীত-বসন্ত ঋতুর ধর্ম মানেই বা কে আর বোঝেই বা কে ? জমাদারনি একটা ঝাঁটা দিয়ে পাতা-ঝরে-যাওয়া নিমপাতার সরু সরু কাঠিগুলি জড়ো করে হাতে বেছে বেছে তুলতে লাগল। জিগগেস করলাম, 'কী হবে এ দিয়ে ?'

সে বললে, 'বাবা আমার রোজ ভাত খেয়ে এই কাঠি দিয়েই দাঁত খোঁটেন।' জেলারকে জমাদারনি 'বাবা' ডাকে।

নন্দিতা বললে, 'এত তো 'বাবা' 'বাবা' কর, তা বাবার ছেলের বিয়ে গেল একদিন তো খাওয়াল না কয়েদিদের!'

২৬শে। শুক্রবার রাত্রি :

দারুণ মশা। সন্ধের পরে বসে কিছু করবার জো নেই। ভন ভন করে নাকে কানে ঢুকে যায়। সুরাতন মশারির ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে এলার সঙ্গে গল্প করছে। বড়ো এক মশারির নীচে আমার ও এলার খাট পাশাপাশি। বললাম, 'পা-দুটোও ঢুকিয়ে নাও সুরাতন নয়তো মশা ঢুকবে। কাল রাতে ঘুমতে পারি নি মশার জ্বালায়।'

সুরাতন বললে, 'দু-একটা মশাতেই এই কথা কন আর আমরা যে মশারি ছাড়া শুই ; সারারাত কত মশা কামড়ায়—হাতে মুখে আর জায়গা নাই, মশার কামড়ে ফুইল্যা গেছে সর্বদেহ।' বড়ো লজ্জা পেলাম সত্যিই।

বিছানায় ঢুকবার আগে রোজই নম্বরটা একবার ঘুরে যাই— কে কী করে দেখি। আজও গেলাম। ঘুমন্ত জলিলকে বুকে নিয়ে তার মা ডানহাতে মাথা ভর করে ফিসফিস করে গল্প করছে মিছিরনের সঙ্গে। সৈয়দা চুল বেঁধে দিচ্ছে সুরাতনের। দিনে আজ সময় পায় নি। অন্ধকারে সিঁথি কাটতে গিয়ে বার বার বেঁকে যাচ্ছে আর সুরাতন ধমকে উঠছে—'সর সর, যত জ্বালা, নিজের চুল নিজেই বাঁধুম অনে, তর অত সোহাগ দেখাইতে লাগব না!' শুনে সৈয়দা মুখ কাঁচুমাচু করে। চুলবাঁধার কায়দা আনাড়ি হাতে এখনো ঠিক ধরতে পারে নি। কাছে গিয়ে হাতের লণ্ঠনটা তুলে ধরলাম। সৈয়দা পরিপাটি করে আঁচড়ে দেখে শুনে চিকণ সিঁথে কাটল। রূপজান নমাজ পড়ছে। এক-একদিন প্রহরে প্রহরেই সে নমাজ পড়ে। রসুন বসে বসে দু-হাঁটুতে মুখ গুঁজে ঝিমোচ্ছে। তার পাহারা এখন। সারাদিন খাটুনির পর আর পারে না জেগে থাকতে। বললাম, 'শুয়ে পড়ো, তোমার বদলি আজ আমি পাহারা দিই।' রসুন ঘাড় নেড়ে বললে, 'সে কি হয়? নিয়ম—আমাকেই ডেকে পাহারা জমা দিতে হবে। না হলে আপিসে কেস্ করে দেবে।'

নম্বরের ওদিকটায় সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু সরলা বিছানায় উঠে বসে গায়ের কাপড় খুলে পাঁজরা-বের-করা বুকে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আপন মনে মাথা নিচু করে কি যেন দেখছে। কী ভাবছে সেইসঙ্গে ওই জানে। এত রাতে এই নিরালায় কোন্ ব্যথা যে ওকে উতলা করে তুলল!

২৭শে। শনিবার সকাল:

মহাত্মাজির খবর: 'আত্মিক শক্তি বলে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার শক্তি অর্জন।'

দুপুর:

ভাবী বললেন, 'এ রানীদি, দেখছ দূরের ঐ গাছটার মাথায় কেমন ছায়া পইড়াছে? নীচে জল আছে বোধ হচ্ছে। ছায়াটি নড়ছে দেখো।'

বারান্দায় বসে মেট্রন কাজের হিসাব খাতায় তুলছেন। ভাবীর কথা শুনে বলে উঠলেন, 'হাচাই গো, ঐ বটগাছটার নীচে একটা পুষ্করিণী আছে।'

রূপজান বললে, 'দেখি তোমার চশমাটা ? আঃ— যেন শীতল লাগছে চার দিক। যাবার দিন আমায় দিয়ে যেয়ো এটা !'

জামিরন তাড়া লাগাল, 'কিলা কদমমণি, তর যে দেয়ালে চুনের গোলা লাগানো শেষই হয় না। পুতের বিয়া লাগল না কি ?'

কদমমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আর বিয়া— জেল-খাটা মার ছেইলার কি আর বিয়া হইব রে ?'

বিমলা— ছোটো জমাদারনি— নতুন জুতো পেয়েছে আপিস থেকে। উঁচু হিল-তোলা জুতো। দেখে দেখে বিমলা বড়ো মাপের জুতোই নিয়ে এল। বলে, 'দাম যখন একই তবে বড়ো দেইখ্যা আনাই তো ভালো।'

সারাদিন আজ বিমলা সেই জুতো পায়ে দিয়ে চলা অভ্যেস করছে, আর থেকে থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। বিমলার মনে নানা অশান্তি। জোয়ান ছেলে কাজকর্ম করে না, ঘরে বসে দু-বেলা সমানে ভাত খায়; তাও কি কম সম ? বিমলা বলে, 'এই এতটি না হইলে পোড়ারমুখার পেট ভরে না।' তার উপরে মেয়ে প্রথম পোয়াতি, জামাই পাঠিয়ে দিয়েছে মেয়েকে মার কাছে। বিমলার বিরক্তির শেষ নেই। বলে—'যত আপদ বালাই জোটে আইস্যা আমার। মাইয়ার বিয়া দিলাম নিশ্চিন্ত হইলাম; আবার ক্যান্ আইস্যা ঘাড়ে পড়া। রাগে আমার শরীর ফাইট্যা পড়ে। কন কি গো ? জামাই আইছিল— একটা কথাও কই নাই মুখ ঘুরাইয়া।'

সরলা বসেছে হাসপাতালের ডায়েট সামনে নিয়ে। ভাতের কিনারে একটু আলু বাঁধাকপির ঝোল, একটু ডালের জল ও একটু দুধ। করকরে ভাতগুলি নাড়তে নাড়তে সরলা বললে, 'একটু নুন আছে নি আপনাগো কাছে ? দিবেন ?'

পাশে জামিনা দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললাম, 'একটু নুন এনে দাও তো ওকে রান্নাঘর থেকে।' সরলা বাঁ-হাত নেড়ে বলে উঠল, 'না, না, থাউক।'

'থাক্ কেন ?'

'না, কাউরে কইয়া দরকার নাই। কে আবার কালা মুখ কইর‍্যা উঠব —সেই উদ্দিশেই বলে আমি মইর‍্যা যাই।'

জামিনা সরলাকে ভেংচি কেটে ছুটল রান্নাঘরে নুন আনতে।

সরলা কপাল চাপড়ে নাকে কাঁদতে লাগল, 'হা ভগমান, এই খাওয়াইয়া

বলে শরীরে শক্তি করাইব। এই খইয়্যানি শরীরে শক্তি হয়। মুখে দিতে পারি না দুই মুঠা ভাত; তরকারিতে না দেয় একটু হলদি, না দেয় একটু মরিচ— মুখে সোয়াদ লাগে না; পাঁচ তরকারি দিয়া পাচনসিদ্ধ কইর‍্যা রাখছে! বান্দা কপির ডালনা কত সুন্দর হয় মাছের মুড়া দিয়া। রোগে ভুইগ্যা ভুইগ্যা কত কিছু খাইবার মন যায়। এই দুধটুকু থাকে বইল্যা দুইট্যা ভাত মুখে দিবার পারি। তাও আইজ বিকাল থেইক্যা বলে আমার হাসপাতালের খাওয়া কাটা যাইব। হইয়া গেল শরীরে আমার শক্তি, ছাহেন না'— বলে সরলা হাত-পা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। পরে জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে কুঁই পারে, 'ভগমানরে; তুই আমার কপালে এত দুঃখও লেইখ্যা রাখছিলি রে!'

নেছা ওপাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল, 'এত তো রোগে ভুগিস, কথা আর কামাই যায় না। ঐ যে কয়—"বইস্থা বুড়্যা পাট কাটে, ডাকে বুইড়্যা পাড়া ফাটে"।'

সরলা কান খাড়া করে বললে, 'ঐ দেখ্‌লা গো— আমার নামে আবার কে শোল্লক কাটল!'

সমাজবিধি নিয়ে কথা হচ্ছে। শান্তি বললে— সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে বিধবার বিয়ে প্রচলন না থাকার দরুনই সমাজের এত অধঃপতন। সরলাকে দেখিয়ে সে বললে, 'এই ধরুন-না এই-সব বিধবার যদি ফিরে বিয়ে দেওয়া হত, তবে কি এদের পরিণাম এই হয় কখনো?'

শুনে সরলা মুখ ঘুরিয়ে নিল, 'আঁউ, ছিঃ। আমাগো সা-গো মধ্যে বিধবা বিয়া-টিয়া নাই। হয়, অন্য সব জাতে হয়। কিন্তু আমরা হইলাম বলে বারেন্দ্র সা। সায়ের মধ্যেও তফাৎ আছে। বারেন্দ্র সা, রাঢ়ী সা, শুঁড়ি সা। এমন-কি শুঁড়ি সা-গো লগেও আমাগো জল-চল নাই।

খবর এসেছে কালই আসবেন আই. জি.। আপিস থেকে খবর নিয়ে মেট্রন এলেন ছুটতে ছুটতে। বললেন, 'চাপা, চাপা, অক্ষনই ভাটি চাপা।' গুদাম থেকে বের করে দিলেন সোডা, সাজিমাটি। একটা গামলাতে রেড়ির তেল ঢেলে কয়েকজন কয়েদিকে লাগিয়ে দিলেন জানালা-কপাটের শিকে তেল লাগাতে; রাধাকে বললেন, 'নাও নাও, আরো দুই জন কয়েদি লইয়া তুমি যাও, নম্বরটা মুইছ্যা ফালাও গিয়া।'

তাড়াহুড়ো পড়ে গেল চার দিকে। বসে খাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি দু-মুঠো ভাত মুখে গুঁজে যে যার পরনের শাড়ি-জামা ভাটিতে ফেলে গামছা জড়িয়ে লেগে গেল নানান কাজে। মেঘলা করে আছে আজও সকাল থেকে। তবু আগে জানতে পারলে ভালো হত। এখন এই অবেলায় কাপড় ভাটিতে সিদ্ধ করে কখনই বা কাঁচে— কখনই বা শুকোয়!

মিছিরন বললে, 'কাইল যদি জানতাম, রাত্রে তারা বাইন্দ্যা রাখতাম, দেখতাম কেমন কইর‍্যা বাদলা থাকত।'

শুধোলাম, 'সে আবার কী?'

মিছিরন তরতর করে ভাটির দিকে যেতে যেতে ফিরে বলল, 'হ, হ, তারা বান্দলেই কাজ হয়। এর আগের ভাটির দিনের আগের দিন মেঘলা কইর‍্যা আছিল। রাত্রে মন্ত্র পইড়্যা তল আঁচলের কোনায় 'তারা' বাইন্দ্যা রাখলাম। পরের দিন খরখরাইয়া রোদ উঠল, সকলে কাপড় শুকাইল— তবে গিয়া তারা খুললাম।'

জামিনা চেঁচিয়ে উঠল, 'আজান পড়ে রে— আজান পড়ে।' সবাই বুকে জড়ানো গামছার কোনাটা মাথায় টেনে ধরল। খালি মাথায় আজানের সুর কানে এলে দোষ। মফিজান জমাদারনি আমতলায় একটা টুলের উপর পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসেছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে দু-হাত মাথায় চাপিয়ে বসে রইল। পরনে তার ঘাগড়া আর জ্যাকেট। চাদরটা খুলে রেখে দেয় গা থেকে জেনানা ফাটকে ঢুকবামাত্র।

২৮শে। রবিবার সকাল :

ভোর না হতে চার দিক ঝাঁটপাট দিয়ে, ফুলগাছের প্রতিটি পাতা ধরে ধরে ধুয়ে মুছে, গোড়াগুলি গোবর দিয়ে নিকিয়ে, রাস্তার দু-পাশের তিন-কোনা মাথা-বের-করা ইটগুলিকে চুন-আলকাতরার লেপ দিয়ে পর পর শাদাকালোর বাহার তুলে, পথগুলিতে লাল ইটের মিহিগুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, হাত-পা ধুয়ে, ফাইলে তুলে রাখা ফরসা শাড়িখানা পড়ে, সেলাই হাতে করে লাইন বেঁধে বসল গিয়ে কয়েদিরা এবার খাটুনি-ঘরে। সব ঠিকঠাক— এবার আই. জি. এলেই হয়!

সতু রাস্তার উপর উপুড় হয়ে লাল ইটের গুঁড়ো দু-হাতে মাখিয়ে জামায়

লাগাচ্ছে। শাদা জামাতে লাল ছোপ দেখে তার বড়ো ফুর্তি। যমুনা বলে, 'দোলপূর্ণিমা হলে এই দিয়েই আজ আবির খেলা চলত।' পায়ে পায়ে লাল ধুলো ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় যেতে আসতে সকলের লাল লাল নানা আকারের পায়ের ছাপ পড়ছে। ভাবী বললেন, 'এই দেখো, এটা ঠিক দাজুর পায়ের ছাপ। দেখো, দেখো— ছোটো ছোটো ছাপগুলি কত মিষ্টি লাগছে!'

আই. জি. সদলবলে এলেন, গেলেন। কয়েদিরা উঠে পড়ে গা মোড়ামুড়ি দিল। ছোটো ছেলেগুলি প্রাণখুলে নিশ্চিন্ত মনে দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। মেট্রন ঘাগড়া ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'যাউক, সাড়ে-পনরো আনা ফাঁড়া কাটল আমার।' সাড়ে-পনেরো আনা কেন? 'কাল যে আবার ভোট আছে; কোনো কারণে ভিতরে আসলে আসতেও তো পারেন।' ব'লে মেট্রন শিমুল তুলোর পটিটা খুলে বললেন, 'মাখম একটু কম পড়ছে আইজ— একটু মাখম দিতে পারেন? মাথার বায়ুটা যেমন বেশি তপ্ত লাগে।'

দুপুর:

নন্দিতা, ভবানী ও শান্তিতে আলোচনা হচ্ছে পাশের খাটে। নন্দিতা বললে, 'কী যে বল তুমি শান্তিদি, বিদেশী মেয়েদের যা গড়ন, পায়ের দিকে তো তাকানোই যায় না। বেশির ভাগ সব গোদা গোদা পা: ধ্যাপসা গড়ন শরীরের, তার উপরে আজকাল যা সাজ করে তারা— তার চেয়ে কিছু না পরাই ভালো।'

শান্তি বললে, 'কী জানি, আমার তো বরং তাদের অতি সুন্দরী বলেই মনে হত; তাদের কিছু কুৎসিত আমার নজরেই পড়ত না।'

নন্দিতা বললেন, 'যেটুকু সৌন্দর্য ওদের আছে যা দেখে তোমরা মুগ্ধ হও —জানো, তা সব আর্টিফিসিয়াল? কতরকম কাণ্ড করে ওরা সুন্দর দেখাবার জন্য? একটা সাধনার মতো করে ওরা দেহচর্চা করে। ভুরুটুরু তো কামায়ই —তার উপর ধরো কারো eye-lash ছোটো; তা তুলে ফেলে কৃত্রিম eye-lash লাগায়।'

শান্তি বললে, 'তা যাই বলো, ওদের দেশের actress-রা কিন্তু ভারি সুন্দর। আর কী সুন্দর অভিনয় করে!'

নন্দিতা বললে, 'তা হবে না? ঐ যে বললুম নিজের দেহকে ঠিক

রাখবার জন্য ওরা দস্তুরমতো সাধনা করে। এমন-কি খাওয়া দাওয়ারও কত বাছবিচার করে!

ভবানী বলে, ' "অমুক"কে দেখেছেন "অমুক" ফিল্মে? কী সুন্দর শরীরের গড়ন তার! তাকে প্রায় সব সময়ই বেশির ভাগ শরীরে জামা পরায় না, ওর শরীরের গড়ন দেখবার জন্য। চমৎকার অভিনয়ও করে।'

নন্দিতা বললে, 'ওদের দেশের actress-রা মনে করো কি কম খাটে? Act করাও তো একটা বড়ো আর্ট। এও তো একটা সাধনা। আমাদের দেশের actressদের সঙ্গে তাদের তুলনা? এই তো অমুকের এত নাম, এত প্রশংসা, অথচ দেখছি তো— শরীর তার যাচ্ছে-তাই। একটা ফিল্মে স্কুল-গার্ল সেজেছে— কী ugly! তার উপরে সে যখন স্কুল-গার্ল হয়ে দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি করছে— তা দস্তুরমতো বীভৎস!'

শান্তি বললে, 'তা আমাদের ডিরেক্টারদের দোষ। ঠিকমতো জিনিসটাকে put করতে পারে না।'

নন্দিতা বললে, 'তা আমাদের দেশে সে-রকম ডিরেক্টারই বা এমন কে আছে? ভদ্রঘর থেকে যারাই গেছে, সবাই কেমন ঐ সোসাইটিতে তলিয়ে গেছে। আমাদের দেশের actor-actress-দের সোসাইটিটাই কেমন খারাপ! বাইরে থেকে যারাই যায় তারাই কেমন ঐ দলেরই হয়ে যায়। দু-একটি করে গেলে হবে না, দল বেঁধে যদি নামা যায় তবে এটাকে বদলানো যায়।'

ভবানী বললে, 'আমাদের দেশে অভিনেত্রীদের সম্মান নেই মোটেই। "অমুকে"র পার্টে এক জায়গায় কাঁদতে হবে— ফিল্মে শুধু দুটো চোখ দেখানো হবে যে চোখে জল ভরে আসছে। এখন সে কাঁদতে পারে না কিছুতেই। বার বার চেষ্টার পর ডিরেক্টার রেগে দিলে তার পিঠে এক চড় বসিয়ে সকলের সামনে। লজ্জায় অপমানে সে কেঁদে ফেলল— ছবি উঠে গেল।'

শান্তি বলে, 'এ কি আর একদিনে বদলায়! আস্তে আস্তে বদলায়। যতই ভালো ঘর থেকে ভালো ভালো মেয়ে নামবে— ততই এর standard বদলাবে। এখনকার actress-রা কে! এই তো— লীলা, মণিকা, কানন, যমুনা— জানো বুড়ি, যমুনা কিন্তু এক সময়ে আমাদের স্কুলে পড়ত।'

নন্দিতা বলল, 'আমাদের সঙ্গেও গোখলেতে পড়ত আর একজন— নাম ছিল তার রমলা!'

১লা মার্চ। সোমবার :

কাল বিকেলে দুজন নতুন কয়েদি এল মা ও মেয়ে, জাতিতে মুণ্ডা। অন্যের জমিতে ধান কাটার জন্য ২৫ টাকা জরিমানা হয়— অনাদায়ে তিন মাসের জেল। খেতে পায় না যারা তাদের পক্ষে টাকা ধার করে দেওয়ার চেয়ে এই অসময়ে জেলই ভালো। মেয়ের কোলে লিংলিঙে সরু একটা ছেলে— মাথাভরা দগ্‌দগে ঘা। কাঁদে ছেলেটা— ম্যাঁ-্যা-্যা— ঠিক বাচ্চা পাঁঠার মতো, থেমে থেমে কেঁপে কেঁপে। প্রথমটায় তো ডাক শুনে চমকে উঠেছিলাম – ভাবলাম— পাশের 'ছোকরা ফাটকে' বুঝি পাঁঠা এসেছে, ফিস্ট হবে। বেচারা পাঁঠাটার আসন্ন বলিদানে মনটা করুণায় ভরে উঠছে— এমন সময় দেখি সেই ডাক খাটুনি-ঘরে মায়ের কোল থেকে মাথা তুলে ভাত খাবার জন্য ঝাপটাঝাপটি করছে।

ভাবী বললেন, 'দেখো, দেখো, এইটুকু ছেলে মার দুধ খাবে না, গোরুর দুধ খাবে না— কেবল মুঠা মুঠা ভাত খাবার লেগে কেমন করছে দেখো। এ-রে মেয়েটা, আর ভাত খাওয়াবি না ওকে। তোর ছেইলা তবে মইরে যাবে যে।' বলে ভাবী আতঙ্কে আঁতকে আঁতকে উঠতে লাগলেন।

ছেলেটার মাথার ঘাটা ছোঁয়াচে। ডাক্তার বলেছেন সব সময়ে ঢেকে রাখতে ; মলমও কী একটা দিয়েছেন যেন।

সকালে দেখি ছেলেটার মা মাথার ব্যাণ্ডেজটা নর্দমার জলে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে ধুচ্ছে, আবার বাঁধবে। রূপজানকে ডেকে দেখিয়ে দিয়ে চলে এলাম। যা হয় ব্যবস্থা ও-ই করুক। ভালো লাগে না আর।

বিকেল :

সুরাতন বললে, 'আর কতদিন গান্ধিজির উপাস আছে ?'

'আর তো বুঝি দু-দিন বাকি আছে— গান্ধি মহারাজের উপাস-ভাঙার' বলতে বলতে রূপজান এগিয়ে এসে জাঁকিয়ে বসল। কোথাও কিছু কথাবার্তা হতে দেখলেই রূপজান সেখানে ঢুকে জোর করে জায়গা দখল করে নেয়, সকলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে নিজেই সব বলে যায়। আর কাউকে কথা কওয়ার সুযোগ দেয় না।

শান্তি বলে, 'রূপজানের কর্তৃত্ব করার এ স্পৃহা আর কিছুই না, সংসারে কর্ত্রী পদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিকার মাত্র। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাই বলবেন।'

সে যাই হোক, রূপজান্ মুখ খুললে আমরা মুখ বন্ধ করি। এটা আমাদের একটা অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে।'

রূপজান বললেন, 'জানো, গান্ধি-মহারাজ কি যে-সে লোক? উনি তো দেবতা। আমাদের গ্রামে একবার— তখন গরমকাল— একটা বউ রান্না করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছে; তরকারিতে নুন দিতে হবে, নুন ফুরিয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি নুনের এই বড়ো বড়ো চাকা নিয়ে শিল-নোড়ায় গুঁড়ো করতে বসল। আড়াই বছরের ছেলেটা তার পিঠের উপরে পড়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছে। বউটা রাগ করে শিল-নোড়াতে দুম দুম করে নুনের চাকা ভাঙতে ভাঙতে বলল, "নে, সর, সর, পিঠের উপর থেকে সর, গান্ধি-মহারাজের মাথা কুটে নি আগে— বিরক্ত করিস না"। বলব কি সেইদিনই বিকেলবেলা ছেলেটা মাথায় রক্ত উঠে মরে গেল।'

ভাবী বললেন, 'তা "গান্ধির মাথা কুটি" কেন বলছিল সে? গান্ধি কী দোষ কইরেছিলেন?'

রূপজান বললে, 'দোষের কথা হচ্ছে না। গান্ধি-মহারাজ আবার দোষ করবেন কি— তিনি তো দেবতা। তবে কিনা তিনিই তো আইন বের করলেন— চাকা চাকা নুন কিনে নিতে হবে। বাজার থেকে চাকা চাকা নুন ভাঙা তো কষ্ট—তাই বউটা বলেছিল গান্ধি-মহারাজের মাথা কুটি; তেমনি হাতে হাতে শাস্তিও পেল সে।

বারান্দায় এক কোনায় মিছিরন ভব্য সভ্য হয়ে বসেছে কোরান হাতে নিয়ে। পাশে জামির কদমমণিকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে; আজ সে কোরান ছোঁবে না। এক-একদিন বিকেলবেলা ঘরে ঢোকার আগে মুসলমান কয়েদিরা কোরান হাতে বসে কয়েক মিনিট। প্রতি শনিবার মাস্টারনি আসে। এক-একজনের দু-মিনিট করে সময় বরাদ্দ থাকে, সেই সময়টুকুতে কয়েদিদের লেখা-পড়া শিখিয়ে চলে যায়। মিছিরন সুর করে পড়ছে।

বললাম, 'পড় যে, এর মানে বোঝ কি?'

রূপজান বললে, 'কোরানের মানে বুঝতে নাই। বুঝলে হেনে পাপ।'

রাত্রি :

দাজুটা কাঁদছে— মশার কামড়ে ঘুমোতে পারে না। গঙ্গা কাঁচা ঘুম ভেঙে

চটে উঠছে আর ছেলেটাকে মারছে 'কাঁদছিস কেনে, তোর বাপ মরি গেছে ?' গঙ্গা রাগলেই এ কথা বলে ছেলেকে।

কোনায় তিনজন তুলো পিঁজছে লণ্ঠনের আলোয় বসে। চরকার পাঁজ ফুরিয়ে গেছে।

বিছানায় শুয়ে বই পড়ছি, নেছা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বসতে বললাম—কোল ঘেঁষে বসে পড়ল। সারাদিন নেছার আজ মন ভার, চোখ ছলছলে। ছেলেদের জন্য বোধ হয় মন তার কেমন করছে।

নেছা বললে, 'কপালই মন্দ কইর‍্যা আসছিলাম নয়তো যেই ছাওয়ালদের জন্য এই কাজ করলাম তারাই আমার বুকছাড়া হইয়্যা রইল। সোয়ামি আমারে কি কম জ্বালাইছে, কম কষ্ট পাইছি তার হাতে! গেরামের লোক পর্যন্ত আমার সোয়ামির উপরে ত্যক্ত হইয়্যা উঠছিল। একটা পয়সা কোনোদিন আমার হাতে দিত না বা ঘরে আনত না। তাও আমি কিছু কইতাম না। বাপ আমারে যা সম্পত্তি দিয়া গেছে তা-ই নাইড়্যা চাইড্যা আমার চইল্যা যাইত— ছাওয়ালদের খাওয়া-পড়া চলত। কিন্তু সোয়ামি ঘরেরটা পর্যন্ত নিয়া নষ্ট করত। লুকাইয়া লুকাইয়া আমার জমি বিক্রি কইর‍্যা দিত। আমি কত বুঝাইতাম— এই— এইরকম তার পানজার কাছে বইস্যা কত কইতাম— দেখ গো, তুমি নাহয় তারে বিয়া করো, বিয়া কইর‍্যা ঘরে আনো, সুখে দুঃখে মিল্যা মিশ্যা থাকি। তোমার ছাওয়াল-পিয়াল হইছে তাদের মুখের দিকে তাকাও। সব যদি উড়াইয়া পুড়াইয়া দাও তো তাদের গতি হইব কী? সোয়ামি উলটা আমারে তালাক দিবার জোগাড় করল। আমাদের নিয়মে আছে, তালাক লিখাইয়া আইন্যা তিন মাস লুকাইয়া রাইখ্যা দিতে হয়— তার পরে তালাক দেয়; নয়তো তালাক বে-আইনি হইয়্যা যায়। তা আমার সোয়ামিও যে লুকাইয়া তালাক লেখাইয়্যা আইন্যা রাইখ্যা দিইছে আমি পোড়াকপালি জানি না কিছুই। একদিন বিকালে আমি— বাড়ির পাশেই এক খালাতো বোনের বাড়ি— তার কাছে গেছি, বোন আমারে কয়, আয় নেছা, আজ আমার বাড়িতে খাইয়্যা যা। জন্মের শেষ দুই জনে একসঙ্গে খাইয়্যা লই। আমি কইলাম, ক্যান বু, তুমি আমারে এই কথা কও ক্যান, জন্মের শেষ খাইতাম ক্যারে? কী হইছে? কও বুবু, আমার মাথা খাও কও। তখন বু আমারে কইল, জানিস না তুই, অমুকে তোরে যে

তালাক দিব— লেখাপড়ি কইর‍্যা আনছে। শুইন্যা ত কী কমু— আমি আর আমার মধ্যে রইলাম না। সোয়ামির জন্যে তো কিছু না, আমার ছাওয়ালদের তো আমার কাছছাড়া কইর‍্যা রাখব, তাদের আমি আর বুকে পামু না— তাদের তো আর নাড়াচাড়া করতে পারমু না। হায় হায়, তাদের ছাইড়্যা আমি থাকুম কী কইর‍্যা? সোয়ামির কত হাতে-পায়ে ধরলাম যে, তুমি আমারে তালাক দিও না। তোমার যারে মন চায় তারে লইয়্যা তুমি ঘর করো, আমারে আমার ছাওয়ালদের বুকে লইয়্যা থাকতে দাও।

'কিছুতেই কিছু না। সোয়ামি আর ঘরেই থাকে না এর পর। দিন-রাইত আমারে এড়াইয়্যা এড়াইয়্যা চলে। আমি আর কী করি— কান্দি কাটি, পাগলের মতো ঘরের ভিতরে ঘুইর‍্যা বেড়াই। এত সুন্দর কইর‍্যা ঘর সাজাইছিলাম। ছবি— ছবিই বা কত টানাইয়াছিলাম চার দিকের দেয়াল ভইর‍্যা। দামি দামি সব ছবি— ছয় আনা সাত আনা কইর‍্যা এক-একটা। মানষেরে ধইর‍্যা ধইর‍্যা, দেওরদের দিয়া কত জায়গা থেইকা, মেলা থেইকা ছবি আনাইতাম গাঁইটের পয়সা খরচ কইর‍্যা। রাঙামাটির হাঁড়ি শখ কইর‍্যা কিনতাম, ঘরের আদ্ধেক বোঝাই আছিল সেই-সব হাঁড়িতে। ছিকাই বা কত, রঙ-বেরঙের কত ছিকা করছিলাম নিজের হাতে। পাঁচ পাঁচ খানা পাটি বুনছিলাম—কত শখের ছিল আমার। ঘর ভইর‍্যা ঘুরি আর দেখি। এত শখ কইর‍্যা সাজাইলাম ঘর তা আমারে ভোগ করতে দিব না। হায় রে! আমার সাজাইন্যা ঘরে তুলব আইন্যা আমার ভোগবাদীরে! রও, তারেও দিমু না ভোগ করতে কিছু! পেনসিল-কাটা এই এতটুকু একখানা চাকু লইয়্যা পাঁচ পাঁচখান পাটিরে কেইচ্যা কেইচ্যা রাখলাম। বাইরের থেইক্যা দেখলে বোঝা যায় না কিছু কিন্তু ব্যবহার করতে পারব না, ধইর‍্যা টানলেই যেন পরলে পরলে খুইল্যা আসে। জাঁতি দিয়া একটা একটা কইর‍্যা রাঙামাটির হাঁড়ি-কলসিগুলি টুক টুক কইর‍্যা দুপুরে দুপুরে ভাঙলাম। ভাইঙা আর একটা কলসিতে টুকরাগুলি বোঝাই কইর‍্যা রাখলাম। ছিকাগুলি দাও দিয়া কুটি কুটি করলাম। বাক্সের ভিতর সোয়ামির তাঁতের ধুতি পাঞ্জাবি ছিল আমার বাপের দেওয়া। ভাবলাম এই ধুতি পইর‍্যা তুই যাবি আবার বিয়া করতে? রও, তর ধুতি পরা বাইর করি। সেই ধুতি পাঞ্জাবিরে ছুরি দিয়া পোছের পর পোছ দিয়া রাখলাম। বালিশের ভিতরে কাঁটা ফুইর‍্যা রাখলাম।

একসঙ্গে সব জিনিস ভাঙি কুটি না— পাছে কারো চোখে পড়ে, ঘর খালি হইয়্যা যায়। একটা দুইটা কইর‍্যা রোজ দুপুরে এই কাণ্ড করি। তবু সোয়ামি একদিন পুছ করল— 'পুব দেওয়ালটা ভর্তি ছিকা আছিল, ছবি আছিল— কী হইল? কম কম লাগে যেন।' ঝংকার দিয়া আমি উঠলাম —কী জানি আমি তার? কইয়্যা ঘর থেইক্যা বাইর হইয়া গেলাম। সেও আর কিছু কইল না। এমনি দিন যায়।— একদিন দেওররে কইলাম— আমি তো এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি তোমাদের সংসার থেইক্যা; শেষ চেষ্টা একবার কইরা দেখি। আমারে কিছু বশ করবার ওষুধ আইন্যা দাও। আমার যা সম্পত্তি আছে তার আদ্ধেক তোমারে লেইখ্যা দিমু আমি। আর দিলাম তারে নগদ তেরো টাকা। দেওর আমারে কয়দিন বাদে আইন্যা দিল কাগজের পুরিয়ায় এতটুকু একটা ধইন্যার মতন চুনের লাখান শাদা একটা বড়ি। একদিন পানির সঙ্গে দিলাম দুই আঙুলে টিপ্যা গুঁড়া কইরা মিশাইয়া —হাত কাঁপলও না তখন। বিকালের দিকে তো ভেদ-বমি কইর‍্যা মইর‍্যাই গেল সে। আমি কী কমু! বেবুকের মতন দাঁড়াইয়্যা রইলাম। শাশুড়ি কয়, ক তুই কী খিলাইছস্? আমি কইলাম, কী খিলাইছি আমি কমু কী কইর‍্যা? পুছ করো তোমার ছোটো ছাওয়ালরে। গাঁয়ের লোক শেষে শিখাইয়া দিল— যা হইবার হইছে, তুমি আর তোমার দেওরের নাম কইরো না। তার পর তো বিচার হইল, কুড়ি বছরের সাজাও হইল। ছাওয়াল দুইটারে বাড়িতে রাইখ্যা কোলের মাইয়্যাটারে লইয়া আইলাম জেলে। মাস তিনেক আগে শাশুড়ি একবার ছাওয়াল দুইটারে আইন্যা দেখাইয়া গেছে। ডেপুটিবাবুকে কইলাম, ছাওয়ালদের জালের এইপাশে দাও— তাদের আমি কোলে লিব। তা ছোটো ছাওয়ালটিরে দিল ঢুকতে। তারে কোলে কইর‍্যা পুছ করলাম, হ্যা বাপ, তোমারে কেউ মারধর করে? সে কান্দতে কান্দতে কইল, হ্যা মা, আমারে নানী মারে, চাচা মারে। কইলাম তারে চোখের জল মুছাইয়া দিয়া— কাইন্দো না বাপ কাইন্দো না; কপালে যদি থাকে— কোনো দিন যদি মায়ে-বেটায় মিলতে পারি তবেই তোমার আমার দুঃখ যাইব। এখন তুমিও সইয়্যা থাক, আমিও সইয়্যা থাকি'— বলতে বলতে দরদর করে নেছার দু-চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। নেছা দু-হাতে আঁচলের কোণ দু-চোখে চেপে ধরল।

একটা বেড়াল ঢুকেছে কয়দিন আগে জেনানা ফাটকে। দিনের বেলা ক্বচিৎ তার দেখা পাই। কেমন যেন চোরের মতো চলাফেরা তার। একটা শালিক ডেকে উঠল আর্তস্বরে; নিশ্চয়ই বেড়ালটা ধরেছে তাকে। কাছেই কোথায় মনে হচ্ছে। জমাদারনিটা ঘুমচ্ছে বাইরে— উঠে যে একটু দেখবে তা নয়। আঃ, না— ঐ; শালিকটা বোধ হয় ছাড়া পেল বেড়ালের মুখ থেকে। ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে যেন উপর দিকে উড়ে গেল খানিকটা। হ্যাঁ, ঠিকই।

২রা মার্চ। মঙ্গলবার বিকেল:

পুবকোনায় ছোট্ট করঞ্চা গাছের ডগাগুলিতে জোড়া জোড়া ছোট্ট ছোট্ট লাল টুকটুকে পাতা দেখা দিয়েছে। নিমগাছের ডাল ভরে কচি পাতা মুখ বের করেছে। শুকনো বেলফুল গাছগুলিও ছেয়ে গেছে হালকা সবুজ রঙে। লেবু-ফুল আর আমের মুকুলের সৌরভে মাতোয়ারা জেল-প্রাঙ্গণটুকু। দুটো কোকিল ডাকছে অবিরত। দূরে পাকুড় গাছের ডগায় পরিত্রাহী ডাক ছাড়ছে পাখি— চোখ গেল— চোখ গেল— চোখ গেল। দেয়ালের উপরে উত্তর আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ চলেছে ধীরে ধীরে পুব দিকে এগিয়ে; গায়ে পড়েছে তাদের সূর্যাস্তের উজ্জ্বল গেরুয়া আভা। চারি দিকে বসন্তের আগমন শুরু হয়েছে।

গান্ধিজির আজ অনশনের শেষ দিন। কাল সকাল আটটায় তিনি উপোস ভাঙবেন; মনে মনে তাঁর কুশল প্রার্থনা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না এখানে। তা না পারি— বড়ো আনন্দ হচ্ছে।

৩রা মার্চ। বুধবার সকাল:

স্নান সেরে এসে বসলাম লেবুতলায়। আজ আমাদের সত্যিকার উৎসবের দিন। মনে হল প্রাণভরে কিছু প্রার্থনা করি। প্রার্থনার ভাষা জানি নে। কী বলে প্রার্থনা করলে প্রাণ জুড়ায়— কাকে ডাকলে মন ভরে ওঠে— আঁকুপাঁকু করি। গলা খুলে গুরুদেবের গান যদি গাইতে পারতাম! 'শান্তিনিকেতন' খুলে পড়তে লাগলাম—'মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল? ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান— তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে উদ্ধার করবেন— কারণ, এই

কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়? সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই— আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়— কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি।'

রাত্রি:

মিটিনের কম্বলের পাশে বসে সেই নম্বরেরই একটি স্কেচ করছিলাম কালো-পেনসিল দিয়ে। পাশে ননীদি 'বিষাদসিন্ধু' পড়ে শোনাচ্ছেন মুসলমান কয়েদিদের। বেশ লাগছিল। শুনতে শুনতে এঁকে চলেছি। নেছা উপুড় হয়ে দেখছিল আমার ঘাড়ের পাশ থেকে। বলে উঠল, 'নকৃকি হাত— নককি চোকখু, যেমন যেমন দেখছে তেমন তেমনই খারি লিইছে।' বানু ঘুমচ্ছিল এক পাশে— দাঁত কড়মড় করে উঠল। বানুর মা মরিয়ম ছুটে গেল সেদিকে— বলল, 'এই-রে, দাঁত লাইগা গেছে আবার।'

বানুর প্রায়ই ফিট হয়। অনেকক্ষণ অবধি থাকে। চিৎকার, দৌড়োদৌড়ি ধস্তাধস্তি অনেক কিছুই হয়! এসে অবধি কতবার দেখলাম এই। ওপাশ থেকে কে যেন বলে উঠল— 'কিছু না, ধরে মার দিতে হয়; এর পর থেকে কিছু লঙ্কা এনে রাখব ঘরে—ফিট হলেই দেব লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ঘষে।' ভাবীর খাট ছিল বানুর মাথার দিকে। ভাবী বললেন, 'এ রানীদি, আমি তোমার খাটে শুই গো— কেমন? আমার যে ভয় লাগ্‌সে ওর দাঁতের কামড়ানি শুইনি।'

৪ঠা সকাল। বৃহস্পতিবার— শিবরাত্রি:

'আগো যমুনাদি, আপনে দুইটা মুরগি লিখছেন না দুইটা মুড়কি লিখছেন বাজারের ফর্দে।' ঘুম ভেঙে গেল ভোরে মেট্রনের গলার স্বরে। যমুনা, ননীদি রাজবন্দী। মাসকাবারির পয়সা বেঁচেছে। যমুনা তাই দিয়ে দুটো মুরগি আনাবে; বাজারের ফর্দে লিখে রেখেছে কাল রাত্রে বসে। মেট্রনের কথা শুনে উঠল রুখে—

'মুড়কিই যদি আনতে দেব তবে দুটো লিখতে যাব কেন? আমার দু-গালে দিয়ে বসে থাকবার জন্য?'

সরলা আজকাল একটু হাঁটাহাটি করতে পারে। মাঝে মাঝে এসে বসে বারান্দায়; এর-ওর সঙ্গে কথাবার্তা কয়— হাসিতামাশায় যোগ দিতে চেষ্টা করে। মাথাভরা কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলের রাশি। স্নানের পরে যখন পিঠের একপাশ দিয়ে চুলগুলি বের করে দিয়ে মাথায় শাড়ির আঁচল টেনে দেয়— সুন্দর ঠেকে ভঙ্গিটি। হাড়-গিরগিরে মুখখানা কল্পনায় তখন ভরাট করে তুলতে চেষ্টা করি। সরলার বড়ো আক্ষেপ, বলে, 'সর্বনাশা লেইখ্যা রাইখা গিয়াই তো আমারে মারল। আগে জানতে পারলে ঐ কাগজের টুকরাটা সরাইয়া ফেললেই চুইকা যাইত সব। ঐ কাগজখানাতেই তো যত বিপদ! না হইলে আপিম কি কেউ কাউরে খাওয়াইতে পারে? না হাকিমেই তা বিশ্বাস করে?'

'বিষ খেলো কেন সে?'

'কী কইয়া কমু?'

'ঝগড়াঝাটি করেছিলে কিছু?'

'তা হইত বইকি একটু আধটু মাঝে সাঝে। আমারে কইত— তুই চইলা যা এইখান থেইকা। আমি কইতাম— তা দিয়া দাও আমারে টাকা-পয়সা কিছু। টেরেন ভাড়াও তো চাই। টাকাপয়সা না হইলে কই যামু আমি কন্‌ছেন দেহি। তা দিয়া দিলেই তো হইত। আমিও চইলা যাইতাম —তরও আপিম খাইয়া মরতে হইত না। কেমন কিনা? অখন কপালে আমার কী আছে কেমন কইরা কমু?'

জামিরন বলল, 'বিশ বছর ঝুলছে তোরও কপালে— আর-কি!'

চিনু বলল, 'তা তুমি ভাবছ কেন? তোমার লোকটি তো তোমার সুবন্দোবস্তই করে গেছে। কোথায় থাকতে, কী করতে— কে তোমায় খেতে দিত? সে কি এ-সব না ভেবেই করেছে কিছু মনে করো? দেখো তো— তোমার খাওয়া-পরা কিছুর জন্যই এখন কত কালের মতো ভাবনা করতে হবে না।'

সরলা বলল, 'হঃ সুবন্দোবস্ত না— বলে কত সুবন্দোবস্ত! হিঃ— হ— হ—' ক্ষীণস্বরে হাসবার চেষ্টা করে হাতে ভর দিয়ে ঘুরে বসল সবার সামনা-সামনি হয়ে।

নন্দিতা বললে, 'জানো তো, বাইরে আজকাল কত অভাব? কত

অনটন ? লোকে খেতে পায় না, পরতে পায় না। এখানে সে আন্দাজে কত ভালো আছ তুমি !'

চিনু বলল, 'এখানে লোকের চোখ গেলে চশমা পায়, অসুখ হলে ওষুধ পায়।'

সরলা বলল, 'তা পাউক না— শত শত পাউক : তাতে আমার কী ? বাইরে দশজনের সুখ দেইখ্যা একমুঠা খাওয়াও অনেক সুখের।'

শৈলদি বললেন, 'তুমি বিষ খাইয়েছিলে কেন লোকটিকে ?'

নন্দিতা বললে, 'বুঝেছি, তোমার শখ হয়েছিল গয়না পরতে। গয়না দেয় নি বলে বিষ খাইয়েছ— না ?'

সরলা হেসে হাত নেড়ে বলল, 'এই দেখ গো, বুঝতে পারছি— দিদিরা আমারে খ্যাপাইবার লাগছে। ভাবেন কি— আমি বুঝতে পারি না কিছু ? তা শখ কার না থাকে ? এই যে আপনারা জামা শেলাই করতে আছেন— এও তো শখ কইরাই তো ? কন কিনা— ঠিক কথা না ? তা আমারও তো গয়না পরবার শখ হইতে পারে— না হওনের কী ? আমার তো আপনাগো জামা দেইখাও শখ হয়— দেন না একটা পরি আমি।'

কলতলায় স্নানার্থিনীদের ভিড় জমেছে। মেট্রন বারান্দায় বসে হাঁকছেন, 'আমি কিন্তু গুণতে আছি, কে কয় বাটি জল নিলি। তিন, চাইর, পাঁচ —ব্যস্; তসিমন সইর‍্যা যা— আর পাবি না। মিছিরন, আর না আর না; আও শয়তান— কইতে না কইতে দুই বাটি জল বেশি ঢাইল্যা লইল গায়ে। ওঠ ওঠ— শিগগির— উঠলো নি।'

শীত ফুরিয়ে গেল। দিন দিনই এখন টানাটানি পড়বে জলের। জলিলের জামা প্যাণ্টে আজ সাবান দেওয়া হয়েছে। স্নানের শেষে সে একখানি গামছা নিয়ে কোমরে জড়াচ্ছে। চার দিক ঢাকা পড়ে না সেটুকু ফালিতে। পিছন ঢাকলে সামনেটা খোলা থাকে, সামনে ঢাকলে পিছনটা। দু-তিনবার নানাভাবে চেষ্টা করে বিব্রত জলিল পিছন দিকেই গামছাটা জড়িয়ে নিশ্চিন্ত হল।

দুপুর :

সুষমাদি নাটাইতে সুতো জড়িয়ে চরকা বন্ধ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিকে ওদিকে। বললেন— 'উপোস করলে মনে হয় যে কত সময় হাতে। এটা-ওটা করেও সময় কাটে না— যেন অফুরন্ত। পেটের দায়ই সর্বনাশ করে।'

ভাবী এসে বসলেন কাছে। বললেন, 'ঐ বইটা তুমি পেঠাই দিছ আপিসে?' বললাম, 'এতদিন আছেন আমাদের সঙ্গে— এখনো যদি "পেঠাই" বলেন তবে যে আমাদেরই লজ্জা। ভাবী ছোট্ট খুকির মতো হাসিমুখে বসে শরীর দোলাতে লাগলেন। বললাম, 'বলুন—"পেঠাও" না—"পাঠাও", "এস্থন" নয়—"আস্থন", "রেতে" নয় "রাতে"। ভাবী দু-পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে গনগন করে বললেন, 'উঃ, আমি যে বলতে পারসি না— লজ্জা লাগসে!'

মেট্রন সরলার হাতে একটা মাছি-মারা বেত দিয়ে বললেন, 'বইস্যা বইস্যা মাছি মারো ঘরে। শুধু শুধু খাইবা, সরকার এর লেইগা আনে নাই তোমারে এইখানে।'

সাবিত্রীদি বললেন, 'কী মাছিই হয়েছে। এই আমের বোলের জন্যই। মধু খেতে মাছি এসে ভিড় করছে।'

দু-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটো মুরগি দিয়ে গেল গুদামের মেট। জলিল তা নিয়ে দে-দৌড় রান্নাঘরের দিকে। জ্যান্ত মুরগি দেখে কী উৎসাহ তার!

সরলা বড়ো বড়ো চোখ মেলে বলল, 'আপনারা কি তবে সত্যই কিষ্টপাখি খাইবেন নাকি?'

বিকেল হয়ে এল বলে। লেবুতলার হালকা ছায়াটুকুর ফাঁকে ফাঁকে রোদ ঢুকে জায়গাটুকু তাতিয়ে তুলেছে। ঘূর্ণি হাওয়ায় শুকনো ধুলো-পাতা উড়ে চার দিকে একাকার। ছাই রঙে ছেয়ে গেছে সব। কী রকম একটা ক্লান্তি এল। লেবুগাছের গোড়া ঘেঁষে কম্বলটা ভালো করে বিছিয়ে, হাতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

দুটি টুনটুনি খেলা করছে আমার মুখের উপরের লেবু ডালটিতে। জানে না যে দেড় হাত নীচে শুয়ে আছি আমি অসাড় হয়ে। লেবুফুলের পোকা খাচ্ছে অশান্তভাবে এ-ডালে ও-ডালে ঘুরে ঘুরে।

ওদিকে নম্বরের কার্নিশে ঘুমচ্ছে দুটো পায়রা দু-দিকে বুকে ভর দিয়ে। একটির ঘুম ভাঙল। মিনিট খানেক সেইভাবেই বসে থেকে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ডান-পা টান করে ডান পাখা মেলল, বাঁ-পা টান করে বাঁ-পাখা মেলল। বুকের পালকগুলি ফুলিয়ে ঠোঁট দিয়ে বুক চুলকাল— মাথা ঘুরিয়ে পিঠ চুলকাল। তার পর এগিয়ে গেল; অন্য পায়রাটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

তার মাথা ঠুকরে দিতে লাগল ; সেও আয়াসের সঙ্গে চোখ বুজে মাথাটি তার দিকে আরো হেলিয়ে দিল।

রাত্রি :

রাধা, কদমমণির আজ উপোস। শিবরাত্রির উপোস যারা করে তাদের জন্য বিকেলে দিয়ে গেছে একটি করে শাঁক-আলু, দুটি করে কলা আর খানিকটা সুজির ঢেলা। রাধা, কদমমণি তাদের কলা, শাঁক-আলু অ্যালুমিনিয়ামের বাটির কানায় কেটে টুকরো টুকরো করে গামছা পেতে তাতে ভাগ সাজাল। সুজিও দিল একটু একটু করে সব ভাগেই। রাধা বলে, 'সবাইকে দেওয়াতেই সুখ ; ভালোমন্দ যা-ই খাই।' বললাম, 'তোমাদের জন্য রাখলে না তো কিছুই।' সে বললে, 'তা হোক, নাই বা খেলাম একদিন। সুজি কলা তো পাই নে আমরা কখনো ; যদি বা পেলাম, সবাই একটু একটু মুখে দিই। তাই তো ভালো— নয় কি ? কিরে কদমমণি, পারবি নে আর এই রাতটুকু কাটিয়ে দিতে, কিছু না খেয়ে ?' কদমমণি বললে, 'খুব পারব। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে সবাইকেই দেওয়া হবে, একটুকুন টুকুন করে। আমার শুধু গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা লেবুপাতা লুকায়ে বিকেল বেলা ছিঁড়ে এনে দিয়া রাখছি জলের বাটিতে। বেশ লেবুপাতার গন্ধ হবে জলে। তাই খেয়ে শুয়ে থাকব আজ।' রাধা উঠে সকলের হাতে এক-একভাগ সুজি, শাঁক-আলু, কলার টুকরো বেঁটে দিতে লাগল। কদমমণি কলা আর শাঁক-আলুর খোসা কয়টা তুলে নিয়ে জায়গাটা বেশ করে জল দিয়ে পরিপাটি করে মুছে নিল। রাধা বলল, 'আমার শোবার জায়গাটাও একটু মুছে নে কদমমণি। রোজ বিকেলে একফাঁকে মুছে ফেলি। আজ আর হয়ে ওঠে নি। সন্ধে-আহ্নিক করি— রাজ্যের লোকের পায়ের ধুলোতে গা ঘিনঘিন করে।'

সরলা কদমমণির জায়গা মোছা দেখে বললে, 'কবে যে বাইরে যামু— কবে এমনি ধোয়া-মোছা জায়গায় শুইমু ?'

কদমমণি বললে, 'বলিস না রে, ও কথা আর বলিস না। কত দুঃখ এই প্রাণটার ভিতরে। মনে মনে শখ যায় গোবর দিয়ে জায়গাটা লিপে সেখানে ভাতের থালাটা নিয়া খাইতে বসি। মনের সাধ মনেই রইল রে।' কদমমণি করুণ মুখে 'আ হায়' বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘর মুছতে লাগল।

সরলা বলল, 'জেলখানায সাধ আর অসাধ। জাতি গেল জেলখানায় আইয়া। হেথের হাতে খাওয়ন, হেথের লগে শোওয়ন। বাড়ি যামু, পঞ্চগব্য খামু, গঙ্গায় চান করুম— তবে না শুদ্ধ হমু।'

জবা বললে, 'মুসলমানদিগের কিন্তু কিছুই করতে হয় না। পঞ্চগব্যও খাইতে হয় না, গঙ্গায়ও চান করতে হয় না। অগো নাকি দরিয়াতে চান করলেই শুদ্ধ হইয়া যায়।'

রূপজান এসে বসল সেখানে জানালার পাশ দখল করে। বলল, 'কেনে আমরা স্নান করব গঙ্গাতে— কেনে আমরা গোবর খাইব? এই তো আমরা বাড়ি যাব, গিয়া হেনে হাতের এই কনুই অবধি জল দিয়া ভালো করে ধুয়ে লিব, পা ধুইব, ওজু করব, কলমা পড়ব— ব্যস্, হয়ে গেল।' কদমমণি ঘরমোছা ন্যাকড়াটা ডানহাতে মাটিতে চাপা দিয়ে বাঁ-হাতে আমাকে ঠেলা দিয়ে দু-পাটি দাঁত বের করে বলল :

'শুনলেন— শুনলেন? অদের কি— তার পর অরা মুরগি জবাই করবে, খানাপিনা করবে— হয়ে যাবে; ঘরে ঢুকবে।' তারপর কী কথা মনে হতে কদমমণি শিউরে উঠল; বলল, 'আজ যা রূপজান মুরগি জবাই করল কী আর বলব? কাটতে হয় এক কোপে কাট— আমরাও তো তাই করি; অরা তা না। জামাটা শুকাতে দিইছিলাম বারান্দায়, বাতাসের দাপটে পড়ল গিয়া নর্দমায়। ভাবলাম— বেলা তো আছে এখনো খানিকটা; তাড়াতাড়ি ধুয়ে দিলে শুকালে শুকাতেও পারে। তাই না ভেবে জামাটা নিয়ে কলতলায় গেছি— দেখি— রূপজান দাঁড়িয়ে আছে সামনে; আর সৈয়দাকে বলছে মুরগি জবাই করতে। সৈয়দা দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতে মুরগির মাথাটা ধরে ডানহাতের বঁটি দা দিয়ে এক পোঁছ দিয়ে দিয়েছে ছেড়ে— আর মুরগিটা কঁক্ কঁক্ করে দুটো পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে খানিকটা উপরে উড়ে গিয়ে ধপাস করে এইভাবে মাটিতে পড়ে গেল'— বলে কদমমণি মুরগি মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নিজে মেঝেতে মুখ গুজরে লুটিয়ে পড়ল।

ভুরু কুঁচকে রূপজান বললে, 'মোটে শোন।'

রূপজানের একটা অভ্যেস— গুরুতর বিষয় কিছু আলাপ করতে হলেই 'মোটে শোন' বলে সে সামনে এসে কথাটা পাড়ে। রূপজান হাঁটুর কাপড় টেনে তুলে দুই উরুর মাঝে গুঁজে পা মেলে বসল; বলল, 'তা আমাদের দস্তুর-

মতো কাজ করব তো? আমি হাজির বেটি। আজ নাহয় জেলখানায় এসে আমার কিছু নাই ; তা বলে ধর্ম তো নষ্ট হয় নাই। সৈয়দা, সুরাতন এরা সব চ্যাংড়া ছুকড়ি— তারা কী জানে? তাই আজ সামনে গিয়ে দাঁড়ানু ; বলনু, দেখ, এইভাবে এই কর। দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়নু— "লা-এলা-হা-ইল্লাল্-লা-হো, মোহাম্মদুর-রাসু-লুল্লা-হো।" সৈয়দা মুরগিটার গলায় পোঁছ লাগিয়ে ছেড়ে দিল। মুরগিটা মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করছে— তখন একটা বাটিতে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে ফু দিনু— "কুল্-হো-ওয়াল্লা-হো-আহাদ, আল্লা-হো-সামদ্-লাম-ইয়ালেদ —ওয়ালাম ইওলাদ ওয়ালামইয়া-কুললা-হো, ফোফোওয়ান আহাদ।" শেষে সেই জলটা মুরগির উপরে ছিটিয়ে দিবা মাত্র তার পরানটা সুস্থিরমতো বাহির হইয়া গেল ; মুরগিটাও তখন 'পাক' হইয়া গেল— আর 'অপাক' রইল না। তবে গিয়া আমরা সেই মুরগিটা খাইতে পারি। নয় তো তোমাদের মতো কাটনু আর খাইনু— এ আমাদের ধর্মে নাই।'

'—যাচ্ছ কোথায়? একটু মুখে দেবে না এ?' বলে রাধা এগিয়ে এল— সুজি, কলা, শাঁক-আলুর ভাগ নিয়ে। হাত পেতে তা হাতে নিয়ে মুখে ফেললাম। আঠার মতো দাঁতের গোড়ায় লেগে রইল সুজিটুকু।

৫ই মার্চ। শুক্রবার :

বাসু আজ কেবলই হাসছে— খিক্-খিক্— উঠতে বসতে, কথায় গল্পে, কারণে অকারণে। চালান যাবে অন্য জেলে শিগগিরই। খবর এসেছে। জেল হয়ে অবধি এখানে আছে মায়ে ঝিয়ে— আট বছরের উপরে। এইবারে একটু বাইরের মুখ দেখবে— রেলগাড়িতে চড়বে— হয়তো রাস্তায় এটা-ওটা কিনে খেতেও পাবে। আনন্দ হয় বইকি একটা। এক জেল থেকে অন্য জেলে চালান হবার পথটুকু যেন বিস্ময়ে, সৌন্দর্যে, মাধুরীতে ভরে থাকে ; আর আতঙ্ক হতে থাকে এই বুঝি পথের শেষ হয় বা। এই কথাটাই একদিন উচ্ছ্বাসভরে বলেছিলাম মিলনী-মাকে। 'বলুন ঠিক এমনই হয় নাকি মনের অবস্থা?' মিলনী-মা নানা রঙের অগোছালো রঙিন সুতো একটি একটি করে গুছিয়ে দু-পা মেলে বসে পায়ে জড়াচ্ছিলেন। জেলখানার খাটুনি। মুখ নিচু করে করুণ হেসে বললেন, 'মনের অবস্থা তখন যে কী হয় তা আমরাই জানি ; তোমাদের কথা আলাদা। আমরা যখন চালান হই— সঙ্গের জমাদারনি আশে-

পাশের সবাইকে শোনাতে শোনাতে আসে— এ এত বছরের আসামি অমুক কাজ করেছে, অমুক কেস তার হয়েছে— কত কী! আর সবাই তা শুনে মুখের দিকে তাকায়। লজ্জায় তখন মরে যাই। ট্রেনে উঠে একপাশে কম্বল বিছিয়ে তাড়াতাড়ি নাক-মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ি।'

বিকেল :

কয়েদিদের খাওয়া হয়ে গেছে। যে-যার থালা বাটি কলতলায় মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করছে। আমরা সন্ধের পর খাই। রস্থন আমাদের খাবার "নম্বরে" নিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে খেতে বসল নিজে খাটুনি-ঘরে। আমরা যে-যার বেড়াচ্ছি এদিক ওদিক সরু সরু রাস্তাগুলি ধরে। হঠাৎ শুনি খাটুনি-ঘরে দারুণ চেঁচামেচি। মেট্রন প্রাণপণ শক্তিতে মুখে যা আসছে তাই বলে রস্থনের মাথার উপরে বারে বারে ঝুঁকে পড়ে গালাগালি করছেন। ভাব দেখে মনে হয় যদি দু-ঘা বসাতে পরতেন তবে বোধ হয় শান্ত হতে পারতেন। কী ব্যাপার? রাগে ও বকাবকিতে মেট্রনের ঠোঁটের দু-পাশে ফেনা জমে গেছে। মেট্রন কাগজের পোঁটলাতে কয়েকটা লাল শুকনো লঙ্কা দেখিয়ে বললেন, 'দ্যাখেন আইসা, এই মরিচগুলি এই চোরনি কয়লার ছালার নীচে লুকাইয়া রাখছিল। আ-লো, এইগুলি তুই তর অমুকের বাড়ি লইয়া যাবি— না লো?' বলে আবার গেলেন রস্থনের উপর রুখে।

আমাদের রান্নাঘরে যারা কাজ করে রস্থন তাদেরই একজন। অন্যরা বলে রস্থন নাকি প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে লঙ্কাটা পেঁয়াজটা জমাদারনিকে দেয়।

জমাদার আসবে এক্ষুনি। তার আগে হাত পা ধুয়ে আসি কলতলা থেকে। খাটুনি-ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে দেখি। জমাদারনি শুকনো হাসি হেসে রূপজানকে হাত নেড়ে নেড়ে পরিমাণ দেখিয়ে বলছে—'আমার ঘরে এত লঙ্কা, এত লাস্থন— সাড়ে-তিন সের ডাইল— ছয়মাসের মতো মজুত আছে সব। দুইটা লঙ্কা নিতে যামু আমি— ফুঃ।'

রাত্রি :

দাজুর জ্বর বোধ হয় ম্যালেরিয়া। মাথায় জলপটি দিয়ে গঙ্গা পাখার হাওয়া করছে পাশে বসে। দাজু ঘুমচ্ছে বেহুঁশ হয়ে। কী মশা, কালো হয়ে

চার দিক থেকে মশা ঘিরে ধরেছে গঙ্গাকে। গঙ্গা পাখা দিয়ে সেগুলি তাড়াতে যায়, তারা এসে ফিরে ধরে দাজুকে।

বই নিয়ে বিছানায় ঢুকলাম। একপাতা পড়তে না পড়তে মাথার কাছের লণ্ঠনটা ক্ষীণ হয়ে এল। তেল ফুরিয়ে এসেছে। সেই ক্ষীণ আলো ক্ষীণ হতে হতে এক সময়ে তা নিভে গেল। বই বন্ধ করে বালিশের নীচে রেখে পাশ ফিরে চোখ বুজলাম।

৫ই মার্চ। শনিবার দুপুর :

লেবুতলা। স্নান করে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এই অল্প পরিসরে অতি অল্প জিনিস নিয়ে এই যে জীবনযাত্রা চলেছে; দুখানি রুমাল, একখানি ধুয়ে রোজ জানালার উপরে টানানো সরু দড়িটায় ঝেড়েঝুড়ে মেলে দিই, অন্যটি ভাঁজ করে কোমরে গুঁজি; একটি শাড়ি পরি, আর-একটি শুকিয়ে পাট করে বালিশের তলায় রাখি— কাল পরতে হবে; জামা একটু ছিঁড়লেই তক্ষুনি বসি রিপু করতে; জোরে সাবান ঘষি না পেটিকোটে— ছিঁড়ে যায় পাছে; ডুরে-কাটা লাল গামছাটা হঠাৎ একদিন বড়ো মনে হল, কেটে দুটো গামছা বানালাম। তুলোর প্যাকেট জড়ানো কাগজটুকু, চায়ের প্যাকেটের রাংতাটুকু, টুথ-ব্রাসের কাগজের বাক্সটা, পায়রার পালকটা হাতের কাছে যা পাই যত্নে তুলে রাখি—কী জানি যদি কখনো কাজে লাগে। ভাবছিলাম তাই যে, মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে না তো শেষে ?

নতুন কয়েদি একটি এল আজ দিনাজপুর জেল থেকে। বিশ বছরের আসামি। স্বামী খুনের কেস। সুরাতনদেরই বয়সী। নাম ভাকুরবিবি। কালোর উপরে বেশ আদুরে আদুরে নাক, মুখ, শরীরের গড়ন পিঠন। বিশ বছরের মধ্যে চার মাস তার জেলখাটা হয়ে গেছে— শুনে সুরাতন বলে, 'তবে আর কী, কাম তো সাইরাই আনছস। এখন বাদবাকি দিনগুলি তর দেখতে দেখতে কাইট্যা গেল বইল্যা।'

খাটুনি-ঘরে তাকে ঘিরে বসেছে সব। চলছে হাসি ঠাট্টা তামাসা। থেকে থেকে শুনছি— হি-হি-হি হি-হি-হি হাসির সুর। দেখছি চেয়ে— ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে কথার ফাঁকে ফাঁকে। মিছিরন বোনার কাঁটা, উল ফেলে মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে হাত নেড়ে কোমর দুলিয়ে গেয়ে উঠল,

'আ-া-া-যন্তর্‌না— সহিতে পারি আমি বইতে না ; আ-া-া— যন্তরনা—'।
জামিরন ধমকে উঠল, 'চুপ কর, দেখস না, কে বইস্যা আছে ওদিকে ?'
তসি বললে, 'পোড়াকপালি চোক্‌কের মাথা খাইছে।'

দেশী কালি একটু লিখতে না লিখতেই নিবের মুখ শুকিয়ে যায়, কালি আর আসে না। উঠে 'নম্বরে' গিয়ে কালির দোয়াত থেকে কলমে কালি ভরে নিয়ে আসছি— দেখি, নেছা কাঁদতে কাঁদতে থালসুদ্ধ ভাত ঢেলে ফেলে দিল ময়লা-ফেলা টিনে। খাটুনি-ঘরে সকলে মিলে বকছে জামিনাকে। নেছা, জামিনা তুই সই। নেছা এখন কাজ করে আমাদের রান্নাঘরে। রান্না যেদিন যা হয়, যারা কাজ করে তারাও পায় কিছু কিছু। নেছার ভাগ নেছা, জামিনা দু-জনে মিলে মিশে খায়। আজ কি হয়েছে যেন তাদের— নেছার অনেক ডাকাডাকি সত্ত্বেও জামিনা এল না খেতে। নেছা ভাতের থালা সামনে নিয়ে কাঁদলও খানিক ; তবু জামিনার মন গলল না। কতক্ষণ আর কাজ ফেলে বসে থাকে নেছা ? রাগ করে সব ভাত ডালে ঝোলে ফেলে দিল টিনে।

মিছিরন বলল, 'এ কি তোর আপন বুইন ? আপন বুইন হইলে পারত না চুপ কইরা থাকতে।'

সমিরন বললে, 'কিসের এত ভাব ? সারাটা দিন নেছা না খাইয়া রইল। সকালেও খায় নাই কিছু ; এখনো ভাত ফালাইয়া দেয় দেইখ্যাও উঠল না থামাইতে ? না খাস না-ই বা খাইলি, লগে বইতে তর দোষ আছিল কী ?'

সুশীলা বললে, 'কী এত গুমোর ? আর নেছাও হয়েছে একটা কুত্তা, জামিনার পিছনে ফেউ লাগবে। ও তো তোকে ডেকেও পোঁছে না— দেখি তো চোখের সামনে। তবে কেনে এত খোশামোদ ; তুই কি বুড়ো ভাতার আর ও কি তোর ছুকৃড়ি মাগ্— যে এত খোশামোদ করে থাকবি ?'

সকলের কথার খোঁচায় জামিনা দু-গাল আরো ফুলিয়ে নিঃশব্দে গজরাতে গজরাতে বোনার গতি তিনগুণ বাড়িয়ে দিল।

বিকেল :

বুদ্ধ্ 'মেট' জাতিতে নেপালি। আট বছর আছে সে এখানে। আর পাঁচ মাস বাদে খালাস পাবে। বেঁটে খাটো শক্ত চেহারা। ঠোঁটের দু-পাশে

গুটি পাঁচ-ছয় লম্বা লম্বা গোঁফ। মুখে হাসি লেগেই আছে। গায়ের রঙ তামাটে। দেয়ালে পেরেক ঠোকা বা পরদা টানাবার কাজ থাকলে সে আসে মাঝে মাঝে জমাদারের সঙ্গে। আজ ও এসেছে একই কাজে। বললাম— 'বুদ্ধু ভাই, এত কাচ্চা কাম কর কেন? দু-দিন বাদে বাদেই যে দড়ি ছিঁড়ে যায়, চটের ভারে পেরেক খুলে আসে।'

বুদ্ধু একমুখ হেসে পিটপিটে চোখ দুটো বুজে হাতের হাতুড়িটা দোলাতে দোলাতে বললে, 'কাচ্চা কাম করি বলেই তো ডেকে পাঠান বারে বারে। পাক্কা কাম করলে তো আর ডাকবেন না আমাকে।'

ননীদি প্রস্তাব করলেন, 'কাল ৭ই, নানা জায়গায় গান্ধিজির অনশন-ভঙ্গের উপলক্ষে প্রার্থনা হবে খবরের কাগজ বেরিয়েছে। আমরা কী করতে পারি?'

সত্যিই তো ধরতে গেলে তাঁর পুনর্জন্ম হল। উৎসব করারই তো কথা। কিন্তু কী করা যেতে পারে? এই অবস্থায় যা-ই করি সবাইকে নিয়েই করতে হবে। আলোচনা সভা বসেছে খাটের উপরে। মায়া বললে, 'দিনের বেলায় কিছু হতে পারে না, তা হলে সাধারণ কয়েদিরা যোগ দিতে পারবে না মেট্রনের ভয়ে। একেই তো তিনি কথায় কথায় আমাদের আড়ালে ওদের যে রকম দাঁত কিড়মিড় করেন; বলেন, 'যাউক না আগে স্বদেশী দিদিরা, তারপর তগো দেইখ্যা লমু— কত্ ত্যাল থাকে তখন বুঝা যাইব।'

তা হলে সন্ধের পরেই হোক। মাঝের নম্বরেই জায়গা আছে, সেখানেই জড়ো হওয়া যাবে। এলা বললে, 'দিনের বেলা আলপনা দিতে দেখলেই তো মেট্রন নাচন শুরু করে দেবেন।' তা হোক। সব কথা শুনলে চলে কী করে? আলপনা দিয়ে জায়গা সাজিয়ে সেখানে বসে গান হবে, প্রার্থনা হবে, চরকা কাটা হবে। ননীদি বললেন, 'উৎসব— এটা তো বোঝানো চাই।' শান্তি বললে, 'বুড়ি, তুমি নাচবে, শ্রীমতীর সেই নাচটা।' সে বললে, 'বাজনা নেই, কিছু নেই।' মায়া বললে, 'কেন, ভবানী বার্নার্ড শ বাজাবে; বেশ মোটা বই আছে।'

এই একুশদিন সকলেই বেশ নিয়ম করে সুতো কেটেছে। এর মধ্যে মায়ার সুতো কাটাই ছিল বিশেষ করে দেখবার মতো। যত-না সুতো টেকোতে জমত তার দ্বিগুণ ছেড়া সুতো তার কোলে, কাপড়ে, ডাইনে, বাঁয়ে

ছড়াছড়ি যেত। ভাবী একদিন চোখ টিপে বললেন, 'এ আর কী দেখছ— দেখগা ওর বালিশের তলা, কত ছেঁড়া সুতো জমিয়ে রাখিছে সেখানে।' ছেঁড়া সুতো নিয়ে মায়ার বড়ো লজ্জা; কোথায় ফেলবে, কার নজরে পড়বে, কে মুখ টিপে হাসবে, তাই দেখ না দেখ নিজের বালিশের নীচে সেগুলি সে লুকিয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও হাজার ছয়-সাত গজ সুতো সে কেটে উঠেছে এর মধ্যে। বড়ো ইচ্ছে সেগুলি সবাই আগ্রহ করে দেখে। বারে বারেই মায়া বলছে, 'আচ্ছা, একটা একজিবিশনের মতো করলে হয় না?' বললাম, কী দিয়ে? সে বললে, 'কেন, এই আমাদের কাটা সুতোটুতো দিয়ে।' শান্তি বললে, 'ভাবনা নেই মায়া, তোমার সুতোগুলি ঠিক সাজিয়ে রাখব আলপনার সামনে।' সকলের হাসিতে মায়া অপ্রস্তুত হয়ে রাগ করে মুখ ভার করল; তাড়াতাড়ি ঘুরে হাতের কাছের ব্রাউনিংখানা খুলে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়তে শুরু করে দিল। নন্দিতা বললে, 'কি মায়াদি, কালকের জন্য প্রিপারেশন করছেন বুঝি? সকলকে পড়ে শোনাবেন?' মায়া হি-হি করে হেসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে, 'আপনাদের জ্বালায় কিছু করবারই উপায় নাই দেখছি।' নন্দিতা বললে, 'তা কয়েদিদের ব্রাউনিং পড়ে না শোনান গল্প শোনাবেন তো?' মায়া বললে, 'আমি কি পারি গল্প বলতে?' নন্দিতা বললে, 'কেন, আপনি তো খুব মজার করে গল্প বলতে পারেন।' মায়া বললে, 'মজার আর কোথায়— সত্যি ঘটনা যা জানি দু-চারটে তাই বলি; আপনারা হাসেন এই যা!'

রাত্রি:

ভাবী হাঁকলেন, 'এ-রে সৈয়দা, বাতিটা টেবিলের উপরে রাখিস না— নামুতে রাখ্।'

এলা বললে, 'বাংলায় 'নামু' বলে না ভাবী।'

কারো সামনে ভাবীর বাংলার ভুল ধরলে তিনি রেগে যান; বললেন— 'তোমাদের পূর্ববাংলায় বলে না, পশ্চিম বাংলায় বলে।'

পুবের নম্বরে কদমমণি হাই তুলছে আর পড়া দিচ্ছে: 'পেরনয়', 'পিরত্তি', 'পেরন', 'আরদ', 'ভারদর', 'হরিরদা'। বললে, 'আট বছর জেল খাটছি; হ্যালাফ্যালা কইর‍্যা পড়লেও অ্যাদ্দিনে কমসে কম তিনখানা বই শেষ করতে

পারতাম। অখন আমার মন আসছে আলগা হইয়া, বাড়ি যাইবার সময় হইল বইল্যা; আর আছে দুই বছর দশ মাস মোটে বাকি— অখন কি আমার পড়ায় মন লাগে? আর অখনই দিল সরকার আমারে বই পড়তে।'

জানালার বাইরের দিকে বসেছে মফিজান জমাদারনি; ভিতরের দিকে বসেছে কয়েকজন অল্প বয়সের 'বিশবছরি'। মফিজান দরদমাখা সুরে বলল, 'এই তো তদের কপাল, যার জন্য এমন কাজ করলি সব— না পাইলি তারে —না পাইলি তার মন; ইহকাল পরকাল সব হারাইলি। তবুও তার লেইগাই কাইন্দ্যা মরস্।' বলেই সে সুর ধরল—

ওরে পরের জন্য পরকাল হারাইলাম
তবু না পাইলাম পরার মন—
পরের জন্যে কান্দে— রে— আমার মন।

এমন মর্মস্পর্শী কথা শুনে কেউ কি আর পারে স্থির থাকতে? ভাকুর-বিবি, জামিনা ডুকরে কেঁদে উঠল। মরিয়ম উপুড় হয়ে দু-হাটুতে মুখ গুজল, সরলা পাঁজর-বেরকরা বুকের অন্তঃস্থল থেকে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'ওহো—হো—হো—রে—।'

৭ই মার্চ। রবিবার:

মেঘলা করে আছে আজ সকাল থেকে। বকবক করতে করতে কয়েদিরা ভাটি থেকে যে যার কাপড় তুলে নিয়ে কলতলায় চলল কাচতে। সেখানে সকলের জমাট ভিড়। এ বেলা স্নানের আশা ত্যাগ করে বসে আছি জানালার ধারে।

দোর-গোড়ায় এনেছে ভাতের বাক্স, ডাল-তরকারির বালতি, 'মেট-পাহারা'রা। রাস্তায় সাজানো থালা-বাটিতে ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে তা মাপমতো। মেট্রন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন; হঠাৎ পিছন দিকে ঘুরে হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'অলক্ষীরা, বজ্জাতরা, দেখতে পায় না কিছু? এরা আসছে ভিতরে— তবু নি সরে ঐখান থেইকা।' দোর-গোড়া থেকে কলতলা বরাবর দেখা যায়। গামছা পরে সকলে কাপড় কাচছিল, ধমক খেয়ে হুড়মুড় করে ছুটাছুটি লাগিয়ে দিল। 'মেট-পাহারা'রা যদি বা মাথা নিচু করে নিজের

নিজের কাজ করে যাচ্ছিল— মেট্রনের চেঁচামেচিতে সতর্ক হয়ে এবারে ওরই মধ্যে ঘাড় বেঁকিয়ে ঠারে ঠোরে এদের দেখতে লাগল।

কোনো ছেলের দুধের বাটি 'লাগিয়ে-রাখা' হয় নি। হাসপাতালের মেট দাঁড়িয়ে আছে। মেট্রন রেগে রূপজানকে বকতে লাগলেন। সে 'মিটিন'; এ-সব তো তারই দেখবার কথা।

রূপজানের মন আজ খারাপ। বকাবকিতে সে খেপে উঠল। রূপজান খেপলে আর রক্ষা নাই। তখনকার মতো কাউকেই মানে না সে। এ-অবস্থায় তাকে দেখলে মনে হয় তার পক্ষে সবই করা সম্ভব; খুন, জখম, মারপিট, বিষখাওয়ানো, দু-তিনটার একসঙ্গে গলা টিপেও ধরতে পারে বুঝি বা। রূপজান দুপদাপ করে হাঁটতে হাঁটতে বিকট স্বরে চেঁচিয়ে চলেছে, 'খবরদার, কইছি আমাকে কেহ কিছু কহিবে না; তা হইলে আমি তাকে দেখে লিব। কেনে পারে না পোয়াতিরা যার যার ছেলের দুধ বুঝে নিতে? পোয়াতিদের ছেলে মরে মরুক দুধ না খাইয়া— তা আমার কী?'

মায়া বললে, 'লাগুক, লাগুক; রবিবার— লাগুক এইবারে।'

দেখা যায় প্রতি রবিবারেই একটা না একটা তুমুল কিছু ঘটে— নয়তো ছুটির দিন ঠিকমতো কাটে না।

নিমগাছে কুটুম-পাখি ডাকছে। মিছিরন মুখ ভেংচে উঠল, 'আবার কোন্ কুটুম আনবি রে? আন্, আন্— ভাবনা নাই। সরকার ডাইলে জল মিশাইয়া রাখছে; কত কুটুম আনবি আন্।'

দুপুর— বেলা আড়াইটে:

খেতে বসেছে কয়েদিরা খাটুনি-ঘরে। রবিবার এই সময়েই খায় তারা সব কাজ সেরে। পাশের বাড়ির পড়শিকে ডেকে হেঁকে কথা-কওয়ার সুরে জামিরন মরিয়মকে বলছে, 'কী রান্নাবান্না করলা গো আইজ তুমি?' মরিয়ম বললে, 'কী আর করুম দিদি— এই মাংসের একটু কোরমা করলাম, ডিমের কয়েকটা বড়া ভাজলাম, আলু দিয়ে মাছের ঝোল রান্দলাম; তাইন আইজ শহরে যাইব— সব জিনিসপত্র গুছাইয়া দিতে হইল— আর বেশি কিছু রান্দতে সময় পাইলাম না।'

'তুমি কী রান্দছ বুইন?' মিছিরনকে শুধালো তসি।

মিছিরন বললে, 'আর বুইন, কর্তা হাট হইতে দেরিতে ফিরল ; বেশি কিছু আর 'আন্না' করতে পারি নাই— ক্যাবল 'চুনা' মাছের কটকইট্যা ঝাল কইর্‍যা লইছি, তাই দিয়াই ভাত খাইতে আছি।'

সরলার খাওয়া হয়ে গেছে ; থালার উপর বাটি তুলে এঁটো হাতেই বসে আছে মুখ গোম্‌রা করে। জিগগেস করলাম, 'কী হয়েছে ?' কথা কয় না। 'রেগেছ কার উপরে ?' তবুও সাড়া নেই।

রাধা বললে, 'রাগবে আর কার উপরে ? সরকার মাছের ঝোলভাত দেয় নি ওকে তাই রাগ।'

সরলা আর চুপ করে থাকতে পারল না। বললে, 'হঃ-হঃ-হঃ—তা-ই।'

একটু আগে নাকি বিনিয়ে বিনিয়ে সবাই মিলে সরলার রূপচর্চা করছিল।

মিছিরন বলেছিল, সরলার বাঁ-চোখটা ডানচোখের চেয়ে ছোটো ; তাই জামিরন মিছিরনকে বলল, 'তুই তো যত নষ্টের গোড়া— পরের রূপ দেইখ্যা বেড়াস ; তর নিজের কত রূপ-রে— বাইয়্যা পড়ে একেবারে।'

মিছিরন মুখে ভাত ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'আমার আর 'উপের' দরকার নাই। এই 'উপে'ই অনেক হইছে।'

রাত্রি :

বিকেলে আলপনা দেওয়া হল মেঝের একপাশে অর্ধচন্দ্রাকারে।

এলা বললে, 'আলপনা আমাদের এমন একটি জিনিস— যেমন-তেমন করে দিলেও কেমন বেশ উৎসব-উৎসব মনে হয়।'

মেঘ করে আসছে পুবদিক কালো হয়ে। মনে হয় এক্ষুনি একটা ঝড় বইবে ধুলো বালি শুকনো পাতা উড়িয়ে। বেলা বেশি নেই আর। হাত-পা ধুয়ে বাইরে ঘুরতে লাগলাম। হাওয়ার গতি বাড়ছে ; আকাশে চিল উড়ছে দু-পাখা সে-হাওয়াতে ভাসিয়ে দিয়ে। মাঝে মাঝে হাওয়ার দাপটে এক-একটা চিল উলটে পালটে যাচ্ছে ; সামলে নিয়ে আবার উড়ছে। দেখতে দেখতে মাথার উপরে আকাশটুকু ছেয়ে গেল চিলে বাজে। আহা, বেচারা বুড়ো বাজ ; স্থির হয়ে আর বসে থাকতে পারছে না ; কিন্তু যতবার পাখা মেলে উপর দিকে উড়তে চায়— হাওয়ার বেগ সামলাতে পারে না ; ডিগবাজী খেতে

খেতে কোনোমতে টাল সামলে এসে বসে পড়ে রান্নাঘরের পাশের উঁচু দেয়ালে। এ জায়গাটিতে একাধিপত্য অধিকার তার। তাকে তাকে থাকে— মাছটা, রুটিটা ছোঁ মেরে নেয়; অতি অল্প আয়াসে দিনের খাবার সংগ্রহ হয়। দুপুরে সবাই যখন নানা কাজে ব্যস্ত— রান্নাঘরের কাজও সারা হয়ে যায়— সেই সময়ে সে এসে বসে সামনের দিকে ছাদের কোনার কার্নিশটুকুতে। প্রায়ই দেখি— দুঠো দাঁড়কাক, গোটা তিন পাতিকাক পিছনে লাগে ওর— ফিরে ফিরে ঠোকর মারে গায়ে মাথায়। সইতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বাজটা উড়ে যাবার চেষ্টা করে। কাকগুলিও পিছন পিছন উড়ে ওর লেজের পালক ধরে টান মারে। এই করে লেজের প্রায় সবকয়টি পালকই সে খুইয়েছে, মাত্র গুটি দুই-তিন অবশিষ্ট আছে।

পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে সূর্যের আলো ঝিকমিক করে উঠল। সে আলোর রশ্মি গিয়ে লাগল পুবদিকের সব কিছুতে। শাদা উঁচু দেয়ালের গায়ে নিমগাছের ছায়া পড়ল— পাশ দিয়ে জলিল হেঁটে গেল, ছায়াটিও চলতে চলতে চলে গেল ঠিক যেন সিনেমার ছবি। ওদিকে পাতাবিহীন ঝিরঝিরে ডালের ডগায় বসেছে জোড়া জোড়া কালো কাক। কচি কচি কয়েকটা পাতা গাছের এখানে ওখানে; আলোর ছটা লেগে জ্বলজ্বলে সবুজ টুকরো কয়টি দুলে উঠল হাওয়ায়। ডালে ডালে আলোর রেখা; কাকের বুকের চকচকে কালোটুকু ঘন মেঘের গায়ে— সে কী শোভা! আনন্দে অধীর মন, এ কী দেখি!

সন্ধে হয়ে এল। ঘরে ঢুকলাম। যাবার সময় মেট্রন অন্য কয়েদিদের শুনিয়ে গেলেন— কেউ যেন নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে না ওঠে; তা হলে তাদের নামে কেস করে দেবেনই দেবেন।

চিনু কলসির একটা ঢাকনাতে তেল ঢেলে প্রদীপ জ্বালাল, একটা ঢাকনাতে ধূপ জ্বালাল। নন্দিতা কাচের একটা শিশিতে ফুল সাজিয়েছিল —এনে রাখল আলপনার সামনে। চারদিকে শতরঞ্চি বিছিয়ে বসলাম আমরা সবাই; গান হল। 'শান্তিনিকেতন' থেকে পড়া গেল; মায়া 'চয়নিকা'র কবিতা আবৃত্তি করল। প্রার্থনার পর্ব শেষ হল।

এবার উৎসবের পর্ব। নন্দিতা পর পর বসন্তের গান গেয়ে যেতে লাগল; আর আমাদের হাতে বিচিত্রসুরে চরকা ঘুরতে থাকল। কয়েদিরা

একহাত তফাৎ রেখে কখন এসে বসেছে আমাদের ঘিরে। মায়া তাদের বললে, 'আচ্ছা, এই যে এই সব হচ্ছে— প্রার্থনা হচ্ছে, গান হচ্ছে, চরকা কাটা হচ্ছে— তোমাদের মনে কি কোনো প্রশ্ন জাগে না? মনে কি হয় না কেন আমরা এ-সব করছি?'

মিছিরন ঘাড় নেড়ে বললে, 'হঃ, তা হয়, তা হয়।'

মায়া উৎসাহিত হয়ে আর একটু এগিয়ে বসে হাত নেড়ে বোঝাতে লাগল— 'কিছুদিন আগে আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা করেছিলাম না? ঐ যে মহাত্মা গান্ধি অনশন করেছিলেন, তাঁর প্রাণের আশা সংকট-জনক হয়ে পড়ে, ভগবানের কাছে তাঁর প্রাণভিক্ষা করেছিলাম।'

শান্তি বললে, 'সেই মানে— তাঁর যে সিরিয়াস অবস্থা হয়েছিল কিন্তু কিছুই তো হল টল না, মানে, তিনি মরে টরে গেলেন না—'

মায়া বললে, 'হ্যাঁ, সেইজন্যই তো আজ আমরা উৎসব করছি। আমরা তো সবাই চাই এইরকম মহাপুরুষরা আমাদের মাঝে অনেক কাল থাকুন। তিনি মহাপুরুষ, এটা তো বোঝো?'

রূপজান ডান হাতের পাঁচ আঙুল টান করে সবাইকে থামিয়ে এগিয়ে এল। মেঝেতে একটা চাপড় মারল, বললে, 'মোটে শোন, আমি সব বুঝি; গান্ধি মহারাজ বলেছেন যেদিন হামার দেশে সকলে ভালো কাপড়া পিন্ধিবে সেদিন আমিও ভালো কাপড়া পিন্ধিব।'

৮ই মার্চ। সোমবার সকাল:

মেট্রন রাগে ফেটে পড়ছেন, কেউ রাজি হচ্ছে না আলপনা মুছতে। যেখানে আমাদের পুজো হয়েছে সেখানে ঝাঁটা বুলোবে ওরা কোন্ সাহসে? মিছিরন বলে, 'আমাগো কি পরানে ভয়ডর নাই? বাড়িতে বালবাচ্চা আছে, আপদ বিপদ ঘটলে তখন কী করুম?' অথচ সাহেব আসছেন এখুনি 'ফাইলে'। 'নম্বরে' আলপনা রেখে দেন মেট্রন কোন্ ভরসায়? রেখে তাঁরও তো চাকুরির ভয় আছে একটা? রসুন স্বদেশী দিদিদের কাজ করে। এদিক ওদিক খানিক দাপাদাপি করে মেট্রন শেষে রান্নাঘর থেকে রসুনকে হিড়হিড় করে টেনে এনে ঘাড়ে ধরে বসিয়ে দিলেন আলপনার সামনে। হাতে খানিকটা ন্যাকড়া গুঁজে দিয়ে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললেন, 'বড়ো

বাইড় বাড়ছে সব, একবার যাইয়া লউক দেখাইমু মজাটা আমি। এক এক কইরা সোজা করমু।'

রসুনের দু-দিকেই ভয়; একদিকে ধর্মের, একদিকে মেট্রনের। ধর্মের ভয়ে হাত যখন সে গুটিয়ে নেয় মেট্রন তখন ঘাড়ে ধাক্কা মারেন। রসুন ধাক্কার চোটে সামনের দিকে মুখ গুজ্‌রে পড়ে। আলপনা না মুছে রসুনের উপায় কী? তার উপর যেভাবে মেট্রন ফুঁসছেন— ত্রাস লাগিয়ে ছাড়ছেন। এলা বলে, 'জানো, ঐ রাগ কারো উপর দিয়ে বিশেষভাবে না চলে গেলে আর নিস্তার নেই দেখছি।'

কাল থেকে মেট্রনের এই ভাব। প্রথমে কী কারণে আমাদেরই কার উপরে যেন রেগে যান; সেটা শেষে পড়ে গিয়ে নেছার উপরে। হাতের কাছে তাকে পেয়ে বিনা কথায় চট চট দুই গালে ঠেসে থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন। বেচারি হতভম্ব— টস টস করে বেয়ে পড়া চোখের জল দু-হাতে মুছে তাড়াতাড়ি সামলে নিল।

তারপর বিকেলে যখন আলপনা দিচ্ছি আমরা, মেট্রন ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন: 'অ্যাঁ! এই-সব আবার কী; না, *টিঁ*কতে দিব না দেখছি আমারে। আ গো, আবার কোন্ ফ্যাসাদ ঘটাইতে চান— কন দেখি।' মেট্রনের হাতে ছিল একটা নোড়া, দেয়ালে কোথাও পেরেক ঠুকবেন বুঝি। নন্দিতা বললে, 'কি, লাগাবেন নাকি নোড়ার বাড়ি মাথায় এক একটা? তা ওদের যখন মারতে পারেন আমাদেরও পারবেন।' নন্দিতার কথা শেষ হতে না হতে মেট্রনের নাক মুখ দিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বের হতে লাগল। শান্তি আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্যে মেট্রনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'কেমন হয়েছে আলপনা মেট্রন? সুন্দর না? এত সুন্দর আলপনা, একবার বলুন "সুন্দর হয়েছে"।' 'কী জানি, জেলখানায় সুন্দর টুন্দর কিছু বুঝি না আমি। আমার কাছে ও-সব নাই'— বলে হঠাৎ পাক খেয়ে শান্তিকে ঠেলা মেরে হাতের নোড়াটা কাঁঠাল গাছে ছুঁড়ে ফেলে গর্‌গর্‌ করে চলে গেলেন বাইরে— একেবারে আপিস ঘরে। এ হল দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

বেলা ১০টা:

এসে বসেছি হাস্নুহানার পাশে পশ্চিমমুখী হয়ে। কচি কচি পাতা

এসেছে গাছভরা, তারই ছায়া পড়েছে পশ্চিম দিক হেলে ; একজনের বসবার পক্ষে যথেষ্ট। সামনের খাটুনি-ঘরে কয়েদিদের হাত চলছে বোনার কাজে, মুখ আজে বাজে কথায়। একটু আগেই ঝগড়া হয়ে গেছে ঘরে, মিছিরনে আর সরলাতে।' জের চলছে তার এখনো। মিছিরন বললে মারছি, আমার নিজের সোয়ামিরেই মারছি। তাতে কার কী লো? আমি তো আর পরের সোয়ামিরে মারতে যাই নাই?'

সরলা মুখ নাড়া দিয়ে নড়েচড়ে বলল, 'আ লো, হঃ হঃ, গুণ লাগে, গুণ লাগে ; পরের সোয়ামিরে মারতে গুণ লাগে, অমনিই হয় না।'

জমাদারনি ঘাগরা ধরে ছুটাছুটি করছে চোখের সামনে। দরজায় ঘণ্টি বাজছে, তালা খুলতে হবে। একবার আসছে বাজারের সওদা, একবার গুদোমের রসদ, একবার হাসপাতাল, একবার জমাদার, মেথর। জমাদারনি একসঙ্গে সামলায় কত দিক। কোন্ দিকে যায়— কাকে দেখে।

জলিল একটা লাঠি হাতে নিয়ে গানের তালে তালে খট্ খট্ করে বাজিয়ে চলেছে খাটুনি-ঘরের চৌকাঠের উপর :

এক পয়সার ফুলবাতাসা, পিঁপড়ায় কইরাছে বাসা,
বন্ধু কইরাছে গোসা ;
আমার মুখে আর হাসি ধরে না।

চোখে পরেছে পাকা আমপাতার চশমা, সুতো দিয়ে বাঁধা। তারই ফাঁক দিয়ে আড়ে আড়ে তাকায় আর গানের শেষে হি হি হি করে মনের উল্লাসে হাসে।

দিগম্বর সতু গাছের শুকনো গাঁদাগুলি ছিঁড়ছে, ছড়াচ্ছে ; আর চার দিকে চেয়ে দেখছে এ কাজে কেউ তাকে বকুনি দিতে আসছে কিনা।

কয়েকটা শালিক আমগাছের ডালে চেঁচামেচি জুড়েছে। তলা ছেয়ে গেছে শুকনো আমের বোলে। ঠিক সময়ে বৃষ্টি না পেয়ে গুটি ধরতে পারল না এবারে। উপর দিকে আবার আসছে নতুন করে কয়েকটি মুকুল কচি পল্লবের মাঝে মাঝে। এদিকে হাস্নুহানার চার দিক ঘিরে গোল বেড-এ ফুটেছে নানা রঙের ফ্লক্স ; লাল, গোলাপি, মাজেণ্টা, শাদা। গুটি তিন-চার মৌমাছি অনবরত মধু টেনে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে ঘুরে। কাল যেখানে পড়তে

পড়তে বইয়ের পাতায় নিমকাঠি রেখে উঠে গিয়েছিলাম সে পাতা খুলে কোলের উপর ঝুঁকে পড়লাম।

ধীরে ধীরে হাস্নুহানার ছায়াটুকু উত্তর দিকে হেলল। মায়া এসে তাড়া লাগাল, 'উঠুন, রান্না যে হয়ে এল ; স্নান করবেন না ?'

৯ই মার্চ। মঙ্গলবার দুপুর :

আজ রান্নার 'পালি' ছিল আমার আর 'ভাবী'র। রেঁধেছি বাঁধাকপি ভাজা, বাঁধাকপির চচ্চড়ি, বাঁধাকপির জিরের ঝোল। এখানকার মর্জিমতো তরকারি মশলাপাতি পাই, নিজেদের হাতে রান্না করে এদেরই মর্জিমতো খাই। ফোঁড়নের বালাই নেই কিছু। হাতের কাছে যা একটু ধনে জিরে পাই, তাই নখে করে কয়েক ফোঁটা গরম তেলে ছিটিয়ে ঝাল, ঝোল, ডাল, অম্বল রাঁধি। Security prisoner-রা আসার পর তবুও এটা ওটা বাজার থেকে আসে ভিতরে। রূপজান এসে দাঁড়াল সামনে কী রান্না করছি দেখতে। বললাম, 'আজকাল তো সর্ষে ঢোকে জেনানা ফাটকে। দাও না রূপজান এবারে "সর্ষে-পড়া" দিয়ে, চলে যাই অন্য জেলে চালান হয়ে। আর তো ভালো লাগে না এখানে।'

রূপজান সলজ্জ হাসি হেসে মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, 'কে কহেছে তোমাকে এমন কথা ? "সর্ষে-পড়া"র কথা জানলে কী করে তুমি ?'

কথাটা বলেছিলেন মিলনী-মা-ই একদিন কোনো এক ফাঁকে। শৈলদিরা যখন এলেন এখানে নিরামিষ রান্নার বড়ো অসুবিধা। শৈলদি বলেন, 'একটু সর্ষে কালোজিরা না হলে নিরামিষ তরকারি রাঁধি কী করে, ফোঁড়নই বা কী দিই।'

মেট্রনকে কত ভাবে অনুনয় করা গেল, গুদামিকে বলে কয়ে যদি এর একটু ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি বলেন, 'বুঝি তো আমি সবঐ ; কিন্তু কী কর্‌ম্ কন, জেলখানায় নিয়ম নাই যে, এই সব জিনিস ভিতরে ঢোকে।'

নিয়ম নাই, ব্যস্। এর উপরে আর কথা বলা চলে না। মিলনী-মা গামছা পরে শীতে কাঁপতে কাপতে হাতের তেলোতে তেল নিয়ে চলেছেন কলতলায় নাইতে। ইশারায় ডেকে বললেন, 'ও-সব বাজে কথা গো বাজে কথা। তোমরাও যেমন, শুনলে আর বিশ্বাস করলে। ওরা তো কথায় কথায়

নিয়মের দোহাই পাড়বেই। ঠেকলেই ঐ এক কথা জানে শুধু। কি না ঢুকছে জেলখানায়। এতদিন আছি জানি না কী, সবই জানি। মুখ বন্ধ, তাই চুপ করে থাকি। কি না হয় এখানে; সবই হয়, সবই ঢোকে জেলের ভিতরে। তবে হঁ্যা, সর্ষেটা আনবে না কিছুতেই, তার কারণ আছে। আচ্ছা, বলবখন পরে একসময়ে' বলে চোখ টিপে আমার বাঁদিক দেখিয়ে পাশ কাটালেন। ঘুরে দেখি রূপজান সেখানে দাঁড়িয়ে। ওর এই এক মহাদোষ। কোথাও কাউকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটু কথা বলতে দেখলেই গিয়ে পড়বে সেখানে সব শুনতে। এক-এক সময়ে এ বড়ো বিরক্তিকর।

দুপুরে সবাই যখন খাটুনি-ঘরে বন্ধ, রূপজান তাদের তদারকে ব্যস্ত; এমন সময়ে মিলনী-মা এলেন আমার কাছে 'খিল হরিবংশ'খানি হাতে করে। বললেন, 'এটা একটু পড়ে শোনাবে গো আমায়, ঐ যেখানে 'কুবলয়াপীড় বধ' হয়েছিল সেইখানটা ?'

'বেশ তো' বলে বইটা হাতে নিয়ে সূচিপত্র দেখে ঠিক জায়গা খুঁজে বের করছি, মিলনী-মা ঘাড় নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তখন বলা গেল না কথাটা, রূপজান এসে দাঁড়িয়েছিল, ওরই কথা কিনা ? তা ছাড়া জেলখানায় এ-সব বলা বারণ কারো কাছে। রূপজান যে এ জেলে চালান হয়ে এসেছে তা ঐ 'সর্ষে-পড়া' দিয়েই তো ? কলকাতার জেলে যখন ছিল কত বলা-কওয়া, সাহেব কিছুতেই আর চালান দেয় না তাকে, শেষে একদিন সে 'সর্ষে-পড়া' দিয়ে দিল অমনি তার কিছুদিন বাদে সাহেব আপনা হতে এসে বদলির হুকুম দিয়ে গেলেন।'

'সর্ষে পেল কোথায় সে ?'

'কেন, ডালভাঙার খাটুনি ছিল তো কয়েদিদের ? সেই ডালের মধ্যে দুটো চারটে গম, সর্ষে, ধান সবই থাকে যে। ঝেড়ে ঝুড়ে সর্ষে কটি বেছে নিত রূপজান তা থেকে। ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়। সরকার যতই কড়াক্কড়ি করে— পথও ততই বের হয়। কত বছর ধরে কত দেখলাম, আরো কত দেখা কপালে আছে। কত কাণ্ড এই জেলখানার ভিতরেই' বলে মিলনী-মা তার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অগাধ স্মৃতিসাগরে ডুবে চললেন।

এলা বুনছিল চিন্ময়র জন্য উলের জামা, সুরাতন এসে হেসে তার পিঠে লুটিয়ে পড়ল, 'শুনছ দিদি, তোমার বোঠানের যা কথা, হি হি হি—ই-হি-হি-হি

শুনছ।' 'কেবল ই—হি হি করলে কথা শুনব কী করে? কী হয়েছে বলই না ছাই,' বলে এলা স্বরাতনকে টেনে সামনে আনল।

স্বরাতন বললে, 'জানো, রূপজানরে তাইন কইছেন আইজ "সর্ষা-পড়া" দিতে।'

'তাতে হয়েছে কী?'

'শোনো কথা, তাইলে আর কইতে আইলাম কি তোমারে? "সর্ষা পড়া" কি সোজা কথা? তা' ছাড়া ঘর ভর্তি মানুষ—হি হি—'

'কেন, কী করতে হয় যে ঘরভরা মানুষে কাজ আটকায়?'

'সে কত নটখট, অমাবস্যা দিন দেইখ্যা করতে লাগে, নতুন সরা টরা লাগে— বুঝলাম তা না হয় আনাইয়া লইবেন। তারপর যে "পড়া" দেয় তারে উপাস কইর‍্যা থাকতে হয়; তাও হইব। শেষে তব্‌দা রাত্তিরে নতুন সরায় সর্ষা লইয়্যা চুল এলাইয়া পশ্চিমমুখী দাঁড়াইয়া "সর্ষা-পড়া" দেয়। আর যে মন্ত্র পড়ে তারে উলুঙ্গা হইয়া দাঁড়াইতে লাগে, হি হি—ই।'

সরলা আজকাল বেশ হাঁটাহাঁটি করতে পারে, শরীরও সেরেছে অনেকটা। মাঝে মাঝে এটা ওটা নিয়ে খোঁজখবরদারিও করে দেখি। গঙ্গা দাজুকে কোলে নিয়ে বসে আছে বারান্দায়, সরলা সেখানে গিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে, 'এই, তর পোলাকা চিনি কি বেশি হো গিয়া?'

গঙ্গা বললে, 'কেনো, কী হইসে?'

'কেন, কী হইছে'—সরলা তার টিনটিনে হাত তুলিয়ে ঘর আর বারান্দা দেখিয়ে বললে, 'ছাখ্‌ না, চক্ষু নাই তর? ঘরময় সব চিনি ছড়াকে বড়াকে ফেইলা রাখা। পিঁপড়ায় কামড়াইলে মরুম সেনা আমিঐ। আর কার কী হইব। ওঠ, সাফ কর শিগগির।'

দাজু রোজ দুধবার্লির সঙ্গে একটু করে চিনি পায়। তা থেকেই গঙ্গা বুঝি জমিয়েছে কিছুটা একটুকরো কাগজে মুড়ে। তারি গুড়োগাড়ি কয়েক কণা পড়ে থাকবে হয়তো মেঝেতে। সরলার চোটপাটে গঙ্গা উঠল ছেলেকে পিঠে বেঁধে।

জলিল-খতেজা খেলা করছে বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির কোনায়। প্যাণ্টের উপরে দু-খানা গামছা ঘুরিয়ে পরেছে দু-জনে, গামছার এককোনা আবার মাথার উপরে টেনে তুলেওছে কোনোমতে। জলিল জামিনার

ভঙ্গিতে হেলে দাঁড়িয়ে থুঁতির নীচে হাত রেখে বললে, 'খতে বিবি, ও খতে বিবি, আমার কানি ফুরাইয়া গেছে যে!'

খতেজা রূপজানের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে ঝংকার দিয়ে উঠল, 'কী জানি, আমি মাসে মাসে এত কানি কোত্থেইকা জোগামু বাপু! সরকার দিতে না পারে কয়েদিগো খালাস দিয়া দিলেই হয়। তোমরা এইবার ফাইলের দিনে সাহেবের কাছে নালিশ কইরো কানির লেইগা।'

সন্ধে :

মশারি টানাচ্ছি খাটের চারি দিকে ঘুরে ঘুরে।

জানালার পাশে কালো আমগাছের ফাঁকে একফালি সোনালি রাংতার মতো কি জানি চকচকে করে ঠিকরে লাগল চোখে। দ্বিতীয়ার চাঁদটি। দিন কয়েক দেখতে পাই একে ঘরের ভিতর থেকেই পশ্চিম আকাশের গায়ে শুক্লপক্ষের শুরুতে।

১০ই মার্চ। বুধবার :

সকাল থেকেই আজ 'কী করি, কী করি' ভাব। এত সময়, এত অবসর ভরাই কী দিয়ে। টেনে টেনে পা ফেলি, সময় ঢেলে দিয়ে দিয়ে কাজ করি, তবু দিনের একাংশও কাটে না। মায়ার আজ দু-দিন থেকে সর্দি-জ্বর ; নিশ্বাসে কষ্ট। শুয়ে শুয়ে পিট পিট করে দেখছে ঘরে কে এল গেল। পাশে খোলা বই। ঘরে কেউ না থাকলে পড়বার চেষ্টা চলে একটু।

ডাক্তার এলেন মায়ার বুক পিঠ পরীক্ষা করতে। বললেন, 'দেখি, একটু ঠিকঠাক হয়ে শোন্ তো ; বুক পিঠটা একবার পরীক্ষা করি।'

মায়া পাশ ফিরল পিঠ দেখাবার জন্যে।

ডাক্তার বললেন, 'না, না, আগে বুকটাই দেখি। হ্যাঁ, এইদিকেই ফিরুন। মাথাটা আর একটু তুলুন, হাঁটু দুটোও তুলে দিন, দিন। ব্যস ঠিক আছে। আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, জানালার আলোটা ছাড়ুন। আচ্ছা, এইবার আপনি জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকুন।' ডাক্তারবাবু তাঁর কোটের ডান পকেট হাতড়ালেন, বাঁ পকেট চাপড়ালেন, বুক পকেটে থাপ্পড় মারলেন, দু-হাত

প্যাণ্টের দু-পকেটে ঢোকালেন ; শেষে বললেন, 'ওহো, ভুলে গেছি। আচ্ছা তা হোক, তা হোক, আমি এখন ওষুধটা লিখে দিয়ে যাচ্ছি, খেতে থাকুন। বিকেলে এক সময়ে স্টেথিসকোপটা নিয়ে আসব। সেটা বোধ হয় বাড়িতেই ফেলে এসেছি।'

দুপুর :

লেবুগাছের তলায় কালো কম্বল বিছিয়েছি। সঙ্গে এনেছি বই, খাতা, পেনসিল, চরকা ও বালিশ একটি। ভাবছি এখন কী করি। বই পড়ি, ছবি আঁকি, সুতো কাটি, না বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ি? ভাবতে ভাবতে বাঁ কনুইয়ে বালিশে ভর দিয়ে একটু কাত হয়ে বসলাম। কোল থেকে খাতা পেনসিল নামিয়ে রাখলাম। বইটা বালিশের তলায় ঠেললাম। চরকাটা সরিয়ে দিলাম পায়ের কাছ থেকে। তারপর সোজাসুজি এক সময়ে শুয়েই পড়লাম লম্বা হয়ে বালিশে মাথা রেখে।

লেবুপাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য এসে লাগছে চোখে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। ডান চোখ ঢাকা পড়ল— বাঁ চোখ রইল খোলা। ছাদের কার্নিশে ঠেসাঠেসি পায়রার ঝাঁক। কেউ ঘুমচ্ছে পিঠে ঠোঁট গুঁজে, কেউ একপা তুলে ; কেউ চুলকোচ্ছে পিঠ, কেউ বুক ; কেউবা দিচ্ছে একে অন্যের গা ঠুকরে পরম প্রীতি ভরে। নিরালা দুপুরে কার্নিশের ছায়ায় কী নিশ্চিন্ত শান্তি ছড়ানো। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, সাড়াশব্দ নেই ; একটু আধটু গুঞ্জন— যেন ঘুমপাড়ানি গান।

হঠাৎ কী হল— চমকা ভেঙে ঝটপট সব কয়টি পায়রা একসঙ্গে উড়ে গেল। কী ঘটল এমন। মাথা তুলে দেখবার চেষ্টা করলাম চার দিক। একটা বাজ উড়ছে ছাদের উপরে। বাজটা চলে যেতে খানিকবাদে আবার এল পায়রা-গুলি একই সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে, বসল যে যার জায়গায়। কিন্তু এবারে আর সে নিশ্চিন্ত ভাব নেই, কী যেন একটা ত্রাস, গলা বাড়িয়ে, ঘাড় ঘুরিয়ে কেবলই এদিকে ওদিকে দেখছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ আবার উড়ল সব, আবার দেখি বাজপাখির বড়ো দুটো পাখা শাঁ করে চলে গেল ছাদের উপর দিয়ে। খানিক পরে আবার ফিরে এল পায়রাগুলি। এমনিতর কবারই এল গেল তারা বাজের ভয়ে। ওদিকে বেচারা বুড়ো বাজটি বসে আছে ছাদের কোনায়

লোহার শিকের উপর পালক-খসা লেজটি ঝুলিয়ে, তাকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করে না একটু।

নিমগাছের গোড়া ঘিরে ফুটেছে কয়েকটা পিটোনিয়া, ফ্যাকাসে রঙের। গোল বেড়ার গায়ে সুইট-পির ডগাও বেয়ে উঠেছে গোটা কয়েক। এই পাঁচ-ছয়টা গাছের জন্য একদিন কত সমারোহে জমাদার কয়েদি এসে বেড়া তুলে দিয়ে গেল। একটি কাঠি একচুল বেঁকেছে কি সপাসপ বেত পড়েছে তাদের পিঠে।

সেই সুইট-পিতে ফুল এসেছে, কুঁড়ি ধরেছে। এখানে এরা সুইট-পিকে বলে মটর ফুল, পিটোনিয়াকে বলে কলমি ফুল। মিছিরন বলে, 'কতই দেখলাম জেলখানায় আইস্যা, না হইলে এও নি আবার শখ কইর‍্যা বাগানে আইন্যা লাগায় মানষে। আমাগো খেতে খামারে কত রাশি রাশি ফুইট্যা থাকে এই ফুল।'

গোবর দিয়ে নিকানো বেলফুল গাছের গোড়ায় জল ঢেলে রেখেছে দুপুর থেকেই, যার পালি ছিল জল দেবার। সেই জলে স্নান করছে দুটি শালিক, পাখার জল চার দিকে ছিটিয়ে দিয়ে। একবার করে মাথাটা জলে ডোবাচ্ছে, বুকে ভর দিয়ে পাখার আধখানা ভিজিয়ে নিচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে জল ঝাড়া দিয়ে ফেলছে ; ঠোঁট দিয়ে বুক খুঁটছে, পালক খুঁটছে, কিচিমিচি ডেকে উঠছে আর চুলবুল করে চার দিকে তাকাচ্ছে। তাড়াহুড়োর অন্ত নেই এদের।

স্নান সারা হলে উড়ে এসে বসল তারা নিমগাছের ডালে। ডালের ডগায় ডগায় লাল লাল কচি পাতা। ভাবী বসে বসলেন পাশে। নিমগাছের দিকে মাথা তুলে বললেন, 'হারে রানীদি, এইরকম লাল লাল নিমপাতা আমাদের দেশে ডালের বেসন দিয়ে একটু তেঁতুল মিশিয়ে ভাজে। খেতে খুব সোয়াদ লাগে। করব একদিন ; খাবা ?'

১১ই মার্চ। বৃহস্পতিবার :

কাল রাতে স্বপ্ন দেখলুম, দলে দলে শকুন উড়ে যাচ্ছে মাথায় উপর দিয়ে প্রকাণ্ড দুই ডানা দু-দিকে মেলে। বুকে, ঠোঁটে, পালকের তলায় পড়েছে তাদের সূর্যাস্তের আভা ; নীচে দাঁড়িয়ে আমি বলছি, কী সুন্দর কী সুন্দর!

মায়া শুনে উৎসাহ দিয়ে বললে, 'লিখে রাখুন সব স্বপ্নগুলি তারিখ দিয়ে দিয়ে। জানেন, পাগল যারা হয় তাদের মানসিক চিকিৎসার খুব সুবিধে হয় স্বপ্নগুলি জানতে পারলে।'

এলা বললে, 'কেন মিছে মন খারাপ করছ। শকুন স্বপ্ন দেখা মোটেও খারাপ নয়। চিল দেখ রোজ উড়তে, স্বপ্নে না হয় শকুন দেখেছ; কি আর হয়েছে তাতে।'

শৈলদি বললেন, 'ভালোই দেখেছেন, স্বপ্নে যে-কোনো পাখি দেখা-ই ভালো।'

সুষমাদি বললেন, 'স্বপ্ন স্বপ্নই। ওর জন্য আবার ভাবছেন কী? ও সত্যিও না, মিথ্যাও না।'

তবুও মন মানে না উষাদি নাকি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানেন। তাঁকে গিয়ে জিগগেস করলাম, 'সব ছেড়ে শেষে শকুন কেন দেখলাম বলুন তো।'

উষাদি খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ভাবলেন, পরে বললেন, 'তার মানে, আপনার কেউ মারা যাবে শিগগিরই।'

দুটো বড়ো বড়ো দাঁড়কাক সামনের বেলফুল গাছ থেকে কচি কচি পাতা শুদ্ধ সরু সরু ডাল তাদের শক্ত ঠোঁট দিয়ে মটমট করে ভেঙে নিয়ে উড়ে গেল।

১২ই মার্চ। শুক্রবার সকাল:

মুণ্ডাদের ছেলেটা বসতে পারে না মোটেই। কোমর থেকে নীচের অংশগুলি লিকলিক করে ঝুলছে যেন শরীরে। মাথাটা টাল খায় সারাক্ষণ ডাইনে বাঁয়ে, কোনোমতে ধরে বসিয়ে দিলে পেটটা উঠে আসে গলার কাছে.মাথাটা ভেঙে পড়ে পেটের উপরে, তারপর টলে পড়ে যায় সামনের দিকে মুখ থুবড়ে। তিন ছেলে মরে যাবার পর এই ছেলে। অতি আদরের; মা-দিদিমার কোলে কোলেই থাকে। মেট্রন রোজই চেঁচামেচি করেন, ছেলেটার জন্য দুধ বার্লি দেওয়া হয়, তা, মা দিদিমাই খেয়ে নেয়; বলে, ছেলে নাকি দুধ খেতে চায় না একেবারে। মার বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে কোন্‌কালে। সেই অবধি ছেলের গোটা গোটা ভাত খেয়েই অভ্যেস। ভাতের জন্য কাঁদে সারাক্ষণ—ম্যাঁ—া—া,—ম্যাঁ—া—া—া।' নেছা বলে, 'ছেইলাটার কাঁইদবারও শক্তি নাই গো।'

মেট্রন আজ জোর করে কয়েক চামচ দুধবার্লি ঢেলে দিয়েছিলেন ছেলেটার গলায়। কাঁঠালতলায় দিদিমার কোলে বসে সে নিশ্বাসের সঙ্গে উগ্‌রে তুলছে দুধবার্লি ; আর ছেলের মা দিদিমা বিড় বিড় করে বকে চলেছে সমানে মিটিন রূপজানকে। ছেলেটার মাথার পিছন দিকে ঘাড় অবধি থক্‌থকে ঘা। মিটিন ডাক্তারের দেওয়া শাদা মলম লাগিয়ে দিয়েছে তাতে নিজের হাতে মা-দিদিমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। সেই শাদা মলমই ঘাড়ের দিক থেকে মাথার ভিতর ঢুকে এখন মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। দিদিমার রাগ আর থামে না ; কাঁঠাল পাতা দিয়ে চেঁছে চেঁছে ঘায়ের মলম তুলে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত।

এলা এসে বললে, 'দেখেছ বউদি, পুবকোনার লেবুগাছে টুনটুনিতে কী সুন্দর বাসা বেঁধেছে ? কিন্তু কি জানো, টুনটুনির বাসা এমন হয় না ; দুটি পাতা বেশ সেলাই করার মতো জোড়া দিয়ে উপরে আর একটি পাতা ঢাকনার মতো দেয়। এ যেন বাবুই পাখির বাসার মতো অনেকটা।' বলতে বলতে দু-জনেই এগিয়ে গেলাম লেবুগাছের কাছে। ছোট্ট পাখি এক ছোট্ট তার ঠোঁটটি বের করে বসে আছে বাসার ভিতরে। আমাদের দেখে ফুর্‌র্‌ করে উড়ে গেল বাসা ছেড়ে। এবারে আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। কী সুন্দর বাসাটি। আমগাছের গায়ে লাল পিঁপড়ের বাসাগুলি ঝুলছিল লম্বা লম্বা 'শিবের জটা' ফুলের মতো, তাই দিয়েই ঝুলিয়েছে নিজের বাসাটি লেবু ডালের সঙ্গে। চরকা-কাটা ছেঁড়া সুতো এনে জড়িয়েছে তার গায়ে গায়ে চারদিক ঘিরে। শুকনো ঘাস পাতাও আছে দু-চারটি। বাসার দরজার মুখে খানিকটা চাল এগিয়ে দিয়েছে, বৃষ্টির জল যাতে না যেতে পারে ভিতরে। চালটা ঠিক যেন মুদির দোকানের সামনেকার ঝাঁপ একটি, হুবহু তারই নকল। বাসার ভিতরে পাতা নেটের মতো শুকনো অশত্থ পাতা। কী নিখুঁত পরিপাটির কাজ। ছোট্ট পাখির ছোট্ট ঠোঁটে এমন কাজও সম্ভব ? তন্ময় হয়ে দেখছি আর ভাবছি। লক্ষ্য করি নি মাথার উপরে বাসার মালিকের অস্থির গতিবিধি, অধৈর্যের ছট্‌ফটানি। সরে এলাম তাড়াতাড়ি সেখান থেকে— মনের মাঝে বাসাবাঁধার কারুকাজটুকু গেঁথে নিয়ে।

সাবিত্রীদি বললেন, 'ও তো মৌ-টুসকি, আমাদের দেশে আছে অনেক।'

দুপুর :

যমুনা ছাড়বে না কিছুতে ; তাস খেলতে হবেই। বসে গেলাম খেলায় ; একদিকে আমি আর মায়া, অন্য দিকে নন্দিতা তার যমুনা।

ধোপা এসেছে কাপড় নিতে, মায়াই ফি-বার হিসেব মিলিয়ে কাপড় দেয় নেয়। খেলা জমে উঠেছে, মায়াকে এ সময়ে ছাড়া যায় না। ভবানীই মায়ার হয়ে হিসেব লিখে কাপড় বুঝিয়ে দিল ধোপাকে। মায়ার সোয়াস্তি নেই মনে, যে কাজের ভার নিজে নিয়েছে, সে কাজ কি নিশ্চিন্ত মনে ছাড়া যায় অন্যের উপরে, কেবল সে উস্‌খুস্‌ করছে 'কাজটা কি ভালো হল ? আচ্ছা, দশ-মিনিটের ব্যাপার বইতো নয়। আপনাদের যেন যত সব ইয়ে' ভবানী ঘরে ঢুকতে মায়া বললে, 'ঠিকমতো মিলল তো সব ?'

ভবানী বললে, 'সবই ঠিক হল, তবে আপনার আধখানা বডিস নিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না ধোপা। যদি বা নিল, বললে, 'ঠিকমতো ফিরে পাবেন কিনা জানি না'।'

মায়ার বডিসের আধখানা কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যায়, বাকি আধখানা লোটাতে থাকে ঘরের এ-কোনায় সে-কোনায়। নন্দিতা কুড়িয়ে নিয়ে তা ময়লা কাপড়ের পুটলিতে রেখে দেয়। ভবানীর কথা শুনে মায়া লজ্জায় তেতে উঠল, বললে, 'যত সব কাণ্ড, ওটা আবার ধোপা বাড়ি দেবার দরকার ছিল কি ?' নন্দিতা বললে, 'জানেন ঐটুকু টুকরোই ধুয়ে এলে কত কাজ দেবে। জেলখানায় আবার লজ্জা কি ?'

কিন্তু মায়ার লজ্জা আর কাটে না। থেকে থেকে কেবলই 'ছিঃ, ছিঃ' করে উঠছে। বলে, 'সত্যিই কী লজ্জার কথা বলুন তো, আধখানা বডিস—।'

এলা বললে, 'শুকোতে যখন দেবে ধোপা সবাই তো তা দেখবে। কী হবে মায়া ?'

যমুনা বললে, 'কেউ যদি কবিতা লেখে তা নিয়ে ?'

নন্দিতা বললে, 'তা হতে পারে বইকি, নিশ্চয়ই হতে পারে। আধখানা বডিস কি কম রসদ আধুনিক কবিতা লেখার পক্ষে ? এমন কত কত দৃষ্টান্ত দেখা যায়।'

আধখানা বডিসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা মন্তব্য শুনে মায়া আর স্থির থাকতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতেও পারে না। দেখতে দেখতে সারা মুখ তার

লাল হয়ে উঠল। মায়া তাস কাটতে গিয়ে বাটতে লাগল, বাটতে গিয়ে কাটতে থাকল। জুড়ি, বেজুড়ি ভুলে গেল।

নন্দিতা বললে, 'কী মায়াদি, আপনি নাকি আরো সেদিন রানীদিকে জিগগেস করেছিলেন 'পূর্বরাগ' মানে কী ?'

মায়া মুখে তাস চাপা দিয়ে বলল, 'এত বড়ো হয়েছি, মানে কী আর জানি না ? তা জানি। তবে, জানতে চেয়েছিলাম, 'পূর্বরাগ' যে হয় তা জানতে পারে কি করে ?'

বিকেল :

মেট্রনের সঙ্গে একটি মেয়ে এসে ঢুকল জেনানা ফাটকে। দু-পা এগিয়েই কেমন ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে রইল সে। কী রূপ ! আধময়লা একটা মিলের শাড়ি পরনে, হাতে কয়েকগাছা কাচের চুড়ি ; ছিপছিপে গড়ন, সুর্মা-টানা দুটি কালো হরিণ চোখ, বেসর-পরা টিকোলো নাক, ভুরু, কপাল, ঠোঁট, গাল, থুঁতি সব জড়িয়ে অপরূপ এক শ্যামলী-সুন্দরী। ইচ্ছে হয় দু-হাতে এই মুখখানি তুলে ধরে চেয়ে থাকি খানিক।

মেয়েটি ভয়ে, আতঙ্কে আড়ষ্ট। আচলের নীচে বুকের কাছে হাত দুটি কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে। এগিয়ে বললাম, 'কে তুমি ?'

সে সুর্মা-টানা চোখ দুটি মেলে বললে, 'আমি নূরজাহান গো।'

হঠাৎ কেমন খুশি হয়ে উঠলাম। এই নাম না হলে কি এই রূপ মানায় ?

মেট্রন বললেন, 'সোয়ামি ডাকাতি কইর‍্যা উধাও হইছে। দারোগা তারে না পাইয়্যা এরেই ধইর‍্যা আনছে। ভাবছে, এরে ধইর‍্যা রাখলেই সে আইস্যা আপনা হইতে ধরা দিব।'

নূরজাহান সকলের ভিড় ঠেলে ছুটে এসে দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল।

এলা এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'আমরাই তো আছি, ভয় কি তোমার ? চলো, হাত মুখ ধোবে চলো। কত মজার মজার গল্প বলব তোমায় আজ রাত্রে। মনে করো, যেন বোনের বাড়ি বেড়াতে এসেছ কয়দিনের জন্য। চলো, চলো—।'

এলা নূরজাহানকে নিয়ে গেল কলতলায়। সে ফিরে ফিরে তাকায়

আর এদার সঙ্গে এগোয়। ভাবী বললেন, 'মেইয়াটাকে তুমি আগে হতে জানতে নাকি ?'

বললাম, 'না।'

'তবে যে ও সবাইকে ফেলে তোমার কাছে অমন কইরে ছুটে গেল ?'

১৩ই মার্চ, শনিবার সকাল :

চারি দিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। দেয়ালের ওপাশের গাছগুলি লাগছে যেন হালকা কালি দিয়ে আঁকা ছবি কয়েকটি। তারই গা ঘেঁষে উড়ে চলেছে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা হাওয়ার বেগে উত্তর থেকে দক্ষিণে। দীপ্তিহীন রুপোর থালার মতো পুব আকাশে নিস্তেজ সূর্য, ক্ষণে দেখা দিচ্ছে ক্ষণে ঢাকা পড়ছে।

রাত্রি :

বাইরে আবছা চাঁদের আলো। এই আলোয় জেলের আঙিনাটুকু, পাতি-লেবুর গাছ কয়টি, তাদের ক্ষীণ ছায়া, জেলখানার উঁচু শাদা দেয়াল, দেয়ালের ওপাশের গাছগুলি— কোনোটা ঘন কালো, কোনোটা বা হালকা; একপাশ জুড়ে শিরিষ গাছের ছড়িয়ে-পড়া মাথা— সব-কিছু জড়িয়ে লাগছে যেন স্বপ্নময় ছবি একটি। দখিন হাওয়া বইছে বাইরে। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছি মুখোমুখি জানালার ধারে। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগছে মুখে। আজ আর মন বসছে না কোনো কাজে।

১৪ই মার্চ, রবিবার। দুপুর :

বসে আছি খাটুনি-ঘরের দোরগোড়ায়, তেল মেখে গামছা শাড়ি হাতে নিয়ে। কলতলায় ভিড়ের বিরাম নেই। এবেলা স্নানের আশা ত্যাগ করতেই হয় বুঝি বা। রবিবার, ছুটির দিন। কয়েদিদের ভাটি চেপেছে সেই কোন্ সকালে। চার দিক ঝাঁট-পাট দিয়ে নম্বর ধুয়ে-মুছে, আঙিনা নিকিয়ে, বাগান খুঁড়ে নালা নর্দমা পরিষ্কার করে, জানালার শিকে তেল লাগিয়ে ইত্যাদি নানা রকম কাজ সেরে এখনো কাপড় কেচে উঠতে পারে নি সকলে। তার পর আছে তাদের গা মাজবার পালা, মাথা ঘষবার তাড়া। জোড়া জোড়া সখী

বসে এ-ওর পিঠ ঘষে, হাত মাজে ; একজন দু-পা সামনে টান করে মেলে, অন্যটি দু-হাতে গামছা নিয়ে উবু হয়ে 'হেঁইও' 'হেঁইও' শব্দে পায়ের পাতা থেকে কোমর অবধি যেন মসলা বাটতে থাকে। প্রতিটি মুখের সংস্কারও হয় কত আজ। একজন তার মুখখানা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেয়, অন্যটি সে মুখখানা বাঁ-হাতে তুলে ধরে ; তারপর ডান-হাতের আঙুলে গামছা জড়িয়ে তাতে সাবান লাগিয়ে কখনো ধীরে কখনো বা জোরে রগড়ে রগড়ে তোলে থুঁতি, গাল, কপাল, নাক ও কানের দু-পিঠের তেল ময়লা আরো কত কী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

ভাবী বলেন, 'হা, রে, এত ঘষাঘষি করিস, তোদের গা জ্বালা করে না ? আমার হলে তো গায়ের চামড়া ফাটি যেইত।'

গঙ্গা কাচা কাপড় রোদ্দুরে মেলে দিতে দিতে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে কাঁঠালতলায়। গঙ্গাকে পড়ে যেতে দেখে কলতলা থেকে সবাই হৈ হৈ করে ছুটল সেদিকে। রূপজান গঙ্গার মাথা ধরে চেঁচাচ্ছে— 'জল, জল আনো কেউ তোমরা।' সবাই ছুটে এল, আবার কলতলায় চৌবাচ্চা থেকে কেউ নিল জল টিনে ভরে, কেউ বালতিতে, কেউ-বা মগে। রূপজান জল ঢালতে লাগল সমানে গঙ্গার মাথায়, মুখে, চোখে।

বেচারা গঙ্গা, চুপচাপ থাকে, কথা বলবার ইচ্ছে হলেও পারে না বলতে সব ; ভাষা জানে না। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের দু-চারটে কথা সখীর কাছে বলা-কওয়ার পথ বন্ধ তার।— নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্যরা যখন সখী নিয়ে হাসাহাসি করে, আঁচলে দু-ফোঁটা চোখের জল মোছে ; গঙ্গা চেয়ে থাকে সেদিক পানে, কত কি ভাবে হয়তো বা। গঙ্গার সখী জবা, তার ঝোঁক বেশি শিশু দাজুর উপরেই। ছেলেকে উপলক্ষ করেই তাদের বন্ধুত্ব। দাজুকে খেলা দিতে গিয়ে যা কথা বলে তারা, দাজুর রঙ্গ দেখে খিলখিলিয়ে হাসে তার অনেক বেশি।

কয়দিন হতে দাজুর শরীর খারাপ, সারা রাত ঘুমতে দেয় না মাকে। তার উপরে মশার কামড়। দিনে থাকে জেলের খাটুনি ; অবসর মেলে না গঙ্গার। রাতের ক্লান্তি, দিনের অবসাদ জমাট বাঁধে দিনের পর দিন। শরীর আর পারে না বইতে। অসময়ে জানান দিল তাই এমনি করে।

ধরাধরি করে তুলে আনা হল বারান্দায় গঙ্গাকে। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তার এলেন, ওষুধ খাওয়ালেন। বলে গেলেন সাবধানমতো শুইয়ে

রাখতে, মাথায় হাওয়া দিতে। পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে গঙ্গার দু-হাঁটুতে, বুকে, কনুইয়ে। রূপজান আইডিন লাগিয়ে দিল সে-সব জায়গায়।

গঙ্গা এতদিন পরে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমচ্ছে। অন্যরা গিয়ে যে যার কাজে লাগল। 'পাহারাওয়ালিরা' গঙ্গাকে ঘিরে বসে রইল।

এতক্ষণে স্নান করতে ঢুকলাম বালতি ভরা জল নিয়ে বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটুকুতে। সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছি সরলা মুরুব্বিয়ানা চালে কাকে যেন বলছে গঙ্গার কথা, 'অলক্ষ্মীতে ধরেছে অরে, অলক্ষ্মীতে। হইব না? খাইতে বইব চুল উদ্লা কইর্যা। চলে, ফিরে, আঁচল মাটিতে লুটাইয়া দিয়া। আর, কাঁচা পোয়াতি, বুকের কাপড় তো সামলায় না কখনই। মাইনষের বুঝি নজর লাগে না?'

১৫ই মার্চ, সোমবার সকাল :

খবরের কাগজে আজকাল না থাকে কোনো উত্তেজনা, না পাওয়া যায় কোনো কিছুর সঠিক বিবরণ। খবর যা দেয়, সব ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হাতে নিয়ে পাতা উলটোই চোখ বুলোই, সময় কাটে খানিকটা।

জমাদার এসেছে মেথর মেট নিয়ে জেনানা ফাটকে কাজ করাতে। দেখে ভাবী দৌড়ে গেলেন আমতলায়। এখানকার সব জমাদারদের সঙ্গেই ভাবীর বেশ ভাব। তারাও 'বহিনজি' 'বহিনজি' করে খুব খোঁজখবর নেয়। বাইরের দু-চার খবর ভাবীর কৃপায় আমরা পেয়েও থাকি মাঝে মাঝে। জমাদাররা কেউ এলেই ভাবী 'এ ভাইজি' বলে হেসে বিহারী গ্রাম্য হিন্দিতে আলাপ জুড়ে দেন। মেট্রন কেবলই উসখুস করেন, কথাবার্তার এক অক্ষরও বুঝতে পারেন না। ছটফটানি তাঁর বেড়েই চলে। কথাই যদি ধরতে না পারেন তবে আপিসে গিয়ে নালিশ করবেন কী? ভাবীর তাই বড়ো সুবিধে। আর আমাদের বেলায় কেউ যদি কোনো আলাপ করেছি, কি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে, আর জমাদার যদি 'হ্যাঁ-না' কিছু বলেছে বা ঘাড় নেড়েছে, তবে আর রক্ষা নাই। আমাদের 'টিকিটে' কথা তো উঠলই; পরদিন থেকে সেই জমাদারকেও আর দেখি না জেনানা ফাটকে ঢুকতে কোনোদিন।

মায়া বলে, 'জানেন, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে যে-শত্রুতা, যে নীচ-নিষ্ঠুর

ব্যবহার করে, কোনো ছেলে-ছেলেতে এমন নেই। জানি তো, শুনেছিও অনেক, আমাদেরই কত জন, কত আত্মীয়, ধরতে গেলে জীবনটাই কাটিয়ে দিল জেলে জেলে। ছেলেদের 'ওয়ার্ডে' তারা কত সুযোগ সুবিধা পায়, কত কিছু আনায়, নেয় ; সে তো এই-সব জমাদারদের দিয়েই ?'

গল্প শেষ হতে ভাবী এসে ধপ করে পাশে বসলেন। মুখখানা যেন গম্ভীর একটু। 'কী হল ?'

ভাবী বললেন, 'জমাদার আজ কী বলছিল শুনবা ? বলছিল কি, "বহিনজী, তুমি বাঙালিদের সাথে বেশি মিশিও না। এরা ভালো লোক না আছে।" আমি বললাম, "কেনে ভাইজি, এমন কথা কেনে বলছ তুমি ?" সে বললে, "এই তো দেখ না কেনে, তোমরা সবাই একই কাজে এইসাছ এখানে ; কারো ঘরবাড়ির কিছু হইল না, কেবল তোমার বাড়িঘরই সরকার লিই লিল"।'

মেথর দুটির মধ্যে কী নিয়ে ঝগড়া হল। মুখ চলতে চলতে নিমেষে হাতাহাতি। একজন চুন লাগাচ্ছিল নর্দমায় বাঁশের কঞ্চিতে পাট জড়িয়ে ; তাই দিয়ে মারল এক ঘা অন্যটির মাথায়। খানিকটা চুন চোখে ঢুকে গেল তার। এক হাতে চোখ চেপে সঙ্গীকে রুখে যাবার মুখে মেট টেনে আনল তাকে কলতলায়। সবাই এসে জমল সেখানে, বকাবকি করতে লাগল অন্য মেথরটাকে।

মেট্রন জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন তার চোখে। এলা খানিকটা তুলো ভিজিয়ে এনে দিল হাতে। সকলের সহানুভূতি ও হৈচৈ-এ, এবারে সে তুলোটুকু চোখে চেপে ধরে চৌবাচ্চার পাড়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

সুষমাদি বললেন, 'এরা তো কেউ মেথর নয়, জেলে জোর করে এদের দিয়ে মেথরের কাজ করায়।'

শৈলদি বললেন, 'এরাও ইচ্ছে করেই করে বোধ হয়।'

চিনু বললে, 'নিশ্চয়ই।'

ভবানী বললে, 'খাবার লোভেই তো মেথরের কাজ করে এরা। মাংস পাবে খেতে, কাপড়ে নীল দিতে পাবে, রোজ বিড়িও পায় কয়টা করে যেন।'

উষাদি বললেন, 'বিড়িটাই আসল কথা। দিদির কাছে শুনেছি, আরো

একটা সুবিধা আছে এদের। ধরুন, এই-সব ময়লা নিয়ে যেখানে ফেলে, সে জায়গার মাটিটা তো খুব fertile হয়, সেখানকার গাছপালা শাকসবজিও খুব ভালো হয়; কিন্তু তা অন্যেরা কেউ খায় না। সেই মাটিতে ওরা লঙ্কা গাছ লাগায়।'

দুপুর, লেবুতলা। বেলা তিনটে :

চোখের সামনে জেলারের বাড়ির ছাদে রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে জেলেরই বোনা সতরঞ্চি একটি। সূর্যের আলো সেই সতরঞ্চিতে পড়ে ঠিকরে এসে লাগছে চোখে। নানা রঙের, নানা নকশার প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি চলছে যেন ঐ একখানি সতরঞ্চির বুকের উপর। নীল, গোলাপি, ম্যাজেণ্টা, হলুদ, কমলা, সবুজ, লাল, বেগুনি রঙে— কার্নিশ, লতা, বরফি, পদ্ম, হরিণ, গাছ, লেখা কোনো নকশা বাদ পড়ে নি। ধাঁধা লাগে সেদিকে খানিক চেয়ে থাকলে।

সেলাইর ডেপুটি জেনানা ফাটকে আসতে এলা তাঁকে শুধোল, 'আপনিই বুঝি সতরঞ্চি আসন সব বোনান পছন্দ মাফিক?'

একমুখ হেসে খুশিতে গলে গেলেন ভদ্রলোক, বললেন, 'হ্যাঁ, কম কষ্ট করে রঙ জোগাড় করি, ডিজাইন বের করি? তার উপর যুদ্ধের বাজার, বেশির ভাগ টকটকে রঙগুলি পাওয়াই যায় না। ঐ দেখুন না, ঐ যে সতরঞ্চিখানা, সবুজ রঙটা একটু ম্যাড়মেড়ে। ওটা যদি বেশ টকটকে সবুজ হত তবে লালটার পাশে কেমন মানাত বলুন দেখি। শুনেছি আপনারা আঁকাটাকা জানেন একটু। দিন-না দু-একটা ডিজাইন আমাকে সতরঞ্চির জন্য। ভাবনা কি, আমি আবার শুধরে-টুধরে নেব এখন।'

এলার তো মহা উৎসাহ। বসে বসে থাকার চেয়ে একটা কাজ পাওয়া গেল তবু। বললাম, 'কী রকম ডিজাইন চান?'

ডেপুটি জেলার বললেন,'যা হয় করুন-না দেখি; পরে আমি তো আছিই। এই করতে করতে হাত পাকালাম কি কম? তবে হ্যাঁ, যা করি সবই তো আর ভালো হয় না তেমন! একটা কিন্তু খুব সুন্দর উতরে গিয়েছিল। তেমনটি আর হল না। যেমন সুন্দর নকশা তেমনি সুন্দর রঙও মিলিয়েছিলাম তাতে। বেশি বড়ো না, মাঝারি সাইজের সতরঞ্চি, তার চার দিকে দিয়েছিলাম

গোলাপ আর পদ্মফুলের লতা, মাঝে ছিল যেন জল থেকে উঠেছে আধ-ফোটা পদ্ম একটি— দু দিকে দুটো খোলা পাতা, তার দু পাশে দুটো হাঁস পদ্মের কুঁড়ি ঠোঁটে নিয়ে গলা উঠিয়ে আছে, জলের সেডটা নীলে শাদায় এমন মিলিয়ে দিয়েছিলুম— ভারি চমৎকার হয়েছিল। আর পদ্মের উপরে দু দিকে অর্ধ-চন্দ্রাকারে লাল টুকটুকে রঙ দিয়ে লেখা ছিল, যার জন্য সতরঞ্চিটা হয়েছে, তার ও তার স্ত্রীর নাম।

এলা হিড়হিড় করে টেনে আনল আমায় সেখান থেকে। বললে, 'এই বর্ণনার পরও এদের ডিজাইন সাপ্লাই করবে এত বড়ো বুকের পাটা তোমার? তার চেয়ে কাল বরং মেট্রনকে দিয়ে বলে পাঠাব জেলারকে, এর পর থেকে সতরঞ্চি, আসন, যা-কিছু রোদ্দুরে দেবার, ছাদের ওপাশ দিয়ে যেন মেলে দেন। নজরে না পড়লেই হল।'

হাসপাতাল থেকে টিকার বীজ ও ছুরি-তুলো, স্পিরিট দিয়ে গেল। মেট্রন হাঁক দিলেন— 'আসো, তোমরা সকলে এইখানে যে যেইখানে আছ।'

সরলা ছুরি দেখেই ছুটে দে দৌড় সেখান থেকে। বলে, 'মাইগগো মা, ছুরি-কাঁচি দেখলে আমি আর আমার মধ্যে থাকি না। ভিতর থেইক্যা পরাণটা যেন বাইর হইয়্যা যায়।'

শুধু সরলা কেন, ছুরির ভয়ে কেউ আর এগোয় না। মিটিন হাতের কাছে মরিয়ম, সৈয়দাকে পেয়ে দু-হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল মেট্রনের কাছে। মেট্রন খানিকটা তুলো স্পিরিটে ভিজিয়ে হাতের আঙুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে মরিয়মের বাঁ-হাত টেনে নিয়ে ঘষে ঘষে মাখালেন। তার পর কষে ফুঁ লাগালেন। স্পিরিটটা শুকোতে হবে তো? এবারে টিউব থেকে দু-ফোঁটা বীজ হাতে দিয়ে টুলের উপর থেকে ছুরিটা তুললেন। এতক্ষণ মরিয়ম চুপ ছিল, এবারে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। মেট্রন দেখেও তা দেখলেন না, শুনেও শুনলেন না। বরং দাঁতে দাঁত পিষে কঠিন মুখে ছুরির ডগাটা হাতের আঙুল দিয়ে বেশ করে মুছে তারার মতো ছয়-ছয় পোঁছ লাগিয়ে দিলেন এক-এক ফোঁটাতে।

এমনি করে চলল টিকা-পর্ব। একের পর এক মিটিন ধরে আনে কয়েদিদের, আর মেট্রন ফুঁ দিয়ে স্পিরিট শুকিয়ে ছুরির পোঁছ লাগান।

এত পরিপাটির টিকা, তাও কদমমণির রক্ত বের হয় না একটুও। কদমমণি

বারে বারে হাত টিপছে। বলে, 'দেখছেন মেট্রন-মা, এত কইর‍্যা টিপতে লাগছি তবুনি রক্ত বাইর হয় একফোঁটা?'

মেট্রন বললেন, 'না, বাইর হইব না? দেখি কেমন বাইর না হয়।' এবারে মেট্রন মুঠো করে ছুরিটা ধরে ডগা দিয়ে উপরি উপরি খোঁচা মারতে লাগলেন কদমমণির হাতে। বললেন, 'দেখ, বাইর হইল কিনা দেখ।'

রাত্রি সাড়ে দশটা :

জামিনাকে আজ আবার বোবায় ধরেছে। আর্তস্বরে গোঁ গোঁ করে চলেছে সে। আশে পাশের কেউ যে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেবে, তা করে না এরা। বলে, জামিনা যে স্বামীকে খুন করে জেলে এসেছে সেই মরা স্বামীর ভূত এসে চেপে ধরে ওকে রাত্তির বেলা। ঐ সময়ে জামিনাকে কে ছুঁতে যাবে রে বাবা' ভূত শেষে তারই কাঁধে এসে ভর করুক আর-কি। ভূতকে ঘাঁটানো কি সহজ কথা? যাক্, আজ জামিনা নিজ হতেই জেগে গেল খানিক পরে। নয়তো এক-একদিন প্রায় সারারাত চলে এমনি, ঘুমের মধ্যে সে যে কি ভাবে কাঁদতে থাকে— মনে হয় দম আটকে যায় বুঝি বা।

মিলনী-মাকেও বোবায় ধরত খুব। জিগগেস করতাম, 'কী স্বপ্ন দেখেন আপনি সে সময়ে?' তিনি বলতেন, 'কী জানি গো, সব তো মনে থাকে না পরে। ডান পাশ ফিরে যখন ঘুমোই, তখনকার স্বপ্ন ঘুম ভাঙলেই ভুলে যাই। আর বাঁ পাশ ফিরে যখন ঘুমোই, তখনকারটা মনে থাকে। কাল দেখছিনু কি, এই গলা-সমান উঁচু একটি পাঁচির, তার উপরে বসে একটা বেড়াল আমায় খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে আসছে আঁচড়াতে; আর ভয়ে আমি মরি। যতবার বেড়ালটা অমনধারা করছে— ততই আমি চেঁচাতে নাগনু। শেষে রাধা আমায় ডেকে জাগিয়ে দিলে।'

কেরোসিনের লণ্ঠনটি সন্ধে থেকে মিটিমিটি করে জ্বালিয়ে রেখেও আর তাকে বাঁচানো যায় না; এবারে সে নিভবেই। তাড়াতাড়ি উঠে হাতে পায়ে মাথায় জল দিয়ে নম্বরটা একবার ঘুরে এলাম। সুরাতন, সৈয়দা সবাই ওরা ঘুমচ্ছে। মুখের নাক অবধি খোলা রেখে শরীরের সবটা ঢেকে নিয়েছে মোটা ছোটো চাদরখানা দিয়ে। কপালে নাকে কালো হয়ে ভিড় করেছে মশার দল।

বাসু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জানালার শিক ধরে। চেয়ে আছে জেলারের বাড়ির সেই অন্ধকার জানালাটির দিকে। এ কয়দিন সমানে সে দাঁড়িয়ে থাকে এখানে কত রাত অবধি। প্রথম দিন বুঝতে পারি নি। রাধা ছিল কাছে, জিগগেস করলাম, 'এত রাতে বাসু ওখানে কী করে?' রাধা বললে, 'করবে আবার কী? চালান যাবে, তাই দেখে নিচ্ছে যতটা পারে। ঐ জানালাটা বারান্দাটা দেখেই ওর সুখ।'

১৬ই মার্চ। মঙ্গলবার :

রূপজান নিয়ে এল ছোট্ট একটি নীল রঙের কাপড়ের টুকুরো দিয়ে সযত্নে জড়ানো কয়েকখানা চিঠি। গত দশ বছরে পেয়েছে সে এগুলি তার স্বামী-পুত্রের কাছ থেকে। পুত্রগর্বে স্বামীগর্বে রূপজানের সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে এমন কেউই নেই এখানে। কারো সঙ্গে ঝগড়া বাধলেই রূপজানকে বলতে শুনি, 'একটু একটু ছুকরিরা সব, জেলে ঢুকতে না ঢুকতে সোয়ামিরা ফের সাঙা করে নিল। আবার মুখ লাড়িশ কোন্ মুখে লো?' এর পালটা জবাব দিতে পারে না তারা। রাগে শুধু গরগর করতে থাকে। সকলেই জানে রূপজানের স্বামী তার অপেক্ষায়ই আছে এখনো। গত দশ বছরে সে সাঙা করেছে এমন কথা শোনা যায় নি ভুলেও।

রূপজান চিঠিগুলোর মাঝ থেকে একটি ভাঁজকরা কাগজ বের করে খুলে ধরল সামনে। বলল, 'এই দেখ আমার ছেলেদের টিপসহি। চেয়ে পাঠাইছিনু সেবারে দরখাস্তের সঙ্গে। এইটি হল আমার বড়ো ছেলের টিপসহি; সে বিয়া থাওয়া করেছে আমারই খালাতো বোনের মেয়েকে। আল্লা তাদের ভালোয় ভালোয় রাখুন। বউটার ছেলেপিলে হবার সময় হল। বড়ো ভাবনাতে পড়ে গেছি আমি।'

বললাম, 'ভাবনা করছ কেন? বউয়ের মা-মাসি পাঁচ জন আছে আরো, তুমি ছাড়াও।'

'সে কথা হচ্ছে না। কথা হল কি আমার সেই পুষ্যিপুত্তুরটা, যেটা মারা গেল, যার জন্য আমি জেল খাটছি; এই সামনের আষাঢ়ে ঠিক বারো বছর শেষ হবে। বারো বছর বাদে সে আমার ছেলের ঘরে জন্ম লিবে। তখন একটা কিছু বিপদ ঘটাবার চেষ্টা করবে সে।'

'কেন ?'

'ওমা, করবে না ? বিপদ ঘটাবে না ? বল কি তুমি ! হঠাৎ ভেদবমি করে মারা গেল, তার আত্মাটা তো আর শাস্তি পেল না ? সেই জ্বালার শোধ তুলতে সে চাইবে না ?'

'তা তুমি কাছে থেকে কী করতে পারতে ?'

'কি না করতে পারতাম, সবই ঠেকাতে পারতাম। হাজির বেটি আমি। মন্ত্র জানি সব রকমেরই। যত খারাপ দুশমনই আসুক মন্ত্রের জোরে তাকে নাকাল করতে পারি।'

'এতই যদি পারো, তবে যে দুশমনটা তোমাকে জেল খাটাচ্ছে তাকে নাকাল করছ না কেন ?'

'সে কী করে হবে ? আমার পূর্বজন্মের শাস্তি তো পেতে হবে আমায় ? সে-কথা তো আগেই বলেছি। তার পর এই দেখ আমার মেজো ছেলের টিপসহি ! এটার জন্যই আমার সকলের চেয়ে বেশি ভাবনা। আছে এখন কলকাতার জেলে। জমি নিয়ে মারপিট হয়; সেই মামলাতে এও জেলে যায়। বড়ো ছেলেটা খালাস পেয়েছে। সে খুব ভালো, বুদ্ধি বিবেচনা রাখে। এই আমার মেজো ছেলেটাই বড়ো গোঁয়ার। পড়াশুনা করে নাই মোটে; স্কুলে যাবে না, বাড়িতে পণ্ডিত রেখে দিলাম। পণ্ডিত একদিন পড়া নিতে নিতে গালি দিল। ছেলেটা অমনি রুখে উঠে বলল, "শালার পণ্ডিত, আমার টাকা নিয়ে আমাকেই বকছো তুমি, এত বড়ো তোমার সাহস"— বলে পায়ের জুতো ছুঁড়ে দিল মেরে পণ্ডিতকে।'

রূপজানের মুখখানা হাসিখুশিতে চকচক করে উঠল। যেন ঘটনাটা এইমাত্র ঘটল চোখের সামনে। রূপজান বললে, 'আমি যখন জেলে আসি তখন নয় বছরের ছিল সে। কাল রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে হিসাব করলাম এখন উনিশ বছরের হয়েছে। আর এই টিপটা, এটা হচ্ছে আমার ছোটো ছেলের। এইটা তার বাপের।'

বিকেল :

আমায় টেনে নিয়ে রাধা বসল নিমতলায়, চুল বেঁধে দেবে। বড়ো গরম; বারে বারে জল ঢালি কলতলায় গিয়ে, তবুও তাত যায় না মাথার, হাতের,

পায়ের। রাধা হাতের তেলোয় খানিকটা তেলে-জলে মিশিয়ে নিয়ে এল। চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে মাথাটা ছেড়ে দিলাম তার হাতে। রাধা চুলের ফাঁকে ফাঁকে তেলজলটুকু ঘষে দিতে দিতে বললে, 'সরলাটা কী বজ্জাত।'

বললাম, 'কী আবার করল সরলা আজ?'

রাধা বললে, 'আমিই বলেছিলুম কথাটা জামিরনকে; অনেক "ফুলপড়া" "তেলপড়া" জানে। ঐ "পড়া" দিয়ে অনেক কয়েদিকে খালাস পাইয়ে দিয়েছে জামিরন। এই তো মফজান হাজতি ছিল এখানে, খুনের কেস, কেউ বলে নি যে ও খালাস পাবে। সবাই বলেছিল মফজানের বিশ বছরের জেল হবে। জামিরন কিন্তু বরাবরই বলত "দেখি কেমন ও খালাস না যায়।" কোর্টে যখন মফজান যেত জামিরন তাকে লুকিয়ে "তেলপড়া" দিয়ে দিত। তা আমি তাই জামিরনকে বললাম "দিয়ে দাও" বাপু তোমার সেই "তেলপড়া" সরলাকে একটু। যায় যাক্ খালাস পেয়ে আপদটা। যা নিটির পিটির করে, কলতলায় যায় থালাবাটি মাজে, মাজা আর শেষ হয় না; দাঁত খোঁটে তো দাঁতই খুঁটছে কলতলা আগলে, আর-একটা লোক যে দাঁড়িয়ে আছে সে খেয়াল নেইকো মোটে; পা ধোয় তো পায়ে জলই ঢালছে বাটি করে করে। কলতলা আর ছাড়ে না। কল যে একা তুই আগলে নিয়ে থাকবি তবে এতগুলো লোক করে কী? এ আপদ বিশ বছরের জন্য এখানে ঢুকলে সব কটাকেই পাগল করে দেবে। তা জামিরন আমার কথা শুনে একটু তুলো তেলে ভিজিয়ে "তেলপড়া" দিয়ে দিল ওকে কোর্টে যাবার সময়ে। বললে "লুকিয়ে নিয়ে যা, খালাস পেলি তো পেলি; আর না পেলি তো আসবার সময়ে পথে ফেলে দিয়ে আসবি। মেট্রন-মা, জমাদারনি-মা-রা কেউ না যেন দেখতে পায়"। ওর সে-কথা খেয়াল নেইকো, হাতের মুঠোয় করে তুলোটুকু আবার ফিরিয়ে নিয়ে এল বিকেল বেলা। মেট্রন-মা "ঝাড়া" নিতে গিয়ে বের করে ফেলল। সরলা বলে দিল জামিরনের নাম। মেট্রন-মা তো সরলাকে বকলই, জামিরনকেও কত গালাগালি দিল। আচ্ছা, তুই ভুলে গিয়েছিলি ফেলে দিতে, সে নাহয় মানলুম; কিন্তু জামিরনের নামটা বলতে গেলি কেন? যা হোক্ অন্য কিছু একটা বলে দিলেই তো হত। বেচারি জামিরনের এখন খোঁটার ঘর রইল চিরটা কালের জন্য এই জেলখানায়।'

'সরলার বিচারে কী হল আজ?'

'কী জানি, সবে তো সাতজনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, এখনো কত-জনের সাক্ষী নেওয়া বাকি আছে। কয়দিনই এখন ওকে যেতে হবে কোর্টে।'

হঠাৎ রাধা গুবগুব করে হেসে উঠল। বলল, 'আর-একটা কী কীর্তি করেছে আজ সরলা জানো? এখানে যে একটা সাবান পেয়েছে কাপড় কাচতে, সেখানা সে গামছায় করে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল; ভেবেছিল আজই খালাস পেয়ে যাবে। কী করে যে লুকিয়ে নিল সাবানটা। কয়েদিরা বাইরে গেলে যেতে আসতে কী করে 'ঝাড়া' নেয় জমাদারনি-মা-রা তা তো দেখেছ? মেট্রন-মা তাদেরও আজ কত গালাগালি দিল। বলল, "এই রকম করেই বুঝি তোমরা "ঝাড়া" নাও?" আর কি বিশ্বাস করবে মেট্রন-মা কাউকে?'

নিমগাছে এসে বসল দুটি বুলবুলি। সন্ধে হয়-হয় প্রায়। আকাশে শাদা চাঁদ আধখানার বেশি ভরাট হয়ে গেছে। পূর্ণিমা এল বলে শিগগিরই।

বারান্দায় 'ফাইলে' বসে আছে কয়েদিরা জোড়া জোড়া; লাইন বেঁধে। মেট্রন গেছেন আপিসে কী এক কাজে। আজ ঘরে ঢুকতে দেরিই হচ্ছে। এই ফাঁকে মিছিরন জুড়ে দিয়েছে এক খেলা। বসে বসেই পর পর একে অন্যের কোমর দু-হাতে জড়িয়ে বারান্দার এক মাথা থেকে আর-এক মাথা ঘষড়ে ঘষড়ে ছুটছে আর সুর করে বলছে—

বাক্ কুম্‌কুম্ কইতরের লাউ
—একটা কইতর দিয়া যাও
পিছে আছে কানা কইতর
—ধরতে পারো লিয়া যাও;
বাক্ কুম্‌কুম্, বাক্ কুম্‌কুম্—

ছুটতে ছুটতে যার হাত আগের জনের কোমর থেকে ছুটে যাবে সেই 'মরা' হয়ে পিছনে পড়ে থাকবে। দেখতে দেখতে সকলকে পিছনে রেখে মিছিরন একাই হাসতে হাসতে বারান্দায় ঘুরতে লাগল। তার সঙ্গে পারবে কে ছুটে? খেলাধুলোয়, দুষ্টুমিতে মিছিরনই সব-কিছুর পাণ্ডা। গাল খায় কত, তবু থামে না কিছুতে। বলে, 'থাকমু কী লইয়া তবে জেলখানায় বিশ বিশটা বছর?'

রাত্রি :

সরলা দু-হাঁটু মুড়ে নির্বিকার চিত্তে বসে আছে। রাধা চাপাগলায় তাকে বোঝাচ্ছে, 'তুই কেন বলতে গেলি জামিরনের নাম রে? তোর কি এটুকু বুদ্ধি হল না যে এটা জেলখানা?'

সেই হতে অনেকেই এই নিয়ে বকছে তাকে। একটা মানুষ কতজনের মুখনাড়া সইতে পারে? এবার সরলা মুখ খুলল, 'হঃ হঃ, বুঝছি গো বুঝছি। জেলখানায় আইসাই তো তোমাগো সকলের চোক ফুটছে। নাইলে আমার মতন ঐ হাবা-গোবা আছিলা সবাই। আমারও ফুটবো চোক আর কিছুদিন গেলেই।'

রাধা বললে, 'তা না হয় তোর চোখ ফোটে নি, বলে দিয়েছিস জামিরনের নাম। কিন্তু সাবানটা তুই নিয়ে গেলি বাইরে কোন্ আক্কেলে বল দেখি। সেই তো আবার ফিরিয়ে আনলি শেষে? চোরনি নাম কিনলি তবে ছাড়লি?'

সরলা আর পারে না। বললে, 'কউক, কউক, সবাই আমারে চোরনি কউক, বজ্জাত কউক, যা মন লয় কউক; যত পারে কউক, মুখের সুখ কইর‍্যা লউক। কইর‍্যাই যখন ফেলছি কাজ তখন আর কইয়্যা কী লাভ। মুখ বুইজ্যা থাকুম; যার যা মন লয় কইয়্যা লউক এইবারে, পাইছে যখন আমারে।'

বিছানায় ঢুকতে যাব, ভাবী ডাকলেন, 'এ রানীদি, শুনি যাও একবার এদিকে।' ভাবী মশারির ভিতর শুয়েছিলেন; কাছে গিয়ে মশারি তুলে বললাম, 'কি ভাবী?' নিঝুম রাত। মাঝে মাঝে সিপাইদের দু-একটা হাঁক-ডাক। দূরে আজও কোথায় খোল-করতাল বাজছে ঝম-ঝম। ভাবী সেদিকে কান পেতে আঙুলে ইশারা করলেন, 'জানো, ঠিক আমাদের পশ্চিমের মতো লাগছে আজ। রেতে যখন শুতে যাই ঠিক এই রকম বাজনা শুনতে পাই চারি দিক থেইকে।'

অ স্ত রা

ভোর বেলা। কলে জল আসে নি এখনো। কয়েদিরা লেগে গেছে ঝাঁটপাট দিতে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে কলতলায় ছাই দিয়ে দাঁত মেজে জলের আশায়। ভাবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন নিমডাল দিয়ে দাঁতন করতে করতে বাগানের সরু রাস্তা ধরে। খোঁপায় ঝুলছে সদ্য ফোটা গোলাপ একটি একগোছা পাতা-সমেত। সুরাতন সাজিয়ে দিয়ে গেছে একটু আগে। সতু ছুটছে পিছু পিছু ভাবীর আঁচলের খুঁট ধরে। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে পারে না সমান তালে চলতে, থেমে থেমে টেনে নিশ্বাস নেয়, আর কুটকুট করে দৌড়য়। ভাবীর বড়ো মজা, ফিরে ফিরে দেখেন আর খিকখিক হাসেন।

কাঁঠাল গাছের গায়ে একটা কোটরে দুটো শালিক ঢুকছে আর বের হচ্ছে। বাসা বেঁধেছে বোধ হয়। মুখ বাড়িয়ে ভালো করে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। একটা শালিক আমার মুখে, মাথায় কয়েকবার পাখার ঝাপটা মেরে আমায় হকচকিয়ে দিয়ে কোটরের মুখ দখল করল। চলে এলাম সে জায়গা ছেড়ে।

রাস্তার দু পাশের বেলফুল গাছ ছেয়ে গেছে কচি কচি সবুজ পাতায়। ডগায় ডগায় সবজে কুঁড়ি। দু-একটি শাদা রঙ ধরেছে, ফুটবে আজ-কালের মধ্যেই। গাছগুলি শাদা বেলফুলে ছেয়ে যাবে এবারে, ভাবতে মনটা খুশি হয়ে উঠল।

ভাবী কাছে এসে আঁচলের গেড়ো খুলে দুটি বেলফুল হাতে দিয়ে বললেন, 'উইঠ্যাছ? কখন হতে তুলে রেখেছি কেউ না উঠতে, এই নাও।'

এবারের প্রথম বেলফুল।

ঘরে ঢুকলাম। ভাকুরি এসে বললে, 'বিটি, তোমায় ডাকছে।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কে?'

সে বললে, 'ঐ যে গো, নাম্বাটা।'

এবারে বুঝলাম, এলা।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় চা রুটি নিয়ে বসে আছে সবাই। আমিও এসে বসলাম এলার পাশে।

সতু অতি ব্যস্তভাবে ছোট্ট একটি টিনের বাটি এগিয়ে দিল। মুহূর্ত আর তর সয় না তার। তাড়াতাড়ি তাতে চিনি, রুটি, হালুয়া, তুলে দিতে সে দৌড়ে গেল ঘরে। যমুনা চরকা কাটছিল খাটের উপরে বসে। সতু গিয়ে দাঁড়াল সেখানে বাটি হাতে। ভাবটা, অনুমতি পেলে এবারে সে খাওয়া শুরু করতে পারে। যমুনার শাসনের বড়ো বাধ্য সতু।

টিনের মগে গরম চা, ঠাণ্ডা না করে খাবার উপায় নেই, ঠোঁটে তাত লাগে। ভাবীর ধৈর্য থাকে না ততক্ষণ অবধি। উঠে রান্নাঘর থেকে একটা বাটি এনে তাতে অল্প অল্প চা ঢেলে খেয়ে নিলেন চটপট। তার পর সামনের থালা থেকে একটি রুটি-টোস্ট নিয়ে সবে তাতে এক কামড় বসিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ভাবীর 'ভাইজি' এসে উপস্থিত ধোপাকে নিয়ে। ভাইজিকে দেখে ভাবীর রুটি-ভর্তি মুখখানা কেমন করুণ হয়ে উঠল। কাতর দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। কারণ আজই সকালে এই ভাইজি ভাবীকে খোঁটা দিয়েছে, বলেছে, 'এ বহিনজি, নিমডাল দিয়ে দাঁতন করছ কেনে? তোমাদের বুরুশ দেয় না?'

ভাবী বললেন, 'দেয়।'

ভাইজি বললে, 'তবে তাই দিয়েই দাঁত মাজো না কেন? এদিকে তো পাউরুটি খেতে পারো খুব।'

ভাবী বললে, 'পাউরুটিতে কি দোষ আছে ভাইজি?'

ভাইজি বললে, 'দোষ আবার নাই? জানো, পাউরুটিতে তাড়ি আছে, ডিম আছে।'

এ-কথার পর আজই আবার এই অবস্থায় হাতে হাতে ধরা পড়ে যাওয়াতে ভাবী কি করবেন ঠিক করতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

মনে হল, ভাইজি যেন একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে এগিয়ে গেল।

দেখে ভাবীও উপেক্ষার ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকালেন।

মাছির বড়ো উপদ্রব। ডাক্তার হুকুম দিয়েছেন, কয়েদিদের বসিয়ে দেওয়া হোক কোনায় কোনায় মাছি মারতে, অন্য খাটুনি বাদ দিয়ে। মাছি-মারা বেত হাতে নিয়ে লেগে গেছে তাই অনেকেই। চটাস্ চটাস্ এখানে ওখানে, বারান্দায়, নম্বরে মাছি মেরে বেড়াচ্ছে আর কাঠিতে বিঁধিয়ে তা কাঁঠাল-পাতার ঠোঙায় তুলে রাখছে। সরলাও বসেছে বারান্দার একপাশে একখানা বেত হাতে নিয়ে। মেট্রনকে আসতে দেখলেই সরলা ডাইনে বাঁয়ে জোর

শব্দ করে বেতটা আছড়ায় মেঝেতে, যেন কত মাছিই মারছে সে। আর মেট্রন পিছন ঘুরলেই দু-পা মেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকে, আর টুকটাক টিপ্পনী কাটে।

চিনু বললে, 'অত কথা কি, মাছি মারতে দিয়েছে মাছি মারো বসে।'

সরলা বললে, 'হঃ, মাছি মারুম না আরো কিছু। এরা হইল গিয়া "কৃষ্ণের জীব", এদের কি মারতে আছে?'

জামিরন বলল, 'রাখ্, রাখ্, অত দয়া বাইরে গিয়া দেখাইস।'

'তা তো দেখাইমুই বাইরে গেলে। তবে এইখানেও যতদিন থাকুম, দেখাইতে ছাড়ুম ক্যান? মাইনুষের ভিতরেও যেই আত্মাটা, এই মাছির এই পিঁপড়ার ভিতরেও তো সেই আত্মাটাই।'

সাবিত্রীদি চুড়ো বেঁধে দিচ্ছিলেন সতুর চুলে। বললেন, 'সরলা, তুমি একটা মানুষকেই খুন করে আসতে পারলে, আর সামান্য মাছি মারতে তোমার এত দরদ?'

ভাবী চরকার মালদড়ি পাকাতে পাকাতে বললেন, 'এ সরলী, তুমি মানুষ মেইরে দশ বছরের জেল পাইছো; আর মাছি মেইরে মাফি পাবা সাহেবের কাছে। মারো, মারো, শিগ্গির কইরে মাছি মারো।'

সরলার দশ বছরের জেল হয়েছে। এখানকার সকলেই ভেবেছিল ও খালাস পাবে। 'বিছবছরি'রা বহুকালের অভিজ্ঞতায় কেসের নমুনা দেখেই বলে দিতে পারে ফলাফল অনেকটা সুনিশ্চিতভাবে। তারাই সকলে আশ্বাস দিত বারে বারে সরলাকে। বলত, 'ভাবিস কেনে তুই। দেখি তোর হাতের আঙুল, কি রঙের টিপসহি নিয়েছে আজ। এই তো বেগুনি রঙ; মফজানেরও এই রঙ ছিল হাতে। ঠিক ঠিক তুই খালাস পাবি এই বলে রাখলাম।' রূপজান বলত, 'কত দেখলাম; বেগুনি রঙটা ভালো; এই রঙের টিপসহি নিলে বিপদ নাই। কালো রঙটাই খারাপ। আমাদের আঙুলে দিয়েছিল কালো রঙ।'

শেষ বিচারের দিন সরলার কাঁথা চাদর যা-কিছু সম্বল ছিল সব তার সঙ্গে দিয়েই তাকে কোর্টে পাঠানো হল। যেন খালাস পেলে সোজা চলে যেতে পারে, কাঁথা চাদর পিছু না টানে।

বিকেল পর্যন্ত সে যখন এল না ফিরে সকলেই স্থির জানল সরলা মুক্তি পেয়ে গেছে। শুধু রাধা থেকে থেকে আঁতকে উঠত, দরজায় লাগানো ছোট্ট

ঘণ্টিটা বেজে উঠলেই। বলত, 'ঐ এল বুঝি আপদটা ফিরে।' দরজা খোলা হলে কে ঢুকল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়ত— 'না, আসে নি যা হোক'।

সেই সরলা শেষে ফিরেই এল জেলখানায়, সন্ধের একটু আগে, দশ বছরের কারাদণ্ড ভোগ ঘাড়ে নিয়ে।

জেনানা ফাটকে ঢুকে সে কী কান্না তার! সেই বুক-ফাটা অসহায় আর্তনাদ সকলকেই কেমন একই বেদনায় আচ্ছন্ন করে দিল। কয়েদিরা একে একে এসে দাঁড়াল তাকে ঘিরে, আমরাও কাছাকাছি ঘুরতে লাগলাম ধীরে ধীরে পা ফেলে। বেশ ছিলাম, হঠাৎ যেন একটা বিপদ ঘটে গেল আমাদের মাঝে।

সরলা গুদাম-ঘরের সিঁড়ির উপর পা ঝুলিয়ে বসে কাঁদছে আর কাতরভাবে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কারো মুখে কথা নেই। কে সান্ত্বনা দেবে তাকে। সবারই হয়তো মনে পড়ছিল নিজ নিজ শাস্তিভোগের প্রথম দিনের কথা। সেদিন এমনি করেই হয়তো কত আকুলি-ব্যাকুলি, বুকভাঙা কান্নায় ভরে তুলেছিল জেলের প্রাঙ্গণটুকু, চোখে দেখেছিল ঘোর অন্ধকার চার দিক ঘিরে।

এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল স্বরাতন, আঁচলে চোখ মুছে এগিয়ে এল। সরলার হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে গেল কলতলায়। বলল, 'সারাটা দিন গেল, যা হবার তো হইয়াই গেছে, এইবারে মুখে হাতে জল দে একটু।'

মেট্রন সরলার থালাভরা ভাত 'নম্বরে' পাঠিয়ে দিলেন সৈয়দাকে দিয়ে। বললেন, 'খাইতে কি আর পারবো ও আইজ? তবু নিয়া রাখ, সুস্থির হইয়া সন্ধ্যার পর খাইবোখন যে দুইটা পারে মুখে তুলতে।'

নম্বরে তালাবন্ধ হবার পর গেলাম সরলার কাছে। আহা বেচারি, এত আশা করে আজ গিয়েছিল কোর্টে, আর ফিরে এল কী অবস্থায়। দশ বছর— দুটি মাত্র কথা; কিন্তু কী বজ্রপাতের মতো পড়ে এসে মাথায়, তা সে-ই জানে, যার পড়েছে।

সরলা সবে বসেছে ভাতের থালা সামনে নিয়ে। আমায় বললে, 'একটা লঙ্কা দিবেন, কাঁচা লঙ্কা?' খাটের নীচে তরকারির ডালা থেকে লঙ্কা এনে দিলাম। নিঃশব্দে সরলা লঙ্কা ঘষে ঘষে তরকারি দিয়ে পরিপাটি করে ভাত মেখে আস্তে আস্তে এক থালা ভাত চেঁচেপুঁছে খেল। খেয়ে মটরডালের বাটিতে লম্বা চুমুক দিল; এক বাটি জল ঢকঢক করে গলায় ঢালল। পরে

আয়াসের সঙ্গে তিন-চারটা জোর ঢেঁকুর তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কী, রইলাম এখন কত কালের মতো আপনাগো কাছে, আপনারাই আমারে দেখবেন শুনবেন।'

সিঁড়ির পাশে মেট্রন কদমমণিকে দুই হাতে ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'থলির মশাগুলি সব যে আইন্যা ফেইলা দিলি, অখন আমি আপিসে জমা দিমু কী? এতবার কইর‍্যা কই কানে যায় না কথা— না? যত সব অলক্ষী আইস্যা জুটছে এইখানে।'

কদমমণি টাল খেতে খেতে সামলে নিল।

ঘরের চার কোনায় চারটে কেরোসিনের টিন, টিনের ভিতরে ঘন নীল রঙের চারটে থলি। দিনের বেলায় মশারা থলির অন্ধকারে গিয়ে দলে দলে লুকোয়; পাহারাওলিরা খানিক বাদে বাদেই থলির মুখ বন্ধ করে তা এনে ফেলে রাখে রোদ্দুরে। রোদের তাপে মশাগুলো মরে যায় তাদের অক্ষত দেহ জেল-কর্তৃপক্ষকে উপহার দিয়ে। সেই মরা মশা ও কাঁঠালপাতার ঠোঙার মাছি, সব গুনতি হয় আপিসে, খাতায় সংখ্যা ওঠে, উপরওয়ালাদের কাছে রিপোর্ট যায় আর জেল-কর্তৃপক্ষ বাহবা নেয় কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে।

তাই এই মরা মশা-মাছির এতটুকু অপব্যয় হলে আর রক্ষা নেই কারো।

সিঁড়ির উপরে দিদিমার কোলে বসে মুণ্ডাদের ছেলেটা পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে দেখছে চার দিক। ঘাড় অনেকটা সোজা হয়ে গেছে তেলের মালিশ পেয়ে।

ভাবী বললেন, 'বেঁইচে গেল ছেলেটা জেলখানায় এসে। এটার পক্ষে সরকার ভালোই হইল।' মায়া বলল, 'ভালো আর কি, শেয়াল-কুকুরের বংশ বাড়ল।'

শান্তি বললে, 'এর মরে যাওয়াই উচিত ছিল।'

সেখান থেকে বেরিয়ে বসলাম এসে লেবুগাছতলায়। চার দিক কেমন যেন নানা অসংবদ্ধ কাজে, অসংলগ্ন স্বরে ঝংকারিত হতে থাকে সারাক্ষণ। এ-সব থেকে দু-দণ্ড মনকে সরিয়ে রাখব তার উপায় নেই। হাঁফ ধরে মাঝে মাঝে। বেশ এ জায়গাটি, এই লেবুগাছের স্যাঁতসেতে গোড়াটি। এখানে আসি, বসে থাকি, ভালো লাগে। এ এক অভ্যেস। ভাবী ঠাট্টা করেন, একবেলা এখানে না এলে বলেন, 'যাও যাও, শীঘ্র করি যাও; তোমার লেবুতলা কাঁদছে যে, আমাকে দিয়া খবর পেঠাই দিল।'

মেঘলা করে আছে আজ সকাল হতেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ধীরে ধীরে। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে গুড়িগুড়ি নিমফুলগুলি। এরই মধ্যে কখন নিমগাছটি পাতায় ফুলে ভরে গিয়েছে। নিমফুলের সৌরভে মেতে উঠেছে মৌমাছির দল। অজস্র ছোটো ছোটো মৌমাছি অশান্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে ঠিক আমার মাথার উপরে। নিমের ডাল ছড়িয়ে পড়েছে লেবুগাছের মাথায়; আর লেবুগাছের তলায় বসে আছি আমি। কী স্নিগ্ধ আশ্রয়টুকু দিল তারা আমায়, লেবুতে নিমেতে মিলে।

গালি পাড়তে পাড়তে ছুটে এসে রূপজান দাঁড়াল সামনে। কোমরে আঁচল জড়ানো, বাঁ-হাতে লাল রঙের মোটা ওষুধের বোতল, ডান-হাতে ওষুধ খাওয়ার ছোট্ট কাচের গ্লাস। মুখ কান রাগে লাল। জোড়া লেগে গেছে কপালের উপরের মোটা দুই ভুরু। ঢাকা পড়েছে তার নীচে ছোটো ছোটো চোখ দুটি। গলার রগ ফুলে ফুলে উঠছে জোর কথার চাপে। এ হেন রূপজানকে সামনে দেখে হঠাৎ ভড়কে গেলাম। রূপজান হাতের বোতল গ্লাস ধুপধাপ মাটিতে ফেলে কোমরে হাত দিয়ে খাটুনি-ঘরের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে উঠল— 'কী, এত বড়ো সাহস? আমাকে বলে কিনা 'চুক্‌লি'! আমি নিজের কানে শুনহু ইওবাখে আসবার সময়। 'চুক্‌লি' তো তোরা! লাগানি-ভাঙানি করিস সারাক্ষণ মেট্রন-মার কাছে। আমি কি জানি না কিছু? সব জানি, সব বুঝি। পাঁঠার বাচ্চা সব, পিছনে কথা কয়; একটু 'হুঁ' করলেই পিছুবাখে হটে যায়। আমি হনু বাঘের বাচ্চা; যা বলি সামনাসামনি বলি। রাখ্‌ ঢাক্ নাই।'

যাকে উদ্দেশ করে বলা সেই নেছামনও কম যায় না কথায়। রূপজানের সঙ্গে সেও উঠল সমান তালে দুলে।

আজ কয়দিন থেকেই চলেছে এদের মন-কষাকষি। উঠতে বসতে এ ওকে খোঁচা দেয়, কথার বাণ ছুঁড়ে মারে।

এর প্রথম সূচনা হয় চার দিন আগে। নেছার মেয়ে খতেজার জ্বর ১০৪ ডিগ্রি। তিন দিন চলল সমানে, জ্বর আর নামে না। রূপজান সেবাযত্ন করে, নিয়মিত 'ইনফেলিষ মেগ্‌ছার' খাওয়ায়, দিনে দু-বার তিনবার 'থারপিন' দিয়ে জ্বর তুলে বাইরে এনে পরিষ্কার আলোতে দেখে। 'মিটিন' সে, এই-সব কাজের ভার তো তার উপরেই।

খতেজা ওষুধ খেতে নারাজ। রূপজান তার নাক টিপে ধরে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। সেদিন বুঝি খতেজা মুখ খুলবে না কিছুতেই, রূপজান বিরক্ত হয়ে আঙুল দিয়ে তার ঠোঁটে মেরেছিল মৃদু এক ঘা। আর যাবে কোথায়। মা নেছামন রুখে এল, রূপজানও নেচে উঠল ; সঙ্গে সঙ্গে ঘরভরা সকলে দু-ভাগ হয়ে গেল। এক দল রূপজানকে 'বাক-আপ' করে আর-এক দল নেছামনের হয়ে লড়ে। দুপুর বেলা, মেট্রন গেছেন সরে ; একা জমাদারনি, এ ব্যাপার সামলায় সাধ্য কি! হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল নম্বর জুড়ে।

এদিকে যাকে নিয়ে এই প্রলয়, সেই খতেজার বড়ো কৌতুক ; মা-মটিনের ঝগড়া দেখছে আর মুখে হাত চাপা দিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আজও রূপজানের ভঙ্গি দেখে তাই ঘাবড়ে গেলাম। এ যে বাড়তে বাড়তে শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে— ভাবতে আতঙ্ক হল। তাড়াতাড়ি তাকে টেনে এনে কাছে বসালাম ; হাতে ধরে একথা সেকথা পাড়লাম, তার নানা কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম। রূপজানের এই একটা দুর্বলতা সবার কাছে ধরা পড়ে আছে। রূপজানের কাজের প্রশংসা করলে তখুনি তার রাগ শোক, সব গলে ধুয়ে যায়। রূপজান মুহূর্তে নরম হয়ে একমুখ হেসে বললে, 'কী বলছ, কী গতর ছিল আমার! একা গোটা সংসারের কাজ করে সোয়ামি পুত্তুরকে রান্না করে খাইয়ে রাতারাতি তিন টিন ধানের চিঁড়া কুটেছি এই এক জোড়া হাতেই। একবার কী হল— আমার কোলে তখন মেজো ছেলেটা, ঘরে আর অন্য মেয়েছেলে কেউ নাই যে এক গেলাস জল ঢেলে দেয় পিপাসার সময়। 'রোজা' এসে গেল, চিঁড়া মুড়ি খই ভেজে কুটে রাখতে হবে ঘরে ; ভেবে-চিন্তে মাকে আনানু কাছে। মা দুপুরবেলা এসে পৌঁছলেন, স্নান করলেন। মাছের ঝাল, তরকারি, দুইটা মুরগি— সবে ডিম দেওয়া শেষ করেছে সেবারকার মতো, তাদের জবাই করে রেন্ধে রেখেছিনু, তাই দিয়ে মাকে খেতে দিনু। মা ভাত খেলেন। বারান্দায় পানের ডিবা নিয়ে মাকে পান সেজে দিনু, নিজেও খানু। পান খেতে খেতে মা পাড়াপড়শির খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, এক এক করে তাদের কথা বলনু। নানান সুখ-দুঃখের কথাও হল। বিকালটা গেল এই করে। সন্ধে হয়ে এল ; আমি উঠে ঘরের কাজকর্মে হাত দিনু। মা আমার কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে লাগলেন। এমন সময় বস্তিতে একটা বিষম হৈ-চৈ, কান্নাকাটি,

চেঁচামেচি। আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিনু। খোকার বাপ বাড়ি ছিল না, পাশের গাঁয়ে গিয়েছিল জমি দেখতে; চাষের জমি কিনবে আরো। আমার ছোটো ভাই এসেছিল মার সঙ্গে, সে গিয়েছিল বস্তিতে বেড়াতে; ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে বললে, "বস্তির অমুক বাড়িতে ডাকাত পড়েছে, অমুক লোক খুন হয়েছে।" সেই লোকটার ছিল একটা সোমত্ত মেয়ে। আহা! মেয়েটার কি কান্না। তার কান্নায় তিন দিন পর্যন্ত বস্তির লোকেরা মুখে ভাত তুলতে পারে নাই। তা মা আমার বস্তিতে ডাকাত পড়ার খবর পেয়ে পরদিন ভোরেই চলে গেল তার বাড়িতে।'

বললাম, ও রূপজান, তোমাকে দেখেও কেমন যেন 'ডাকাত গিন্নি' বলে মনে হয় আমার। তাই হলেই বুঝি মানায় ভালো তোমায়। যে রকম কোমরে কাপড জড়িয়ে হুমকি দিয়ে ওঠো একটুতেই, দেখে আমারই ভয়ে বুক কাঁপে।'

রূপজান মুচকে হেসে মাথা নোয়ালে।

মেট্রন এলেন আপিস থেকে খবর নিয়ে— বানু, বানুর মা আজই চালান যাবে বহরমপুরে। শুনে এলা তাড়াতাড়ি ঢুকল রান্নাঘরে, বানু ওর রান্না মাছের ঝাল খেতে চেয়েছিল একদিন।

রূপজানও উঠল; বানু যাবার আগে তার কাছ থেকে কয়েকটা মন্ত্র শিখে নিতে। বানু নাকি ভালো ভালো মন্ত্র জানে অনেক। একটা মন্ত্র আছে —তা পড়ে জলে তিনবার ফুঁ দিয়ে সেই জল চোখে দিলে চোখ ওঠা ভালো হয়ে যায়। আর একটা আছে তা পড়ে কোমরের আঁচলে গেড়ো দিয়ে রাখলে দুশমনের গলায় ফাঁস পড়ে। আরো একটা মন্ত্র আছে, সেটাতে একটা বিশেষ গাছের শিকড় চাই, এখানে তা পাওয়া যাবে না, নয়তো সেই মন্ত্রপূত শিকড় যদি চুলে বেঁধে রাখা যায় তবে সাধ্য কি দেবতা-দানবের যে একচুল অনিষ্ট করে তার। এতদিন রূপজান নানা চেষ্টা করেও পারে নি শিখতে মন্ত্র কয়টি প্রতিদ্বন্দ্বী বানুর কাছ থেকে। আজ যাবার মুখে বানুর মন নরম হয়ে এসেছে; এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কি রূপজানের মন্ত্র শেখা সম্ভব হবে কখনো?

আকাশের মেঘটুকু কেটে গিয়ে রোদ উঠল। আমিও উঠে পড়লাম; স্নান সেরে খেয়ে নিতে হবে এবারে।

লেবুতলায় রোদ্দুরে তাত ক্রমেই বেড়ে উঠছে। শুকনো পাতা, লাল ধুলো উড়ছে ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোথায় গিয়ে বসি আজ। রাধা কোত্থেকে এসে গম্ভীরভাবে পাতা কম্বলটা ঝাড়া দিয়ে তুলে ধমক দিয়ে বললে, 'আজ আর বসতে হবে না এখানে, চলে এসো ঘরে। আমার কোণটা নিরিবিলি পাবে, আর ঠাণ্ডাও হবে এখানকার চেয়ে। কদিন থেকেই তো দেখছি এই রোদ্দুরে বাইরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছ সারা দুপুর। দেখি, আর জবাতে আমাতে বলাবলি করি— কী ধারার মানুষ তুমি। হ্যাঁ রে জবা, তুই যেন আবার বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে আনিস নে এই কোণটুকুতে। সারাদিন চার দিকে বকবকানি শুনে আর পারি নে বাপু।'

রাধাকে একটু মেনে চলে অন্য সকলে, কেমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে তার চলায় ফেরায়, কাজে কথায়। স্নিগ্ধ ব্যবহারে মন আকৃষ্ট করে শ্রদ্ধা টেনে নেয়।

জানালার পাশে মরিয়ম সখী বানুর আসন্ন-বিচ্ছেদ শোকে কেঁদে আকুল। বানু হাতে কাঁটা, চিরুনি হাতে নিয়ে এসে বসল তার কোল ঘেঁষে। মরিয়ম পরিপাটি করে বানুর কপাল ঢেকে পাতা কেটে মাথা জোড়া খোঁপা বেঁধে দিল। পরে হাতের তেল আঁচলে মুছে একটা শাদা রুমালে ফুল তুলতে লাগল। এলার কাছ থেকে নানা রঙের সুতো চেয়ে নিয়ে মেট্রনকে লুকিয়ে কাল অনেক রাত অবধি বসে লণ্ঠনের আলোয় ফুল তুলেছে রুমালের তিন কোনায়। বাকি আছে আর এক কোনা : এটি শেষ করে যাবার সময়ে বানুর হাতে দিয়ে দেবে সে।

নম্বরের মাঝে বসে মিছিরন হাসছে 'খ্যাক্ খ্যাক্'। কলকাতার কোনো এক বুড়ি কয়েদি ফাইলের দিনে সাহেবের কাছে 'নালিশ' জানিয়েছিল হুকা-কলকির জন্য। সাহেব ছিল 'বিলাতি সাহেব'; ভাষা বোঝে না। মিছিরন ডান-হাত মুঠ করে তুলে কনুইতে দুই ঠোঁট লাগিয়ে লম্বা একটা টান মেরে বুড়ির ভঙ্গি ও ফোঁক্‌লা মুখের অনুকরণ করে বললে, 'এই এম্‌নি কইর‍্যা সাহেবরে দেখাইয়া বুড়ি কয়, "সাহেব, হুক্কা— হুক্কা চাই আমার। দেখ না, পেট ফুইল্যা উঠ্‌ছে"।'

মিছিরনের সঙ্গে অন্যরাও হেসে গড়াগড়ি মেঝেতে। অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার তার। সুবিধে পেলেই সবাই তাকে ঘিরে বসে, তার গল্প শোনে, হাসে, কাঁদে, রঙ্গ করে, মজা পায়; দু-দণ্ড বেশ কেটে যায়।

এলা এসে বললে, 'বউদি, তুমি একদিন ওর কাছে গল্প শুনো 'দেওয়ানি ফাটকে' কী কাজ করত ওরা সারাদিন। সে বড়ো মজার।'

মিছিরনের কানে গেল কথাটা। বলে উঠল, 'মজার নয় গো, সত্যি কথা। আমি সত্যি ছাড়া মিছা বলি না কখনো'; বলতে বলতে মিছিরন উঠে এল কাছে।

বললাম, 'সে তো নিশ্চয়ই। তা দেওয়ানি ফাটকে গিয়েছিলে কেন তোমরা?'

রাধা বললে, 'একবার এই জেনানা ফাটক মেরামত হবে; কোথায় সরাবে কয়েদিদের, দেওয়ানি ফাটক খালি ছিল সেখানেই আমাদের নিয়ে রাখল কয়েকদিন।'

এলা বললে, 'বলো না মিছিরন সে গল্প। কী খাটুনি দিত তোমাদের সেখানে?'

মিছিরন বললে, 'ও, সেই কথা? কী খাটুনি দিত? অল্প দিনের জন্য ছিলাম তো; তখন আছিল আমাগো ডাইল ডাঙার খাটুনি। তা দেওয়ানি ফাটকে খাটুনি-ঘর নাই, যাঁতা কুলা আইন্যা দিবো কোথায়? জেলার-বাবু কইলেন থাকুক, দুইদিন অরা ছুটি ভোগ করুক। কিন্তু মেট্রন-মার তা সইব ক্যান? বইস্যা বইস্যা খাওয়াইব নাকি আমাগো! কোথেইকা সে একছালা পোড়া কয়লা আইন্যা ছড়াইয়া দিল উঠানে। ছড়াইয়া দিয়া কয়েদিগো হুকুম দিল, "এইবারে তরা কুড়া এইগুলি সব"। তা-ই কুড়াইতে লাগলাম। একবার কইর‍্যা পোড়া কয়লা কুড়াইয়া জড়ো করি, আবার সেইগুলি ছড়াইয়া দেয়। তাতেও মেট্রন-মার মন সন্তুষ্টি হয় না। উঠানের খানিকটা জায়গায় দুব্বা ঘাস ছিল। মেট্রন-মা কয়, "তোল্ এইগুলি একটা একটা কইর‍্যা।" তুলি সকাল থেইক্যা দুপুর অবধি দুব্বাগুলি খুইট্যা খুইট্যা; বিকালে কয়, "লাগাও আবার এইগুলি যেমনটা ছিল ঠিক তেমন কইর‍্যা।" আবার গোটা বিকাল ভইর‍্যা দুব্বাগুলি লাগাই, ঠিক যেমন যেমন ছিল তেমন ভাবে। জল ঢালি তাতে টিন টিন হাওদা থেইক্যা নিয়া।'

'রোজই করতে এই কাজ?'

'রোজই; যে কয়দিন আছিলাম সেইখানে। সকালে কয় "দুব্বা তোল্," বিকালে কয় "দুব্বা লাগা"। একবার কয় "পোড়া কয়লা জড়ো কর", একবার

কয় "বিছাইয়া দে"।' বলতে বলতে যত হাসে মিছিরন, তত হাসে অন্তরা।

একদিন যা অতি দুঃখের ব্যাপার ছিল— আজ তা কৌতুকে দাঁড়িয়ে গেছে।

বানুর যাবার সময় হল। মেট্রন এসে হাঁক দিলেন। আপিস থেকে ডাক এসেছে, আর মুহূর্ত দেরি করবার হুকুম নেই। আট-নয় বছরের মায়া, এ ছেড়ে যেতে বানুর চোখ ছলছলিয়ে এল। সবাইকে সেলাম করতে করতে এগিয়ে চলল দরজার দিকে। পিছু পিছু চললাম আমরাও। জেলারের ছাদের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে মেটটি রোদে দেওয়া আচার-ভরা বৈয়ম তুলতে। এক ফাঁকে বানু আড়ে চেয়ে তাকেও সেলাম জানাল। সে বৈয়মগুলির গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে ধুলো মুছতে লাগল।

দরজার তালা খোলা হল। জমাদারনি দরজার বাইরে গেল, বানুর মা গেল, বানুও পা বাড়িয়ে চৌকাট পার হয়ে পিছন ফিরে সবাইকে একবার শেষ দেখা দেখতে যাবে— মুখের উপরে ধড়াস্ করে মেট্রন দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নেছামন বললে, 'বাইস রে, জেলখানা তো লয়, যেন যমরাজের লীলাখানা। একবার ডাক পড়ল তো আর এক মুহূর্তও তিষ্টিবার জো নাই।'

ফিরে এলাম দোরগোড়া হতে। যে-কোনো যাওয়াটাই কমবেশি ধাক্কা দিয়ে যায় পড়ে থাকে পিছনে যারা, তাদের। পায়চারি করতে লাগলাম বারান্দায়। পশ্চিম-উত্তর কোণ থেকে কালো হয়ে ধুলোর ঝড় এগিয়ে এসে মুহূর্তে ঢেকে দিল চার দিক। এলোমেলো হাওয়া বইল, আম কাঁঠাল পাকুরের ডালে এলোপাথারি ঝাপটা মেরে।

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে দু-হাতে দু-চোখ ধুলো থেকে আড়াল করে সকলে ছুটে বেড়াচ্ছে ঝড়ের মুখে কাঁচা আম কুড়িয়ে। কালবৈশাখীর আগমনে সকলের হঠাৎ খুশিতে ভরে ওঠা হাসি-উচ্ছ্বাসে হালকা হয়ে এল যেন চিন্তাভরা জমাট-বাঁধা মন।

দেখতে দেখতে ঝমাঝম বৃষ্টি নামল, নীচের ধুলোগুলি চাপা পড়ল, উপরের মেঘগুলি হু হু করে উড়ে চলল দক্ষিণ-পুব কোণ বরাবর। বৃষ্টিধারার ফাঁক দিয়ে দেখছি মেঘের ছুটোছুটি, ডালগুলির লুটোপুটি, আর হাওয়ার উদ্দাম নৃত্য দিগ্‌বিদিক ব্যাপী।

বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা সুর তুলেছে পাতায় পাতায় টপাটপ ছন্দে। আমতলা থেকে সকলে উঠে এল বারান্দায়। মা'রা আগলাতে লাগল শিশুদের বৃষ্টির ছাঁট থেকে। মেট্রন তাড়া লাগালেন ; ঝড়ের লাল ধুলো মেঝেতে জমেছে আধ ইঞ্চি পুরু হয়ে। পরিষ্কার করতে হবে সন্ধের আগে। কয়েকজনকে লাগিয়ে দিলেন ঝাঁটা হাতে তখুনি। এলা বিছানার চাদর বালিশ এনে ঝাড়তে লাগল বাইরে এক এক করে ; মায়া লেগে গেল টেবিলে টেবিলে বই-খাতাগুলির ধুলো মুছতে। যমুনা জলিলের পকেট-ভরা কাঁচা আম নিয়ে রাখল কাল টক রেঁধে খাওয়াবে তাকে। নয়তো এই আম কামড়ে খেলে ঘা হবে মুখে।

দাঁড়িয়ে আছি থামের গায়ে ঠেস দিয়ে। হঠাৎ দেখি চার দিকে আলোর সে কী ছড়াছড়ি। ঝিকমিক করছে সোনালি রোদ্দুর শাদা দেয়ালে, গাছের মাথায়, দূর আকাশে মেঘের গায়ে। কখন এক সময়ে এত আলোড়ন, এত কলরব থেমে গেল, টের পাই নি।

ভাবী এসে ধাক্কা দিলেন, বললেন, 'ভুলি গিয়াছ ? আজ তোমার "পালি" যে। চলো, খাবার জায়গা করিগা এবারে।'

থামের মাথায় পায়রাটির বাসা, তাতে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে একটি। মা তাকে ঠোঁটে করে এনে খাবার খাওয়ায়। নীচ থেকে দেখি লম্বা রোঁয়া-ওঠা লিক্‌লিকে গলার উপর বাচ্চাটার ব্যগ্র আকুল ঠোঁট মায়ের বুক অবধি উঁচু হয়ে ওঠে আর মুহুর্মুহু হাঁ করে। তিন-তিনবার ডিমশুদ্ধ পায়রাটির বাসা নষ্ট হয়ে গেছে এর আগে। এবারে সে শুরু হতেই নড়ে নি তার জায়গা ছেড়ে। এখন তবু একটু আধটু বাইরে যায়, তখুনি আবার ফিরে আসে, বাচ্চাটার ঠোঁটের ভিতর ঠোঁট গুঁজে খাবার খাওয়ায় আর বাকি সময় বুক চেপে বসে থাকে বাসার উপরে।

জাবেদার মা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিল পায়রার বাসার দিকে। সে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললে, 'আ—হায় রে ; মায়ের বুকের ধন এমনই জিনিস রে—।'

অভিজিৎ লিখেছে, 'তোমার জন্য একটা ছবি এঁকে পাঠালাম। এই রেলগাড়ি চড়ে তুমি আমার কাছে চলে এসো। এই নীল আকাশে দেখছ যে ছোটো ছোটো মানুষ, সেগুলো হচ্ছে দেবতা। তুমি তাঁদের পুজো করো, তবে

তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবে। আমার কুকুরছানা ভালো আছে। আমিও ভালো আছি। ইতি—তোমার আদরের অভিজিৎ আর তুমি আমার মানী।'

প্রতিবারের মতোই ভিড় করে এসে দাঁড়াল তসিমন, সুরাতন, নেছা, জবা, কদমমণি, মরিয়ম সবাই। বলে, 'ভাই কি লিখেছে মা পড়ে শোনাও আমাদের।' হাত থেকে তারা চিঠিটা ছবিটা কেড়ে নিল ভালো করে উলটে-পালটে দেখবার আগেই। এই ছোট্ট চিঠিটার উপর তাদের এই বিশেষ দাবি, অদেখা ছোট্ট ভাইটির প্রতি তাদের এই অকৃত্রিম প্রীতি মনকে নাড়া দেয় বারে বারে।

ঘরের ভিতর দারুণ উত্তেজনা। কাল রাত দুটোয় একটা প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় সকলের। তার পর শোনে কয়েকটা এরোপ্লেন বিকট স্বরে ভোঁ ভোঁ করে উড়ছে ঠিক যেন মাথার উপরেই। নিশ্চয়ই বোমা পড়েছে কোথাও!

এলা বললে, 'কী ঘুম বাপু তোমার! এমন শব্দ বোমা পড়ার; সেই শব্দেই তো ঘুম ভেঙে গেল আমার। আর তুমি টের পেলে না কিছু?'

বললাম, 'টের বোধ হয় পেয়েছিলাম একটু। একবার যেন কানেও কথা এল— তোরা সব এখাট-ওখাট থেকে চেঁচামেচি করছিলি 'বোমা, বোমা' 'ভূমিকম্প'।'

'হয়েইছিল তো ভূমিকম্প কাল রাতে সেই সময়ে। আমার খাট নড়ে উঠল, স্পষ্ট বুঝলাম।'

'সত্যিই? কিন্তু ছটফট করায় কী লাভ?'

'যাও, সবেতেই তোমার ইয়ে। সব 'সিরিয়াস' ব্যাপার নিয়ে তোমার হাসি। এইজন্যই তো বলতে ইচ্ছে যায় না কিছু তোমায়।'

মায়া বললে, 'একটা কিন্তু ভালো রানীদি; ধরুন, এই জেলেই যদি বোমা পড়ে কোনোদিন রাত্রিবেলা, ঘুমের মধ্যে আপনি মৃত্যু-যন্ত্রণাটা টের পাবেন না মোটেই।'

ভাবী বললেন, 'তা তো হইলো গিয়া পরের কথা। এখন কাল রেতে কোথায় কী হইলে সেই খবরটা লাও আগে।'

কিন্তু সঠিক খবর দেবে কে এখানে আমাদের? মেট্রনকে জিগগেস করি; তিনি দু-ভুরু কপালে তুলে অবাক হয়ে বলেন, 'কী জানি গো, আমি তো কিছু

শুনি-টুনি নাই। সারাদিন পরে এইখান থেইক্যা বাড়ি যাই, হাত-পাও ধুইয়্যা সন্ধ্যা আহ্নিক কইর‍্যা একটু কিছু মুখে দিয়া এই যে বিছানায় গিয়া লম্বা হইয়া পড়ি, একেবারে মরার মতো ; আর হুঁশ থাকে না কিছুতে।'

জমাদার এলে ভাবী ছুটে গিয়ে তাকে জিগগেস করলেন, 'এ ভাইজি, বলি দাও না কাল রেতে কোথায় বোমা পইড়াছে।'

ভাইজি বললে, 'বোমা, বোমা কোথায় ? কুচ্ছু না, কুচ্ছু না। তুমি স্বপন দেইখাছ বহিনজি।'

ডেপুটি জেলার বললেন, 'বোমা যদি পড়ত কাছাকাছি কোথাও, তবে আমরা কি কেউ-ই কিছু টের পেতাম না— নাকি ? বোমা পড়ল তা শুধু আপনারাই জানতে পারলেন এ কেমনতর কথা ?'

জেলার এলেন—'জেনানা ফাটকে' কী একটা কাজে। তাঁকে জিগগেস করলাম সবাই মিলে। এত নিশ্চিতভাবে সত্য ঘটনাকে উড়িয়ে দিতে বেশ ইতস্তত করেন ইনি, অনেক সময়ে স্পষ্ট বুঝতে পারা গেছে। প্রশ্নের উত্তর দিতে যেখানে বাধে, সেখানে হেসে পাশ কাটান নয়তো অন্য কথা পেড়ে প্রসঙ্গ পালটান। আমাদের প্রশ্ন শুনে জেলার বললেন, 'বোমা ? ও হ্যাঁ। তা ও কিছুই নয়, কিছুই নয়। মিথ্যেই ফেলেছে ওরা বোমা। পড়েছে একটা ফাঁকা মাঠে ; কিছু না, কিছু না। আপনারা খুব safe আছেন। ভাবনার কিছু নেই। তা আপনারা আজ কী রাঁধলেন ? ভালোই খেয়েছিলেন তো ? মাছটা টাটকা ছিল ? যা মুশকিল, বাজারে আটা তো পাওয়াই যায় না একদম। আমাদের স্টকে গম ছিল বলে এখনো চলছে কোনোমতে। আচ্ছা, আসি তা হলে আজ, নমস্কার।'

ঘরের কোনায় মুণ্ডা দিদিমা কম্বল পেতে বসে আছে সামনে দু-পা ছড়িয়ে নাতি কোলে নিয়ে। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ঘরে কেউ নেই দেখে কম্বলের এক দিকটা তুলে গাল-ভরা থুতু তাতে ফেলে চাপাচুপি দিয়ে গম্ভীরভাবে আবার তার উপরে সেই ভাবেই বসে রইল সে।

সুরাতন জানালার শিক ধরে তাকিয়েছিল বাইরে। পাতা-ঝরা ঝাপড়া পাকুর গাছের মাথা দেখিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ঐ গাছে নতুন পাতা আইলে আমার জেল খাটার বছর পুরায়। এইবারে নতুন পাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাঁচ বছর পূর্ণ হইব।'

খাটুনি-ঘর থেকে স্পষ্ট কলরব কানে আসছে। শীতে গ্রীষ্মে সমান লম্বা হাতওয়ালা একটা কুর্তা পরে থাকা মেয়েদের পক্ষে বড়ো অসুবিধার।— তার উপর জেলের খাটো কাপড়; দু-ফেরতা দিয়ে পরবার উপায় নেই। তাই সকলের পরামর্শে আই. জি.-র কাছে নালিশ করে এরা কুর্তার বদলে শেমিজ পাস করিয়ে নিয়েছে। দুটো নতুন শেমিজ নমুনা স্বরূপ তৈরি হয়ে এসেছে। শেমিজের পাতলা কাপড় পছন্দ হয়েছে সকলের; কিন্তু ছোটো হাত পছন্দ নয় কারো। সৈয়দা বলছে, 'শেমিজের গলাটা বেজায় বড়ো রে, বুক দেখা যাইব।'

সমিরন বলল, 'তা বুক দেখা যায় তাতে আর কী হইছে? ছাওয়াল পিয়ালদের মা যারা, তাদের তো এমন গলার দরকারই। কিন্তু হাতটা— চলবে নি। বগল অবধি দেখা যায়।'

জামিরন বলল, 'আরে ছিঃ। শেমিজ ফিরাইয়া দে, হাতা বড়ো কইর‍্যা আসুক। বগল দেখা গেল তো ইজ্জতই গেল।'

এলা বিড়বিড় করে উঠল পাশে— 'বাব্বা, বাব্বা, শরীরে এদের ইজ্জতের ছড়াছড়ি। সেদিন রূপজান বললে মেয়েমানুষের পায়ের বুড়ো আঙুল দেখা গেল তো ইজ্জত গেল। কাল জাবেদার মা বলল হেঁকে সবাইকে, 'আরে, মেথর আসছে, মাথায় কাপড় তুইল্যা দে ভালো কইর‍্যা। বেটা ছেইলা মাইয়ামানুষের সিঁথি দেখল তো ইজ্জতের বাকি রইল কী? এখন দেখি বাকি রইল এদের কোন্ জায়গায় ইজ্জত নেই সেই কথাটাই বুঝতে।— না, না, ঠাট্টা নয়। দেখ না, যত-সব কাণ্ড এদের। বুক দেখা যায় ক্ষতি নেই, বগল দেখা গেলেই গেল সব।'

কাট ছাঁটে এলা ওস্তাদ। তারই কাছ থেকে দরজি সেদিন পছন্দমাফিক শেমিজের কাট বুঝে নিচ্ছিল দেখেছিলাম।

রূপজান একটা কালো সুতোর দড়ি পাকিয়ে নিয়ে এল; বলল, 'তোমার হাতের একটা আঙুল বার করে দাও দেখি, 'বোতলবান্ধ' দেখিয়ে দিই। কতরকম 'বান্ধ' জানতাম আমি, সব ভুলে গেছি। জেল খাটতে খাটতে আমার জীবনটাই শেষ হয়ে গেল। এই 'বান্ধ' দিয়া তুমি বোতলের মুখ বেন্ধে ঝুলিয়ে রাখতে পারবে। আমি লাউয়ের 'টুম্বা'গুলিও এমনি করে বেন্ধে বেন্ধে চিড়া সুদ্ধ ঝুলিয়ে রাখতাম। কত 'টুম্বা' ছিল আমার ঘরে।

গাছের লাউ— নিজেরা খাব, গোরুকে খিলাব, পাড়াপড়শিকে দিব, তবুও শেষ হবে না। কত লাউ গাছেই পাকত, গাছেই শুকিয়ে থাকত। সেই শুকনা লাউ পরে ভালো করে পানি দিয়ে ধুয়ে ঘরে এনে নানান রকম জিনিস ভরে ভরে তুলে রাখব। আমার হাতের লাগানো গাছে এমনিতেই ফল ধরে খুব। তোমাদের দশমী পূজার দিন লাউবিচি লাগাই আমরা। সেই দিনের লাগানো বিচিটার গাছে খুব কম করেও এমন শ-খানেক লাউ ধরবে। দশমীর দিন প্রতিমা বাইরে আনে, বিসর্জনের বাজনা বাজে; আমরা সেই বাইজ শুনে তাড়াতাড়ি লাউবিচি মাটিতে পুঁতে হেনে দৌড়ে যাব প্রতিমা দেখতে। আমার বাবার বাড়ির গ্রামে এক বাড়িতে খুব ধুমধামে এই পূজা হয়। আর কি দেখতে পাব ইহজনমে সেই গাঁও? আর কি বাহির হব আমি জেলখানা হতে এই পরানটা সমেত দেহটা নিয়া।'

'তোমার বাপ বেঁচে আছে রূপজান?'

'সে কথা আর কেন কইছ? আমার বাপ জীবিত থাকলে কি আমার জেল হইতে পারত কখনো? বাপ থাকলে আমার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগতে পারত না। বাপ কি আমার যে সে লোক ছিল? এমন ত্রিশটা গাঁয়ের লোক তার কথা শুনলে ভয়ে কাঁপত। দুই দুইটা হাট বসাল বাপ নিজে, একটা চাউলহাটিতে; একটা রাজগঞ্জে। হাটের দিন এই হাটের লোক ঐ হাটে যেতে পারত না। বাপ হাতিয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত পথের মাঝে।

'কেন?'

'নয়তো এক হাটেই সব লোকের ভিড় হলে অন্য হাট যে জমবে না ভালো। তাই ঐ রকম করে পাহারা দিত। জানের ভয়ে লোকগুলি থরথর করে কাঁপত। হাটভরা লোক, একটা কেউ টু শব্দও করতে পারত না। বাপের আমার অবস্থাও ছিল খুব ভালো। ঘড়া ঘড়া টাকা মাটির নীচে পুঁতে রাখত; কতবার আমি ছেলেবেলায় নিজের চোখে দেখেছি। আমিও আমার বাড়িতে তিন-চার জায়গায় পিতলের ঘড়া করে মাটির নীচে টাকা পুঁতে রেখেছি। কেউ জানে না আমি ছাড়া। আল্লা যদি বাঁচিয়ে রাখে, যদি ঘর-সংসার আবার আমারে ফিরায়ে দেয় তবে এবারে সেই টাকা তুলে অন্য দেশে ঘরবাড়ি বানিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে থাকব। ঐ দুশমনদের দেশে আর না। দুশমনরাই

থাকুক ওখানে, ভোগ করুক সব। আমার তো যা করবার করেছে, কি আর বলব, আল্লা তার বিচার করবে।'

'আচ্ছা রূপজান, তোমার বাপের ঘরে যে ঘড়া ঘড়া টাকা থাকত তা চুরি ডাকাতি হত না কখনো?'

'কোন্ চোরের এত বড়ো বুকের পাটা যে, আমার বাপের ঘরে আসবে চুরি করতে? আর ডাকাত পড়বে কি, ডাকাতদের আমার বাপ বশ করে রাখত। বছরে একবার করে তাদের খাওয়াত। সে কী খাওয়া—!'

'কতজনকে?'

'তা পাঁচ-ছয় শো হবে।'

'গাঁয়ের লোকেরা জানতে পারত?'

'কেমন করে জানবে? দিনমানে তো খাওয়ানো হত না। তা ছাড়া আমার বাপের বাড়ি তিন তিনটা বেড়া দিয়ে ঘেরা। খানিক দূরে দূরেই একটা করে দু-মানুষ-উঁচু বাঁশের বেড়া। ভিতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে বাইরের থেকে জানা সহজ কথা নয়। একবারকার কথা আমার মনে আছে, শোনো বলি। তখন আমার বয়স বছর পাঁচেক। ডাকাতদের খাওয়ানো হবে, দিন ঠিক হল। ধরো, যেমন আর ছয়-সাতদিন দেরি আছে, বাপ বাড়ির সব বউ-ঝিদের পাঠিয়ে দিলেন কুটুমবাড়িতে। মেয়েমানুষের মধ্যে বাড়িতে রইল শুধু আমার মা ও আমার ছোটো ছোটো ভাই বহিন দু-চারজন। আর রইল বাড়ির সব বেটাছেলেরা।

'এখন, ডাকাতরা যেদিন খাবে, বাড়ির বেটাছেলেরা করল কি, সকাল হতে খাওয়াদাওয়ার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখল। মাস খানেক আগে হতেই আট-দশটা খাসি, এই বুকসমান উঁচু তিন-চারটা— তোমাদের কাছে নাম করব না, রাগ করবে; খুব ভালো দেখে 'বড়োখাসি' এনে রেখেছিল। সেদিন সেগুলি তারা জবাই করে কেটে কুটে বানিয়ে রাখল; মসলা পিষে রাখল, বোঝা বোঝা কলাপাতা এনে ঘরের কোনায় জড়ো করল, বাদাম পেস্তা কিশমিশ ঝেড়ে বেছে ধুয়ে শুকিয়ে থালা থালা ভরল, জালা ভরা ভরা নানা রঙ-বেরঙের শরবত তৈরি হল। এই-সব যা যা করবার সকাল থেকে চুপে চুপে সব কিছু সেরে রাখল।

'তার পর সূর্য ডুবলে পর চার দিক যখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেল, তখন

উঠানের একপাশে বড়ো বড়ো চুল্লিগুলোতে আগুন দিয়ে বড়ো বড়ো হাঁড়িতে, ডেক্‌চিতে রান্না চাপিয়ে দিল দশ-বারো জনে মিলে। তিন-চার রকমের পোলাও, তিন-চার রকমের মাংস, কোপ্তা, কোর্মা, কাবাব— সে কী খোসবো রান্নার, চার দিক ভুর ভুর করবে। এক-একটা রান্না শেষ হয় আর ডেক্‌চি সমেত ঘরে এনে সাজিয়ে রাখে, আবার নতুন করে রান্না চাপায়।'

'পাড়াপড়শিরা রান্নার খোসবো পেয়ে কী ভাবে?'

'ভাবে আমার বাপ কুটুমবাড়িতে রান্না করে পাঠাবে বুঝি। আমাদের মধ্যে তো আছে, ধরো যদি কোনো কুটুমবাড়িতে বিয়াসাদি হয় আমরা রান্না করে পাঠাব সেখানে।'

'পড়শিরা কেউ আসে না দেখতে?'

'বললাম না, আমার বাপকে সক্কলে ভয় পায় যে। বিনা হুকুমে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে আসবে কোন্ সাহসে? তা ছাড়া বস্তির প্রায় সবই আমাদের আত্মীয় লোক। বাপের চাচাতো ফুফুতো ভাইরা আসত। নয়তো এত লোকের রান্নাবান্না করা, পরিবেশন করা, জিনিসপত্তর জোগাড় করা, এই-সব করবে কে?

'তারপর শোনো; সেই রান্না-বান্না তো হচ্ছে এক দিকে আর-এক দিকে ঘরে কার্পেট দড়ি বিছিয়ে, কলাপাতা পেতে, জলের গেলাসে কেওড়া-দেওয়া জল ভরে, রেকাবিতে করে পান সাজিয়ে, ভালো ভালো তামাক দিয়ে গড়গড়া সাজিয়ে, সব ঠিকঠাক করে রাখা হল। মাঝ রাত্তির হল, বারোটা বেজে ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল, আর দলে দলে ডাকাতরা এসে বাড়িতে ঢুকল। এক-একদল ঢুকছে আর অম্‌নিই বসে যাচ্ছে খেতে কাতারে কাতারে পিঁপড়ার দলের মতো। এত যে লোক তা কারো মুখে কোনো কথা নাই। খাওয়ার লোক খাচ্ছে, দেওয়ার লোক দিচ্ছে এই দেওয়ার আর খাওয়ার ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নাই ঘরে। সে কী সব ডাকাত! এখনো আমার চোখে ছবির মতো ভাসছে। এই বড়ো বড়ো পাগড়ি মাথায়; রঙ কী, যেন ফেটে রক্ত পড়ছে। লম্বা চওড়া মজবুত শরীরের গড়ন সকলের। পোশাকই বা কত সুন্দর! ভিতরে কী পরেছে মনে নাই, উপরে ঝুলিয়েছে একটা আলখাল্লার মতো; এখানকার জমাদাররা শীতকালে যেমন একটা লম্বা জামা গায়ে দেয় তেমনি গলা থেকে পা অবধি ঝোলানো। তারা নড়ছে ফিরছে আর পোশাক-

গুলি ঝক্‌ঝক্ করে উঠছে। মনে হয়, কত কত সোনার পাতা দিয়ে মুড়ে রেখেছে যেন জামাগুলি। তাদের মধ্যে দারাংকালীর চেহারাটাই আমার পরিষ্কার মনে আছে। তাকে আমি পরেও একবার দেখেছিনু, আমার বাপের অসুখ হয়, সে এসেছিল বাপকে দেখতে। তখন আমি দশ-বারো বছরের। দারাংকালী ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর আর পালোয়ান। কুঁহামোড়লও ছিল তেমনি জোয়ান। গাঁঠমাঁও কম যায় না। এই তিনজনকেই আমি চিনতাম ভালো করে। অন্যদের নাম তত মনে নেই। এরাই ছিল দলের মাতব্বর গোছের। তা সেইবারে আমি তো ছিনু মার কাছে একটা ছোটো ঘরে বন্ধ হয়ে; বাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করে। হঠাৎ আমি কান্না জুড়ে দিনু 'বাপের কাছে যাব'। বাপ আমার কান্না শুনে আমাকে ডেকে পাঠাল। আমার ছোটো চাচা এসে আমায় নিয়ে গিয়ে বাপের কোলে দিল। ওমা, আমি না ডাকাতদের দেখে ভয়ে আরো জোরে চিৎকার করে উঠনু। তাড়াতাড়ি বাপ আমাকে শান্ত করে মার কাছে পাঠিয়ে দিল।'

'ডাকাতরা কোথায় রইল সে রাতে?'

'তারা খাওয়া-দাওয়া সারা হলে পর চলে গেল নিজ নিজ গাঁয়ে।'

'দূর দূর গাঁ থেকে এত ডাকাত এসে একসঙ্গে কাছাকাছি থাকত কোথায় দিনের বেলায়?'

'দিনের বেলায় তো তারা ঢুকত না গাঁয়ে। আগে হতেই ঠিক থাকত ধারে কাছে খালে বিলে নৌকোতে করে এসে সন্ধেটুকু অপেক্ষা করত; খেয়ে-দেয়ে আবার সেই নৌকোতে করেই রাতারাতি ফিরে চলে যেত।'

'তোমার বাপ কি দলেরই একজন ছিল?'

না, না; আমার বাপকে কখনো ডাকাতি করতে কেউ দেখে নি কোনোদিন। তবে কথা হচ্ছে কি, ডাকাতরা তাকে মানত খুব।'

'তবে তোমার বাপ তাদের সর্দার ছিল বুঝি?'

রূপজান মুখে কাপড় দিয়ে খুদে খুদে চোখ দুটি বুজে মাথা নেড়ে হেসে বললে, 'এখন আমার মনটা তো সেই রকমই কহিছে।'

নববর্ষ।

মাথার উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ— এখানে ওখানে একটু আধটু হালকা

শাদা মেঘ। একজোড়া বক উড়ে গেল তারই গায়ে গায়ে, কোথায় কে জানে!

ধীরে ধীরে সূর্যের প্রথম আলো দেখা দিল দেয়ালের ওপাশে পুবকোনায় প্রকাণ্ড পাকুরগাছের কচি পাতার ফাঁকে ফাঁকে। ঝলমল করে উঠল সবুজে আলোতে হাওয়াতে মিলে সে কোণটি! ক্রমেই সেই আলো গিয়ে পড়ল কাঁঠালগাছের গোড়ায়, দেয়ালের গায়ে, লেবুগাছের ডগায়; তলায় লম্বা আবছা ছায়া ফেলে। সেই ছায়া স্পষ্টতর হতে হতে এক সময় উজ্জ্বল মধুর আলোতে ভরে গেল ছোট্ট আঙিনাটুকু। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল যেন একসঙ্গে সবাই।

সতু এল বারান্দায় কাঁদো কাঁদো মুখে। ঘুম ভেঙে মাকে তার দেখতে পায় নি ঘরে। আমায় সামনে পেয়ে একমুখ হেসে দু-হাত বাড়িয়ে বললে, 'মাম্মা— দয়— দয়।' কোলে ওঠার ভালো ফন্দি পেয়ে গেছে সতু। এ কথার পর খুশি না হয়ে পারে কি কেউ? তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিলাম। কোলে উঠে সতুর মহাস্ফূর্তি; কেবলই দু-হাত উপরে তুলে শরীর ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে, 'মাম্মা— দয়— দয়।' ভারি এক মজা। বলি, 'হয়েছে হয়েছে, এবার থামো তুমি। জয় তো নিশ্চয়ই, তোমার জয়, আমার জয়, আজকের দিনের জয়; কিন্তু কোলে উঠে যদি এমনি নাচতে থাকো, তো কোলে রাখি কী করে?'

এলা এল গরম জলের কেটলি ও খানিকটা বোরিক তুলো হাতে নিয়ে। ভাবীর পায়ে সেঁক দিতে হবে। কয়দিন আগে— ভাবী চরকায় কাটা সুতো দিয়ে গেঞ্জি বুনছিলেন দাদার জন্য— নিমগাছতলায় বসে একমনে। দাজু টুকটুক করে গিয়ে সুতোর গুটিটা খপ করে তুলে নিয়ে দে দৌড় সেখান হতে তার ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবীও হাত ধরে পিছু ছুটলেন হৈ হৈ করে, তার পিঠে দুই চাপড় মারলেন, সুতোর গুটিটা কেড়ে নিলেন, শেষে দাজুকে শুদ্ধ বগলদাবা করে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। এবারে সুতো, কাঁটা গুছিয়ে স্থির হয়ে ভাবী ফের বোনা শুরু করবেন, দেখেন ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে দর দর করে। নখটা একেবারে থেঁতলে গেছে। ছুটবার সময়ে বোধ হয় হোঁচট খেয়েছিলেন রাস্তার দু-পাশের কোণ-বের-করা ইটের মাথায়।

ডাক্তারবাবু বারে বারে শাসিয়েছেন নখটা কেটে না ফেলে দিলে ভোগ আছে কপালে। ভাবী বলেন, 'তা আছে তো থাকুক কেনে। ভোগের লেইগে আর ভয় দেখাইবা কি। কতই তো ভুগছি এখানে।'

যমুনা বলে, 'এই তোমার সাহস ভাবী?'

মায়া বলে, 'বলছেন ডাক্তার, কাটিয়েই ফেলুন না। একদিন তো বন্দুকের সামনেই বের হয়েছিলেন তখন তো কৈ ভয় ছিল না একটুও? আর আজ এই নখটুকু কাটতে এত ভয় কেন আপনার?'

ভাবী রেগে ওঠেন। টন্‌টন্ করছে ব্যথায় আঙুল, এ সময়ে এত কথা কি ভালো লাগে কারো? পায়ের আঙুলটা মুঠোয় চেপে ধরে ভাবী বলেন, 'রাখি দাও যত বড়ো বড়ো কথা। আমি বলে মরছি আমার জ্বালায়। তোমরা আসছ আমায় বোঝাতে। আমি কি কম বুঝি তোমাদের চেয়ে?'

শুধু এলাই সাহস দেয় বারে বারে, 'দেখো না ভাবী এই সেঁক দিয়ে দিয়েই তোমার পা ভালো করে দেব। কারো কথা শুনো না তুমি।'

ভাবী এলার দিকে ডান-পাটা বের করে দিতে দিতে বললেন, 'এই আঙুলটাকে এবারে তুই বেঁচিয়ে দিলি রে এলা। নয় তো কাটি ফেলি দিত ডাক্তারে ঠিক।'

বারান্দার একপাশে বসেছে কয়েদিরা উলের বোনা হাতে নিয়ে। জেলের খাটুনি। তড়বড় করে হাত চলছে—মুখও চলছে। সেই একই কথা—অতীতের সুখ-দুঃখের নানা কাহিনী নানা রঙে রঙ করা। কান পেতে থাকি, তাদের কথা ধরেই তাদের কাছে যেতে চেষ্টা করি; কিন্তু 'জানা' 'বোঝার' অহংকারে বারে বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। বিচিত্র সুতো ছড়িয়ে তার মাঝে এরা বসে আছে যেন। ঠিক কোন্ সুতোটি ধরে এগোই, ধাঁধা লাগে মনে।

সমিরন তার পাশের জনার কি একটা মন্তব্যে হঠাৎ রুখে উঠে বলল, 'পরের সোয়ামির দোষ তো দেখবি নি তরা; ও কি কম শয়তান ছিল; কম জ্বালাইছে আমারে? কাটব না অমন সোয়ামিরে? কাটিছি, বেশ করিছি। ও বলবে কেনে আমার মা-রে যা তা কথা? চুরি করি করি জেল খাটফে, মাগ ছাওয়ালকে খাতি দিতে পারবে নি, আবার উলটি আসফে আমার মা বাপ তুলি কথা কইতে? তারে দাও দিয়া কাটব না তো কি করব? একদিন যেমন আসিছে সন্ধ্যার সময়—দাওয়ায় যাবে উঠতি, হেনকালে ঘর থিকা দাও আনি

দিলাম তার মাথায় এক কোপ বসায়ে—"কও দেখি এইবারে কেমন করি কবা আমার মা বাপ তুইলা কথা।" '

সুরাতন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আর দুঃখের কথা কী হইব রে কইয়্যা ? আমাগো দুঃখের কথা কইলে ভিক্ষার ঝুলি ভইর‍্যা যায়।'

জামিরন বললে, 'কলা, গুড, গমের আটা আর মুরগির ডিমের কুসুম একসঙ্গে মাইখ্যা তেলে ভাজা বড়া কি ভালোই লাগে রে খাইতে। খাইছস্ তরা কখনো ? এইবারে বাড়ি গিয়া কইর‍্যা খাইস।'

মিছিরন বাঁ হাতে জল-ভরা টিনের মগ নিয়ে গান গাইতে গাইতে সামনের দিকে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নেচে চলেছে কাঁঠালতলা দিয়ে—

'আমি শিক্ষা করতে গিয়াছিলাম বিলাত ভ্রমণে—
তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্—
তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্।
যাই যাই যাই, যাই আমার আর তো সহে না—
তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্—
তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্‌বির্ তির্।

পড়শি গনশার মা কলকাতায় এক মেমের বাড়ি কাজ করত। সে সেখানে এই বিলিতি নাচ গান শিখে এসে শিখিয়েছে মিছিরনকে।

মেট্রন সকলের চার দিকে ঘুরছেন আর বিড়বিড় করে আঙুল দেখিয়ে বলছেন, 'এই এদের মধ্যে একজন পাঁচ-বছরি, একজন ছয়-বছরি, একজন দশ-বছরি, একজন তিন-মাসি, একজন পাঁচ-মাসি আর বাদ বাকি সব বিশ বিশ—বিশ-বছরি।'

নেছামন তার লম্বা মুখখানা আরো লম্বা করে খ্যাঁকানো গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'হ, হ, আমরা সব বিশ-বিছরি— সারি সারি বিষের হাঁড়ি। কপাল কইর‍্যা আইছিলাম— করুম কী ?'

সরলা এসে কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে নাকি স্বরে ভাবীকে বললে, 'মা, আইজ আমারে তো কেউ আপনারা 'যাইট' করলেন না।'

ভাবী বললেন, 'তোমাদের বাংলাতে 'যাইট' কারে বলে আমি জানি না। যাও, যাও, তুমি এখন নিজের জায়গায় বসগা যাও, যাইট যুইট হবে পরে।'

ঝগড়াটি, পেটুক, সরলাকে দেখতে পারে না কেউ এখানে। তাই সে

পড়ে গিয়েছে ভাবীর সুনজরে। সরলার জন্য দিবারাত্রি ভাবীর উৎকণ্ঠা আতঙ্কের সীমা নেই। সবাই যখন তাকে 'দূর, দূর' করে, ভাবী গিয়ে সামনে পড়েন, তার হয়ে দু-কথা শুনিয়েও দেন অন্যদের। কোনো কিছু খাবার জিনিসের ভাগ-বাঁটরায় সরলা পাছে বাদ পড়ে যায়, ভাবী তার ভাগটা তুলে রাখেন আগে হতে। গরমে সরলা কষ্ট পায়; একদিন দেখি বাজার হতে তালপাতার পাখা এল কয়েকটা, তারই একটা উঠল সরলার হাতে।

সরলা বলে, 'আমি কি বুঝতে পারি না কিছু? বুঝি হগ্‌গলঐ। এইখানে কেঐ আমারে দেখতে পারে না। এক এই বিহারী মা ছাড়া।'

রূপজান বললে, 'সেলাম মা, আজ বছরকার দিন। বাড়িঘরের সব তোমার ভালোয় ভালোয় থাকুক। আল্লার দোয়ায় তাড়াতাড়ি খালাস পেয়ে ছাওয়াল কোলে নাও। আজ কি একটা যেমন-তেমন দিন? কাল গেছে আরো ভালো দিন। আজ শিরুয়া, কাল ছিল বিযুয়া। এই বিযুয়া দিনে সম্বছরের ভালোমন্দ সব কিছু কাজ আমাদের সারতে হয়। এই দিনটা ভালোয় ভালোয় যাবে তো সারা বছর ভালো কাটবে। আমাদের দেশে এই এতবেলায় সব লোক খেতে চলে গেছে হাল বইতে। বেটাছেলেরা কেউ আজ ঘরে বসে থাকবে না। আমিও বাড়িঘরে থাকলে এতক্ষণে কত কাজে হাত দিতাম।

অঘ্রান মাসে আমাদের যেই ধানটা ঘরে আসবে— প্রথম দিনের কাটা ধান শাস্ত্রমতে কেটে এনে যে জায়গায় রাখা হবে সেখানে আগে একটা পাথর রেখে এক ঘটি জল ঢেলে দিব; তার পর সেখানে সেই ধানের বোঝাটা রাখবে। পরে ধান মাড়াই হয়ে গেলে ধানের বোঝাটা যেই খড় দিয়ে বেন্ধে এনেছিল সেই খড়ের আঁটিটা যত্ন করে তুলে রাখব। কালকের দিনে সেই খড় নামিয়ে তা পিঠা-সিদ্ধ-করা জলে ভালো করে ভিজিয়ে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, যা যা গাছ আছে সব গাছে সেই খড় কিছু কিছু বেন্ধে দিব। তা হলে সারা বছর গাছের আর কোনো আপদ বিপদ হবে না, গাছটা ভালো ফল দিবে। গোরুগুলাকে স্নান করাব, করিয়ে শিং দুটিতে ভালো করে তেল মাখিয়ে সিন্দুর পরাব। আর করব কি— তিনটা কালো কালো ইচামাছ ও তিনটা গুঞ্জরি মিহি করে বেঁটে মাড়ির সঙ্গে একটু করে গুলে দিয়ে তাদের খিলাব। তা হলে তাদের আর দুশমনে কিছু অনিষ্ট করতে পারবে না।

এই বিযুয়া দিনে সারা বছরের বৃষ্টি-বানের ফলাফলও জানতে পারা যাবে।

বাড়ির কর্তা কাছাকাছি একটা বনে যাবে। গিয়ে ধর যেখানে কচুবন আছে সেখানে বেশ ভালো দেখে কচুপাতাগুলি বেছে নিবে। নিয়ে, প্রত্যেক মাসের নাম করে মন্ত্র পড়ে গাছের উপরেই এক-একটা কচুপাতা ঠোঙার মতো করে মুড়ে মুখটা ভালো করে সুতা দিয়ে বেন্ধে রাখবে। পর পর বারোটা পাতা বারো মাসের নামে বেন্ধে রেখে চলে আসবে।

তার পর পরদিন সকালে গাঁয়ের সবাই মিলে আবার সেই বনে যাবে। পাতার বান্ধনগুলি এক এক করে সবার সামনে খুলবে। যেই মাসে বৃষ্টি হবে সেই পাতার ভিতরটা জলে ভরে থাকবে। যে মাসে বান হবে সে পাতাটার জল ভরে গিয়ে টুপটুপ করে বেয়ে পড়বে। আর যে মাসে বৃষ্টি হবে না সে পাতাটায় এক ফোঁটাও জল থাকবে না।'

'পাতার মুখটা তো বাঁধা থাকে, ভিতরে জল ঢোকে কী করে?'

'আল্লার মর্জি সব। আমি তা কেমন করে কহিব?'

ভাবী স্নান সেরে এসে সিঁদুরের কৌটা হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে টিপ পরালেন সকলের কপালে; সধবাদের সিঁথি দিলেন রাঙিয়ে। রাধা মাথা-ভরা সিঁদুর নিয়ে সলজ্জভাবে মুখ নিচু করে বসে রইল ঘরের কোনায়। বড়ো সুন্দর মানিয়েছে তাকে। এই একটুখানি সিঁদুরের লাল রঙ রাধাকে আজ বদলে দিল কতখানি।

ভাবী বললেন, 'দেখ তো, কেমন সুন্দর লাগছে এবারে দেখতে। আর কী সাজে থাক তোমরা এখানে— খালি হাতে, খালি মাথায়, পোড়া কপাল তোমাদের, আর মুখে আগুন সরকারের।'

স্বরাতন ঘরে ঢুকে রাধাকে দেখে দু-হাতে তালি বাজিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তার পর রাধার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ও রাধা মা, আইজ ঠিক মনে হচ্ছে যে, বাপ আমার বর্তমান আছে।'

রাধার মাথা আরো নুয়ে পড়ল দু-হাঁটুর মাঝে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিয়ে লেবুতলায় গিয়ে বসলাম। আজ বছরের প্রথম দিন। সবাই হাসিমুখে আনাগোনা করছে, আপন আপন কাজ সারছে। মাঝে মাঝে আবার এ ওকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, 'দেখ্, আইজ বচ্ছরকার দিন, অমন করিস না বলছি।' মেট্রনের হাঁকে ডাকেও আজ আর সেই উগ্রতা নেই।

ওদিককার শিরীষগাছটা ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে ; দূর থেকে দেখা যায়। ঘন সবুজের স্তরে স্তরে শিরীষফুলের লাল আভা। চার দিকেই কেমন একটা স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ দিনের আলোতে, গাছের পাতার ঝিলিমিলিতে, কাছের জনের কথার সুরটিতে। বড়ো ভালো বড়ো সুন্দর আজকের দিনের সবকিছুই। ভাবি, এই ভালো-লাগা স্থায়ী হয় না কেন জীবনে? কোথায় সে বাধা পায়— দ্বন্দ্ব জাগে কত। কোলের উপর খোলা গীতাঞ্জলির পাতা নাড়তে লাগলুম। ঘরে গাইছে কে—

…'বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।'

ফুলু বেওয়া এসে দাঁড়াল সামনে। দিনাজপুর থেকে চালান হয়ে এসেছে এখানে দু-মাস আগে। সেখানে স্বদেশী দিদিদের সম্বন্ধে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা সে-ই জানে। এখানে এসে নাকে কানে খত দিয়েছে সকলের সামনে, আর যদি সে কোনো স্বদেশী দিদির সঙ্গে কথা বলে কখনো তবে— ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যর্থ হয়েছি কতবার তার সঙ্গে আলাপ জমাতে গিয়ে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। হয়তো কখনো অন্য সকলের সঙ্গে ফুলু কথা কইছে, হাসছে, গাইছে ; আমরা কেউ কাছে গেলাম কি গুম হয়ে ফিরে বসে রইল। আর সাধ্য কি কারো যে তাকে কথা কওয়ায়। দেখে দেখে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

আজ কী মনে হল, ফুলু মাথা নিচু করে লেবুতলায় ঢুকল ; আমার গা ঘেঁষে বসল, শেষে থুঁতির নীচে হাত রেখে ঘাড় কাত করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকার পর তার মুখখানা আরো খানিকটা এগিয়ে এনে ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'মনটা যেন আজ ভার ভার ঠেক্‌ছে ; কেনে গা?'

মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লাম শুধু।

সে বললে, 'মাথা নাড়লে শুনব কেনে? আমি বুঝি গো বুঝি। মুখ দেখলেই মনের কথা টের পাই। ছাওয়ালের জন্যে মন-কেমন করছে— লয়?'

খটখটে দুপুর। গরম হাওয়া বইছে বাইরে আম-কাঁঠাল পাতায় খড়মড়

শব্দ তুলে। কাকগুলি কা কা করছে ডালের উপরে বসে। চড়ুই একটি উড়ে বেড়াচ্ছে মাথার উপরে ঘরের ভিতরে— এক ভেন্টিলেটার থেকে আর এক ভেন্টিলেটারে। কয়েদিদের আরামের ঘণ্টা এখন। সকলেই মেঝেতে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েছে একটু। দাজুটা উসখুস করছে, এখুনি হয়তো উঠে জ্বালাতে আরম্ভ করবে তার ঘুমন্ত মাকে। খতেজা কম্বলের ভাঁজ থেকে ছোট্ট এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো সকালের দুধের সঙ্গে পাওয়া আজকের চিনিটুকু থুথু দিয়ে ভেজানো আঙুলে লাগিয়ে লাগিয়ে চাটছে। জলিল ব্যস্ত তার কাঁচা আমের টুকরোগুলি নিয়ে। মার পিঠ ঘেঁষে শুয়েছে সে, ময়লা গামছাখানা মুখের উপর ঢাকা দিয়ে। খতেজা দেখলে এখুনি হয়তো ভাগ বসাবে তাতে। গামছার নীচে মুঠভরা আমের সদ্‌গতি করে চলেছে তাই একমনে, অতি সন্তর্পণে।

শুয়ে আছি লোহার খাটে বাঁ-হাতে মাথা রেখে। কোলের কাছে খোলা শিল্পশাস্ত্র।

'বীণা দেখা যায় কিন্তু সুর— তাকে দেখা যায় না; কিন্তু চেনা যায় সেই সুর দিয়ে যে এটি বীণা বাজছে, ঢাক নয়, ঢোল নয়, গ্রামোফোনের বীণা নয়। দেখা বীণার সঙ্গে না-দেখা যে সুরটি জড়িয়ে রয়েছে, সেটি বীণার প্রাণস্বরূপ, বীণার কাঠামো ধরে আছে প্রাণ।

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'।

একটি রূপের অশেষ প্রকাশ, দৃষ্টি খুঁজে-খুঁজে রূপসাগরের পায়ে অরূপ বলে একটা কিছু ধরতে সাঁতরে চলল না, রূপের মধ্যেই তলিয়ে গেল। মন যৌবনের শেষ চাইলে না, নতুন থেকে নতুনতর আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেই চলল। এই হল রূপদক্ষের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি। একসঙ্গে রূপ-লাবণ্য-ভাবভঙ্গি যা' চোখে দেখা গেল তা এবং সেইসঙ্গে রূপের মাধুরী তাও পেয়ে গেল যখন মানুষ, তখন সে হল রূপদক্ষ।'

এইখানেই তো, এই রূপের মাধুরীকে নিয়েই তো যত গোল। একে ধরা যায় কী করে? না হলে যে প্রাণ শুকিয়ে আসে, অন্তরে হাহাকার জাগে। অসহ-তীব্র এক দাহন মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে ওঠে ভিতর থেকে, মনে হয়, গেল বুঝি সব এবারে নিঃশেষে পুড়ে। এর কি উপায় নেই কিছু?

উঠে বসলাম বিছানায়। একটি আমডাল এসে পড়েছে বারান্দার উপর। পল্লবের কচি কচি পাতাগুলি জুড়ে বাসা বাঁধছে লাল পিঁপড়ের দল। ব্যস্ততার অন্ত নেই তাদের। শুকনো হাওয়া ছিঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে জোড়া পাতাগুলিকে বারে বারে, এলোমেলো ভাবে দুলিয়ে দিয়ে। কিন্তু নিরাশ করতে পারছে কই তাদের তবু? আবার গিয়ে তারা জড়ো হচ্ছে পল্লবের মাঝে, বোঁটায় বোঁটায় চাপ দিচ্ছে সকলে মিলে; সেই চাপে একটি পাতা আর-একটিতে এসে ঠেকতেই পিলপিল করে নেমে আসছে তারা লালা দিয়ে দু-পাতা জুড়তে জুড়তে। দু-পাতার শেষ পর্যন্ত জোড়া হয়ে গেলে পর আবার উঠল তারা উপরে তেমনি করে; জড়ো হল পল্লবের মাঝে, আবার চাপ দিল বোঁটায় বোঁটায়, আবার একটির সঙ্গে আর-একটি পাতা জুড়তে জুড়তে নেমে এল শেষ পর্যন্ত। দেখতে দেখতে কিছুক্ষণের মধ্যেই বড়ো একটি ফাঁপা ঠোঙার মতো বাসা তৈরি হয়ে গেল, প্রতিকূল হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই।

আশ্চর্য— বিশ্বপ্রকৃতির সব-কিছুই অতি আশ্চর্য। কিন্তু 'মাধুরী'কে পাই কই? সেই 'মাধুরী' যার মধুর স্পর্শে প্রাণ উপচে ওঠে— সেই মাধুরী যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় আনন্দস্রোতে।

আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। আবার বইখানি বুকের উপরে খুলে ধরলাম। এবারে পড়লাম—

'সংতো সহজ সমাধ ভলী,
সাঁঈসে মিলন ভয়ো জা দিনতে স্থরত ন অন্তি চলি ॥
আঁখ ন মূদুঁ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধারুঁ।
খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখুঁ স্থওর রূপ নিহারুঁ।

—সহজ সমাধিই ভালো, হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই—।'

'ঘরঘরিয়া' এল লোহার ডাণ্ডা হাতে, জানালা-দরজার লোহার শিকগুলি ঠুকে দেখতে। রোজই আসে সে এই সময়ে জমাদারের সঙ্গে। মাথা নিচু করে দৃষ্টি নামিয়ে নিজের কাজ করে যায়। ক্বচিৎ কখনো গলা খাটো করে দু-একটা কথার জবাব দেয়। একুশ বছরের জন্য ঢুকেছে জেলে; তেরো বছর কেটেছে মাত্র তার। বাড়ি ফিরে যাবার আশা রাখে না মনে। গত কয়দিন তাকে দেখি নি জেনানা ফাটকে। অন্য কয়েদি কাজ চালিয়ে গেছে। কী

জানি, অসুখ বিসুখ করেছিল কি? আমার জানালার কাছে আসতে তাকে শুধোলাম। 'এ কয়দিন আসো নি কেন? শরীর ভালো তো?'

সে আড় চোখে চেয়ে দেখল জমাদার কতদূরে দাঁড়িয়ে। পরে বলল, 'শরীর ভালোই— এই শরীরের কি কিছু হয় সহজে? তবে কিনা—' আঙুল দিয়ে খতেজা বনবুড়িকে দেখিয়ে, ভারী গলায় বললে, 'এই এদের দেখলে আমার মনের ভিতরটা কেমন উলটে পালটে আছাড় খায়। বাড়িতে এইরকম ছেলেপুলে রেখে এসেছিলাম। সেই-সব কথাই মনে হয়। তাই এখানে আসতে চাই না। আবার না এসেও থাকতে পারি না'— বলতে বলতে বুড়োর চোখ দুটি জলে ভরে এল। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি অন্য জানালায় গিয়ে শিক ঠুকে চলল।

বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঘুরতে লাগলাম— আনাচে কানাচে। এখানে আসার পর উত্তর-পশ্চিম কোনায় রান্নার জন্য একটি চালাঘর তুলে দেয় কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করে, বাঁশের খুঁটির গায়ে বাঁশের বেড়া লাগিয়ে। ঝড়বৃষ্টির দিনে শুকনো ধুলো-পাতার তাড়নায়, জলকাদার অত্যাচারে, রান্নাঘরের নতুন ব্যবস্থা হয়েছে এখন খাটুনি-ঘরেরই একপাশ ঘিরে। অনাবশ্যক বাড়তি চালাঘরটা ভেঙে ফেলা হল সঙ্গে সঙ্গে। এই সাত-আট দিন আগের কথা, একদিন জনকয়েক পুরুষ কয়েদি নিয়ে জমাদার এল; বেড়া বাঁশ, টেনে টেনে খুলল, ভিতটা কোদাল দিয়ে সমান করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল, ইট পাটকেল কয়টা বস্তায় পুরল; শেষে বাঁশ বেড়া ইটপাটকেলের বস্তা মাথায় পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে তারা বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ব্যাপার; জায়গাটা পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে গেল।

আজ দেখি সেই ভিতটুকু ছেয়ে কচি কচি দূর্বাঘাস মাথা তুলেছে। তার স্নিগ্ধ কচি সবুজ রঙের উপর দিয়ে হাওয়া বইছে। সরু সরু ডগাগুলি থরথর কাঁপছে।

যে ভিতের উপরে এতদিন এত রান্না করেছি, এত সময় কাটিয়েছি; কত শিগগির মিলিয়ে গেল তা দু-দিন যেতে না যেতে। এমনই হয়। চিহ্ন যত এমনি করেই ধুয়ে মুছে যায়। নয় তো চলে না। এ বেদনা যত সত্য— তত নিষ্ঠুর।

সন্ধে হয়ে এল— নম্বরে ঢুকলাম। দিন অবসানে নীড়ে-ফেরা পাখির

কাকলি আর থামে না সহজে। নম্বর জুড়ে সকলে কলকল করে যে যার বিছানা পাতছে, গুনগুন করে গানের কলি ধরেছে, সখীর গলা ধরে ফিসফিস করে গোপন-কথা কইছে। মিছিরন খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ হেসেই চলেছে। সরলার বুড়ি মা চিঠি লিখেছে, 'মাগো, দেশে যা দুভিক্ষ, একবেলাও পেট ভরে ভাত খেতে পাই না আজ কতদিন হল। তোমার দশ বছরের জেল হয়েছে শুনলাম। তুমি যদি আমায় সেখানে কোনো কাজকর্মের সুবিধা করে দাও তবে গতরে খেটে দু-বেলা দু-মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচি ' মিছিরন কৌতুকে ফেটে পড়ছে, সঙ্গিনীদের কোলের উপর উলটে পালটে লুটোপুটি খাচ্ছে আর হাসছে— 'খ্যাঁক্ খ্যাঁক্—খ্যাঁ হ্যাঁ—। সরলার মা মাইয়ারে লিখছে চাক্‌রির চেষ্টা করতে। শুনছস্ এমন কথা আর কখনো তরা? জেলখানায় মাইয়া তারে দিব চাকরির সুবিধা কইর‍্যা— খ্যাঁক্ খ্যাঁক্—খ্যাঁ—হ্যাঁ— ।'

কদমমণি একপাশে শুয়ে আপন মনে ছড়া পাঁচালি আউড়ে চলেছে, মনটা আজ তার খুশিতে ভরা। বাড়ির চিঠি পেয়েছে, একমাত্র ছেলে— ষোলো-সতেরো বছরের; একদিন বাড়ি থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। পরে জানা যায় সে গেছে সাহারায়। গাঁয়েরই একটি লোক লুকিয়ে পাঠিয়েছে তাকে সেখানে। মেট্রন চিঠির ব্যাখ্যা দিলেন: 'সাহারা তো কাছেই, ভাবনা কি? দুই-তিন খান গ্রাম তফাৎ মাত্র। ভালোই থাকবো তর পোলা সেইখানে; রোজগার কইর‍্যা টাকাপয়সা ঘরে আনব। তর আর দুঃখ-কষ্ট থাকব না কিছু।'

শুনে কদমমণি এক মুখ হেসে বলেছিল, 'পোলা তো আমার সেয়ানা হইছে, সে বুঝতে পারছে যে, এইবারে তার মায়ের বাড়ি ফিরা যাইবার সময় হইয়া আইল। তাই তাড়াতাড়ি গিয়া সে চাকরিতে ঢুকল। আর সবাই আমারে ফেইলা দিলেও পোলা আমারে ফেলতে পারব না কিছুতেই। তা আমি ঠিকই জানি।'

রূপজান মহা উৎসাহে হাত-পা নেড়ে এলাকে বোঝাচ্ছে, 'মোটে শোন, আমাদের নিয়ম আছে, ছেলেপিলে হলে একুশ দিন পোয়াতিকে আমরা রোজ একটি করে কোরগোনা মুরগি বেশ ভালো করে ঘি-মরিচ দিয়ে রান্না করে খেতে দিব। দেখতে দেখতে পোয়াতির এইরকম মোটা মোটা হাত-পায়ের গোছা হয়ে যাবে।'

এলা দু-চোখ বড়ো বড়ো করে আর একটু এগিয়ে এল। রূপজান গরমের জ্বালায় ঘাড়ের, বুকের কাপড় খুলে পুঁটলি পাকিয়ে কোলে গুঁজে আরো আঁটোসাঁটো হয়ে জাঁকিয়ে বসল। এমন আগ্রহী শ্রোতাকে কি সহজে ছাড়ে।

ভাবী খাটে বসে চিঠি লিখছেন একমনে। সরলা এসে পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, 'বাবারে চিঠি লিখতে আছেন বুঝি? লেইখ্যা দেন যে, জেলখানায় আইস্যা আমার অনেক মাইয়া হইছে।'

ঘরভরা সকলের গুব্‌গুব্‌ হাসির শব্দে ভাবী সচকিত হয়ে একবার মুখ তুলে তাকিয়েই পিছন ফিরে লাগালেন তেড়ে এক তাড়া সরলাকে, 'পালা, পালা বলছি এখান হতে। আমাকে এসেছিস জ্বালাইতে। আর কোনো কথা পেলি না খুঁজে।'

রাত ঘনিয়ে এল। দূরের ঘড়িতে বাজল নয়— দশ— এগারো— বারো। শান্ত হয়ে গেছে সব কোলাহল। সারাদিনের কর্মক্লান্ত অর্ধঅনাবৃত দেহ সবার বিশ্রাম নিচ্ছে অচেতন ঘুমে মেঝের উপরে।

ধীরে ধীরে বসলাম এসে রাধার জানলাটিতে। রাধার মন আজ বড়ো বিষণ্ণ। সকাল থেকে হাতে কাজ করছে, চোখে ধারা বইছে। কারণ বলে না কাউকে কিছু। শুধোতে এলে অনুরোধ ক'রে বলে, 'আমায় খানিক একলা থাকতে দাও গো তোমরা; মনে ব্যথা জেগেছে, আপনি সামলে নেবখন।'

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রাধা দু-হাতে মুখ ঢেকে। কাছে গিয়ে বসতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, 'এত তো গীতা পড়ে শোনাও, তোমার গুরুদেবের কথা বলো, কত উপমা দাও; কিন্তু দুঃখকে জয় করতে পারছি কই? ভাবি তো, নিজের দুঃখকে বড়ো করে দেখব না আর; কিন্তু আমার চেয়ে তার শক্তি যে বেশি। বারে বারে আমাকে এমনি করে চেপে ধরে।' রাধা আমার দু-খানা হাত তার বুকের উপর চেপে ধরল। বললে, 'এই— এই-খানাটায় কী যে হচ্ছে কী জ্বলন জ্বলছে তা কে বুঝবে? এ প্রাণ কি জুড়োবে

না আর? কাঁদি যখন সবাই এসে শুধোয়, "কি হয়েছে বল?" মেট্রন-মা এসে বলেন, "তুমি বড়ো চাপা, মন খুলে বলো না কেন কিছু। তবে তো মন হালকা হয় কতকটা।" আমার যে কোনো কথাই মুখ ফুটে বলবার নয়। যদি প্রকাশ করেই বলতে পারতাম তবে কি আমি জেল খাটতে আসি আর? ভাবি, ভগবান আমায় কী পরীক্ষায় ফেললেন! এ কাটিয়ে আর উঠব না আমি; গুঁড়িয়েই যাব এর চাপে। তাই কেন যাই না তাড়াতাড়ি, তা হলেও যে বেঁচে যেতাম। আর যে পারি নে সইতে আমি। বলো, তুমিই বলো এ জীবনে কত সইব আর। ছেলেবেলা থেকে জ্বলতে জ্বলতে যখন ভাবলাম এইবারে জুড়োব একটু, ঠিক সেই সময় ভগবান আমায় শাস্তি দিলেন। আমার জন্যেই সব-কিছু বুঝি তুলে রেখেছিলেন তিনি। এক এক সময় বলি তাঁকে মনে মনে, "কত দুঃখ দেবে দাও, কত পরীক্ষা করবে করো, আমায় ভাঙতে পারবে না কিছুতেই। দেখো, তোমার নামের জোরেই সব সইব আমি।" তাই দেখছ তো, এই এমন অবস্থায় পড়েও একদিনের জন্য আমি তাঁর নাম না নিয়ে জলগ্রহণ করি না। সময় পাই নে স্থির হয়ে বসতে, তার পর জেলখানা, এখানে তবুও তো ত্রিসন্ধ্যা বসতে পারি একটু তাঁর নাম নিতে, মেট্রন-মা কিছু বলেন না। কিন্তু কলকাতায় এ-সব হবার জো নেই; তা হলেই "কেস" করে দেবে। কত লুকিয়ে চুরিয়ে বেলফুল গাছের গোড়ায় উবু হয়ে বসে দু-হাঁটুর ভিতরে বুকের কাছে হাত নিয়ে একটু জপতপ করতাম। কোনোদিন একবারের বেশি দু-বার হাত ঘোরাবারও সময় পেতাম না; তবু আমি তাঁকে ভুলি নি কোনোদিন।'

রাধা চুপ করে স্থির হয়ে পড়ে রইল। খানিক বাদে একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'মনে পড়ে কেবল নবদ্বীপের কথা! কী শান্তি পেলাম প্রাণে আমি সেখানে। প্রায়ই যেতাম, আমার গুরুদেবের আশ্রম ওখানেই। কী সুন্দর সে স্থান, আর কী মহিমা সেখানকার! সবার মুখে সেই মধুর নাম লেগেই আছে। ছোটো ছোটো ছেলেগুলি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বাজার থেকে দুধ কিনে নিয়ে, বাঁ হাতে ছোট্ট দুধভরা পিতলের ঘটি— আর ডান-হাতটি উপরে তুলে হাতের আঙুলগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে, 'রাধে, রাধে— গোবিন্দ বল'। স্নান করে ফিরছে লোক নদী থেকে, নাম গাইতে গাইতে চলেছে, 'রাধে, রাধে—গোবিন্দ বল'। বাজার করছে, তাও ঐ নাম; ফেরি করছে, তাও

ঐ নাম ; বেড়াতে বেরিয়েছে, তাও ঐ নাম ; সব কিছুতেই ঐ নাম। তা ছাড়া নাম-সংকীর্তন তো লেগেই আছে। দলে দলে এখানে ওখানে খোল-করতাল নিয়ে বসে গেছে বৈষ্ণবরা আসর জমিয়ে। ওখানকার চৌকি-দাররাও হাঁক দেয় কী বলে জানো ? আমাদের দেশে গাঁয়ে তো বলে 'জাগো হো' ; ওখানে বলে 'রা —ধে, রা —ধে'। প্রহরে প্রহরে সে ডাক শুনতে কি মিষ্টি যে লাগে ! প্রাণমন ভরে যায়, মনে হয় সে ডাক শুনলে পাথরও বুঝি গলে যাবে। হায় রে, আর কি হবে আমার এমন কপাল ! আর কি শুনতে পাবে সেই ডাক এই জন্মে ?'

রাধা তার অলস হাত দুখানি দিয়ে আকুলভাবে জড়িয়ে ধরল আমায়। কোলে এনে রাখল তার বেদনাভরা মুখখানি।

থমথমে রাত্তির। জানালার সামনে সরু নিমগাছ! তার ঝিরঝিরে কালো পাতার ফাঁকে ফাঁকে জলজ্বল করে উঠল ছোটো বড়ো কয়েকটি তারা। জানালার শিকে মাথা হেলিয়ে মুখোমুখি বসে রইলাম— সেই বড়ো তারাটির পানে তাকিয়ে।

রাত না পোহাতে রাধা এসে মশারির ভিতর ঢুকে বসল ; দু-হাতে ভর দিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'ও, জেগেই আছ দেখছি। আমি আরো ভাবনু, আজ আমি তোমায় ডেকে জাগাব। কী করি বলো তো ? ভিতরটা যে কেবলই দপ দপ করছে। আর কতক্ষণই বা, তার পরই তো চলে যাবে ; বুক বাঁধি কী করে ?'

মেট্রন কয়েদি গুনছেন— 'এক, দুই, তিন— চার— বারো, চোদ্দ— আঠারো, কুড়ি— আটত্রিশ, উনচল্লিশ—, হ্যাঁ গুনতিতে ঠিকই আছে। 'ইশ্ কোয়াড ইটেনশন্'।' রাধা তাড়াতাড়ি গিয়ে ফাইলে বসল।

গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠলাম। এই ঘর, ঘরের কোনা, বারান্দা, বাগান, আকাশ, বাতাস, চিল, শালিক— সবই যেন আপনজনের মতো আঁকড়ে ধরেছে। ছাড়বার বেলায় ব্যথা বাজছে। এখানে একদিকে যেমন দুঃখ-কষ্ট, কদর্য গ্লানি ; আবার ছিল পাখির কাকলি, ফুলের সৌরভ, কচি পাতার মাধুর্য। সবই ছিল। যা পেরেছি, কুড়িয়েছি, যা পারি নি, তা আঘাত করেছে। জীবনের যেটা কুৎসিত দিক তাকে দূরে সরাতে অনবরত লড়াই করে চলেছি। তবু বলব ; ভালো মন্দ সব মিলিয়ে ভুলেছিলাম— ভুলিয়ে

রেখেছিল এরা আমায়— এই আমার মস্ত লাভ। তাই যাবার আগে— সবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বলি—

'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ, দিয়েছ তাঁরি পরিচয়
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে বেসেছ ভালো জ্বেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারই আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

'ফালা, ফালা; ফালাইয়া দে। যত-সব জঞ্জাল আইস্যা জোটে এইখানে। খড়ে-কুটায় তিতি-বিরক্তি ধরাইয়া দিল', যেতে যেতে মেট্রন বলে গেলেন কদমমণিকে। কদমমণি বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে ঝুল ঝাড়ছিল বারান্দার, মেট্রনের কথা শুনে এক খোঁচায় ফেলে দিল পায়রার বাসাটা থামের মাথা থেকে। বলে, 'দিলাম ফেইল্যা বাসাটারে— না হইলে আবার কবে ডিম পাইড়্যা রাখব কে জানে।'

বাচ্চাটা উড়তে শিখেছে কয়দিন আগে। মার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে— খুঁটে খুঁটে এটা ওটা খায় আর থামের মাথায় বসে বুক পিঠ ঠোক্‌রায়।

এতদিনের বাসাটা মাটিতে লোটাচ্ছে। দেখে ভাবী রেগে গেলেন; কদম-মণিকে বললেন, 'তোমাদের কি একটু মায়া-দয়া নাই প্রাণে? কী বইলে ফেলি দিলে বাসাটা তুমি? গলায় আটকিছিল? ভাত খেতে পারছিলা না?—'

কদমমণি দু-পাটি দাঁত বের করে হাসতে থাকল হি হি হি।

সতু চলে গেছে কয়দিন আগে মার সঙ্গে নিজের দেশে। দু-হাত তুলে এগিয়ে এসে কে বলবে আর 'মাম্মা— দয়— দয়'।

দাজুটা যা দুষ্টু— হুটোপাটি ধস্তাধস্তি কর তো সে খুব খুশি। উঠে গিয়ে তার সঙ্গেই খানিক খেলে এলাম।

মায়া বললে, 'স্নানটা সেরে নিন না রানীদি। বেরিয়ে কখন আবার সময় পান না পান।—'

এক ফাঁকে রাধা এসে খোপা বেঁধে দিয়ে গেছে। বলেছে, 'একদিন নাই-বা

নাইলে। কষ্ট করে থাকো। কাল চানের আগে চুল খুলতে রাধার কথা মনে পড়বে।'

মায়াকে বললাম, 'আজ আর মাথায় জল ঢালব না। কেমন যেন শীত শীত করছে।'

মায়া বললে, 'কী বলেন আপনি। এই গরমে শীত? সকাল থেকে ঘেমে ঘেমে মরে যাচ্ছি যে।'

শান্তি, এলা পরশু বেরুবে এখান থেকে। কে যেন শান্তির মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তাকে হয়তো নাও ছাড়তে পারে; জেল-গেট থেকেই আবার তাকে ফিরিয়ে আনবে।

কারণ আমার খাতা-ভরা শান্তির মুখের গরম গরম বাণী আই. বি.-রা সেন্সার করার সময়ে টুকে রাখে নি বুঝি?

শান্তি এসে বললে, 'আমার এখন বের হওয়া একান্ত দরকার। যদি না বের হতে পারি, জানেন, এর জন্য আপনিই দায়ী।'

ননীদি বললেন, 'গল্পচ্ছলে আমিও তো অনেক কথা বলে ফেলেছি। আপনার আবার লেখার অভ্যেস।'

এলার আমার শাড়ি জামা এতদিন মিলেমিশে ছিল। এবারে সে সেগুলি আলাদা করে গোছাতে লাগল; মায়া বইয়ের লিস্ট মেলাতে বসল। ভাবী তাড়া দিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে এলেন। বললেন, 'কখন আবার মেট্রন আসি ডাক দিবে, এক মিনিট আর সময় পাবা না। চলো একসঙ্গে বসি খেয়ে নিই গা চা।'

মনে হয় এই সেদিন মাত্র খেলাঘর পেতে বসেছিলাম। কারো বোন, কারো দিদিমা, কারো মা, কারো মাসি হয়ে দিন কাটছিল। আজ সে পাট তুলতে সহজ মনে পারছি কই? আজ যেন আবার বাইরেটাকেই আতঙ্ক বেশি।

শুনেছি অভিজিত এসেছে আমায় নিতে। হয়তো সে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দেয়ালের ওপাশেই, আপিসঘরের সামনে। হয়তো সে ছটফট করছে প্রতি সেকেণ্ডে। না, আর না, এবারে মেট্রন এলেই হয়।

উঠে একবার লেবুতলা ঘুরে এলাম; আম কাঁঠাল গাছ প্রদক্ষিণ করলাম। পুবকোনায় স্যাঁতসেঁতে জায়গাটায় একদিন কতকগুলি ঈষপগুল ঝাড়বার সময় রূপজানের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল; সেখানে কতকগুলি গাছ উঠেছে—

তাতে দানাও বেঁধেছে। সরু সরু রসুনগাছের মতো ঈষপগুলের গাছগুলি। এক ঝাঁক সবুজ এই কোনায় এক শোভা ধরছে।

মেট্রন ওপাশ থেকে হাঁক দিলেন, 'কই গো, সকলে আসেন। আপিস থেইকা ডাক পড়ছে। আর দেরি না।'

ডাক শুনে ছুটে এল সবাই। এক এক করে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এগুতে লাগলাম। তারাও সঙ্গে সঙ্গে চলল। এই তো আর কয়েক পা মাত্র; তার পরেই তো জেনানা ফাটকের দরজা। সম্পর্ক সব ছিঁড়ল বলে। হঠাৎ পিছন হতে কে যেন আমায় টানল। ফিরে দেখি ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাধা আমার আঁচল ধরে টানছে। দু-পা পিছিয়ে গেলাম।

রাধা বললে, 'আমায় তোমার ঠিকানাটা শিখিয়ে দিয়ে গেলে না মা? যদি প্রাণে বেঁচে থাকি— যদি কোনোদিন বের হতে পারি—। আমার সব কথা যে বলা হয় নি তোমায়—।'

মেট্রন দরজা খুলে হেঁকে উঠলেন, 'আসেন, আসেন, শিগগির চইল্যা আসেন। দরজা খুইল্যা রাখতে পারুম না বেশিক্ষণ।' জমাদারনিরা দুই হাতে ভিড় আগলে দাঁড়াল।

মায়া ভাবী চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্'।

চৌকাঠ পার হয়ে পিছন ফিরলাম। নিমেষে ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

—